Contents

তাওহীদের ডাক

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১৩

জাবহাতুন নুছরা

আল-কায়েদা ইন সিরিয়া

ফ্রী সিরিয়ান আর্মি

ক্ষমতাসীন বাথ পার্টি

SHIA

গৃহযুদ্ধের দাবানলে জ্বলছে সিরিয়া

তাওহীদের ডাক

১৪তম সংখ্যা

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১৩

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা,
রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : ০৭২১-৮৬১৬৮৪
মোবাইল : ০১৭৩৮-০২৮৬৯২
০১৭৪৪-৫৭৬৫৮৯
ই-মেইল : tawheederdak@gmail.com
ওয়েব : www. tawheederdak.at-tahreek.com

মূল্য : ২০ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও ইমাম অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

নষ্ট রাজনীতির শিকার তরুণ প্রজন্ম

যুবক ও তরুণ ছাত্র সমাজ দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ। তারা সমাজের ভূষণ ও শক্তিশালী কাঠামো। তরুণ প্রজন্ম ক্ষতিগ্রস্ত হলে পুরো জাতি ও সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বড় পরিতাপের বিষয় হল- পাশ্চাত্য মতবাদের ধ্বজাধারী প্রচলিত রাজনৈতিক দলগুলো তরুণ সমাজকে নষ্ট করার জন্য ধ্বংসস্তূপের ব্যবস্থা করেছে। তারা দলীয় ক্যাডারের নামে সন্ত্রাসী বাহিনী তৈরি করেছে। ফলে তরুণরা সমাজে সন্ত্রাসের প্রতিভূতে পরিণত হয়েছে। তাদের মর্মান্তিক প্রভাবে সমাজ দুর্নীতির ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। এই ভাইরাসের শেষ ঠিকানা যেন নির্ঘাত মৃত্যু।

মিথ্যা রাজনীতির স্বরূপ ফুটে উঠে প্রথমতঃ সর্বোচ্চ জ্ঞানকেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। কথিত দলীয় ক্যাডার হওয়ার কারণে তারা জ্ঞান চর্চা না করে নোংরামির চর্চা করে। টেন্ডারবাজী আর দলবাজী হয়ে পড়ে তাদের মূল উদ্দেশ্য। কতিপয় দলীয় সন্ত্রাসীর কারণে হাযার হাযার শিক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বঞ্চিত হয় শিক্ষার আলো থেকে। কারণ হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ, মানববন্ধন, বিক্ষোভ, মিছিল, অনশন ও নানা কর্মসূচী শিক্ষাঙ্গনকে অচল করে দেয়। বিদ্যাপীঠগুলোকে তারা ত্রাসের রাজ্যে পরিণত করে, যেন গোলাগুলি, বোমাবাজি, অস্ত্রবাজি, মাদকদ্রব্য আর লাশের কারখানা।

জাহেলী রাজনীতির ফসল হিসাবে সন্ত্রাসের ন্যায় ওয়ারিছসূত্রে মাদকতা তরুণ প্রজন্মকে ঘুণপোকার মত নিঃশেষ করে দিচ্ছে। এই মাদক ক্যান্সার শুধু মেধাকেই ক্ষতিগ্রস্ত করছে না, বরং পরিবারের অর্থনৈতিক ভিত্তি, সন্তান-সন্ততি, সমাজ ও রাষ্ট্রকেও ধ্বংস করে দিচ্ছে। রাজনৈতিক আমলা এবং ক্যাডাররা মাদকতার মূল উৎস হওয়ার কারণে মাদক বিরোধী আইন থাকলেও তার প্রয়োগ নেই। তাছাড়া যারা আইন প্রয়োগ করবে তারাই মাদকদ্রব্যের শিখণ্ডী। ফলে তাদেরই ছত্রছায়ায় পার্শ্ব রাষ্ট্র থেকে হাযার হাযার টন মাদকদ্রব্য বন্যার স্রোতের মত দেশে আসছে। এ কারণেই সমাজের সর্বত্র যাবতীয় নষ্টামি ছড়িয়ে পড়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মাদকদ্রব্য যাবতীয় নোংরামির মুকুট' *(আহমাদ হা/২২১২৮; মিশকাত হা/৬১, সনদ হাসান)*।

দলীয় ক্যান্সারের কারণে মেধাশূন্য সন্ত্রাসীগুলো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে বড় বড় পদে জেঁকে বসে। মেধা নয় দলীয় বিবেচনায় সর্বত্র নিয়োগ হয়। বিসিএস ও নিবন্ধন পরীক্ষা পর্যন্ত দুর্নীতির শিকার। জনসেবার নামে জনগণের সম্পদ লুণ্ঠনের জন্য অস্ত্রের মহড়া দেখিয়ে সংসদ সদস্য হয়। তারাই দেশের জন্য আইন প্রণয়ন করে। এমনকি সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত এর করালগ্রাসে নিপতিত হয়েছে। সেখানে আর আইন অনুযায়ী বিচার হয় না; বরং দলীয় বিবেচনায় রায় দেয়া হয়। পদোন্নতি দেয়া হয় সময়ের তাকীদে দলীয় বিবেচনায়। ফলে রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের সবকিছুই মেধাশূন্য উন্মাদদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। তাছাড়া যখন যে দল ক্ষমতায় থাকে তখন সে দলের সংসদীয় এজেন্ডা হয়ে যায় বিরোধী দলকে শায়েস্তা করা এবং সেভাবেই আইন তৈরি করা। এটাই নষ্ট রাজনীতির ফসল। এ ধরনের রাষ্ট্রে মানুষ বাস করবে কিভাবে?

এই অধঃপতিত সমাজের সংস্কার কিভাবে সম্ভব? এর জবাব একটাই- রাসূল (ছাঃ) যার মাধ্যমে এবং যে পদ্ধতিতে সহস্র বছরের প্রতিষ্ঠিত জাহেলী সমাজকে সোনালী সমাজে পরিণত করেছিলেন, আমাদেরকেও সেই মাধ্যম এবং সেই পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। মাধ্যম আমাদের কাছে বিদ্যমান। কিন্তু পদ্ধতি অনুযায়ী তার প্রয়োগ নেই। সমাজে ইসলামের নামে যা চালু আছে তা শিরক ও বিদ'আত মিশ্রিত পীর-ফকীরী প্রতারণা এবং মাযহাব ও তরীক্বার মিথ্যা দর্শন। আর রাজনীতির নামে যা চালু আছে তা পাশ্চাত্যের বিধর্মীয় মতবাদ। অথচ পৃথিবীতে রাসূল (ছাঃ)-কে পাঠানোর মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল সমাজে প্রতিষ্ঠিত যাবতীয় ধর্ম ও মতবাদের উপর ইসলামকে বিজয়ী করা *(ছফ্ফ ৯; তওবা ৩৩; ফাতহ ২৮)*। আর এই মিশনকে বাস্তবায়ন করার জন্য তিনি নির্ভেজাল আক্বীদাপুষ্ট দৃঢ়চেতা আপোসহীন একঝাঁক তরুণ দাঈ তৈরি করেছিলেন। তাদেরকে সাথে নিয়ে নীতি ও আদর্শের সংগ্রাম করে দাওয়াত ও জিহাদের মাধ্যমে জাহেলী সমাজের ভিত্তি গুঁড়িয়ে দিয়ে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বর্তমান বাংলাদেশের দুর্গন্ধময় পতিত সমাজকে সোনালী সমাজে পরিণত করতে চাইলে প্রয়োজন নির্ভেজাল তাওহীদের আহ্বায়ক একদল প্রশিক্ষিত দূরদর্শী তরুণ। তারা বিশুদ্ধ আক্বীদার বিপ্লব ঘটাবে এবং সৎ কাজ ও সচ্চরিত্রের বাস্তব রূপ প্রদর্শন করবে। মনে রাখতে হবে বিজয়ের জন্য বিদ'আতী সংখ্যা ও জোট শর্ত নয়; বরং শর্ত হল- বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সৎ আমলের পরিশীলনকারী একশ্রেণীর মানুষের কবুলিয়াত, যা স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত এবং তাঁরই পক্ষ থেকে প্রেরিত বিশেষ সাহায্য ও বিজয় *(সূরা নূর ৫৫; ছফ্ফ ১২)*।

বর্তমান তরুণ প্রজন্মের জন্য দুর্ভোগ। কারণ তারা সর্বাধিক প্রশংসিত কাফেলা হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্য ও ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলেছে। তারা জ্ঞান চর্চা ছেড়ে সন্ত্রাস চর্চা করছে; প্রতিভার সাধনা না করে মাদক সেবন করে উন্মত্ত হচ্ছে; গবেষণা ও লাইব্রেরী ছেড়ে মিথ্যা রাজনীতি ও দলীয় নষ্টামির লেজুড়বৃত্তি করছে। মানব সেবা ছেড়ে দুর্নীতির সেবা করছে; সামাজিক উন্নয়ন না করে সমাজে ত্রাসের রাজ্য কায়েম করছে; আল্লাহ প্রেরিত অভ্রান্ত ও মহা পবিত্র বিধান ছেড়ে ইহুদী-খ্রীস্টান বিধর্মীদের সৃষ্ট অপবিত্র বাতিল মতবাদের পিছনে ছুটছে। দেশ ও জনগণের সম্পদ সংরক্ষণ না করে লুট করছে। জনগণকে নিরাপত্তা না দিয়ে তাদের ইযযত, সম্মান হরণ করছে, তাদেরকে প্রতিনিয়ত হত্যা করছে। তাদের সোনালী ইতিহাসকে এভাবেই কলঙ্কিত করছে। তরুণ আলীর মূর্তি ও মাযার ভাঙ্গার হুংকার তারা আর শুনতে পায় না। ইসলামের প্রথম বিপ্লবের অগ্রসেনানী মুছ'আব বিন উমায়েরের ত্যাগ তারা ভুলে গেছে। খুবাইবের আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের কথা তাদের আর স্মরণ নেই। উছামা বিন যায়েদ, মুহাম্মাদ বিন কাসেম, তারিক বিন যিয়াদ, ওমর বিন আব্দুল আযীয, শাহ ইসমাঈল শহীদ, তিতুমীর এমন লক্ষ লক্ষ তরুণ সিপাহসালারদের সংগ্রামের কথা তারা আর মনে করে না। যারা অসত্যের হিমাদ্রিপ্রাচীর ভেঙ্গে বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আমাদের তরুণ ছাত্ররা কখন তাঁদের পথে পরিচালত হবে সেই অপেক্ষায় প্রহর গুণছে সর্বস্ব হারা দারিদ্র্য পীড়িত অসহায় মানুষগুলো।

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' তাই দেশের যুবক ও তরুণ ছাত্র সমাজকে নির্ভেজাল তাওহীদের প্লাটফরমে একত্রিত করার সংগ্রাম করে যাচ্ছে। নষ্ট রাজনীতি ও অপসংস্কৃতির শিকার যেন না হয় সেজন্য সর্বত্র দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছে। সোনালী ঐতিহ্য ফিরে আনাই এর মূল লক্ষ্য এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যমে জান্নাত লাভই মূল উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলা তরুণ প্রজন্মের চৈতন্যোদয় করুন এবং চির সত্যের পথে তাদেরকে পরিচালতি করুন- আমীন!!

Contents

সত্যবাদিতা

আল-কুরআনুল কারীম :

১– قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ.

'তুমি বল, যদি অপর ব্যক্তিগণ অপেক্ষা বিশেষভাবে শুধু তোমাদের জন্যে আল্লাহ্‌র নিকট বাসস্থান থাকে, তবে তোমারা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও' *(বাক্বারাহ ২/৯৪)*।

২–وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ.

'এবং তারা বলে, যারা ইহুদী ও খ্রীষ্টান তারা ছাড়া আর কেউই জান্নাতে প্রবেশ করবে না, এটাই তাদের বাসনা। তুমি বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর' *(বাক্বারাহ ২/১১১)*।

৩–الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَؤُا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ.

'যারা গৃহে বসে স্বীয় ভ্রাতৃগণের সম্বন্ধে বলেছিল, যদি তারা আমাদের কথা মান্য করতো, তবে নিহত হতো না; তুমি বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে নিজেদেরকে মৃত্যু হতে রক্ষা কর' *(আলে-ইমরান ৩/১৬৮)*।

٤– قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ.

'তুমি (হে মুহাম্মাদ ছাঃ) তাদেরকে বল, তোমরা চিন্তা করে দেখ যে, যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র শাস্তি এসে পড়ে অথবা তোমাদের নিকট ক্বিয়ামত এসে উপস্থিত হয় তখনও কি তোমরা আল্লাহকে ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকবে' *(আন'আম ৬/৪০)*।

৫– قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ.

'তারা বলল, তুমি কি আমাদের নিকট শুধু এই উদ্দেশ্যে এসেছ, যেন আমরা একমাত্র আল্লাহ্‌রই ইবাদত করি এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণ যাদের ইবাদত করতো তাদেরকে বর্জন করি? তাহলে তুমি তোমার কথা ও দাবীতে সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যে শাস্তির ভয় দেখাচ্ছ তা আনয়ন কর' *(আ'রাফ ৭/৭০)*।

٦– وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ – قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعاً إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ.

'আর তারা বলে, আমাদের এই অঙ্গীকার কখন সংঘটিত হবে? যদি তোমরা সত্যবাদী হও'। 'তুমি বলে দাও, আমি তো আমার নিজের জন্যে কোন উপকার বা ক্ষতির অধিকারী নই; তবে যতটুকু আল্লাহ চান। প্রত্যেক উম্মতের জন্যে একটি নির্দিষ্ট সময় আছে, যখন তাদের সেই নির্দিষ্ট সময় এসে পৌঁছে, তখন তারা মুহূর্তকাল না পশ্চাদপদ হতে পারবে, আর না অগ্রসর হতে পারবে' *(ইউনুস ১০/৪৮-৪৯)*।

٧– أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ.

'তবে কি তারা বলে যে, ওটা (কুরআন) সে নিজেই রচনা করেছে? তুমি বলে দাও, তাহলে তোমরাও ওর অনুরূপ রচিত দশটি সূরা আনয়ন কর এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে যাকে পার ডাক যদি তোমরা সত্যবাদী হও' *(হূদ ১১/১৩)*।

٨– خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ, وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ.

'মানুষ সৃষ্টিগতভাবে ত্বরাপ্রবণ, আর শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাব; সুতরাং তোমরা আমাকে তাড়াতাড়ি করতে বলো না'। আর তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, এই প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হবে?' *(আম্বিয়া ২১/৩৭-৩৮)*।

٩– أَمَّنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ.

'কে তিনি, যিনি সৃষ্টির সূচনা করেন, অতঃপর ওর পুনরাবৃত্তি করেন এবং যিনি তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী হতে রূযী দান করেন? আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন মা'বূদ আছে কি? বল, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে তোমাদের প্রমাণ পেশ কর' *(নামল ২৭/৬৪)*।

١٠– قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ.

'বল, তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তাদেরকে দেখছ কি? তারা পৃথিবীতে কি সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও অথবা আকাশ-মণ্ডলীতে তাদের কোন অংশীদারিত্ব আছে কি? এর পূর্বে আসা কোন কিতাব অথবা জ্ঞানের কোন অবশিষ্ট থাকলে তা তোমরা আমার নিকট নিয়ে আস, যদি তোমরা সত্যবাদী হও' *(আহক্বাফ ৪৬/৪)*।

١١– قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ–

'হে নবী আপনি বলুন! হে ইহুদীগণ! যদি তোমরা মনে কর যে, তোমরাই আল্লাহ্‌র বন্ধু, অন্য কোন মানুষ নয়, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও' *(জুম'আ ৬২/৬-৭)*।

١٢– يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقاً لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا.

'হে আহলে কিতাবগণ! তোমাদের সঙ্গে যা আছে তার সত্যতা প্রমাণকারী যা অবতীর্ণ করেছি তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এর পূর্বে যে, আমি বহু মুখমণ্ডল বিকৃত করে দেব, তৎপর তাদেরকে পৃষ্ঠের দিকে উল্টিয়ে দেব অথবা শনিবারওয়ালাদের মতো তাদের উপর অভিসম্পাত করব এবং আল্লাহ্‌র আদেশ সুসম্পন্ন হয়ে থাকে' *(নিসা ৪/৪৭)*।

হাদীছে নববী থেকে :

١٣– عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ فِيكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا حِفْظُ أَمَانَةٍ وَصِدْقُ حَدِيثٍ وَحُسْنُ خَلِيقَةٍ وَعِفَّةٌ فِي طُعْمَةٍ–

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন যে, 'যদি তোমার মধ্য চারটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে তাহলে দুনিয়াবী যা কিছু হারাও তাতে তোমার কিছু যায় আসে না। ১. আমানত সংরক্ষণ করা ২. সত্য কথা বলা ৩. উত্তম চরিত্র ৪. হালাল খাবার *(মুসনাদে আহমাদ হা/৬৬৫২; মিশকাত হা/৫২২২। হাদীছ ছহীহ)*।

١٤– عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَا أَوَّلُ شَفِيعٍ فِي الْجَنَّةِ لَمْ يُصَدَّقْ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَا صُدِّقْتُ وَإِنَّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيًّا مَا يُصَدِّقُهُ مِنْ أُمَّتِهِ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ.

Contents

মুখতার ইবনু ফুলফুল (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, জান্নাতী লোকদের সম্পর্কে আমিই হব সর্বপ্রথম সুপারিশকারী এবং এত অধিক সংখ্যক মানুষ আমার প্রতি ঈমান এনেছে যা অন্য কোন নবীর বেলায় হবে না। নবীদের কেউ কেউ তো এমতাবস্থায় আসবেন যার প্রতি মাত্র একজন ব্যক্তিই ঈমান এনেছে' *(ছহীহ মুসলিম হা/৫০৬; মুসনাদে আহমাদ হা/১২৪৪২; মিশকাত হা/৫৭৪৪)*।

১৫- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ اضْمَنُوا لِي سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ اصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ

উবাদাহ ইবনু ছামেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা ছয়টি ব্যাপারে যিম্মাদারী গ্রহণ কর, আমি তোমাদের জান্নাতের যিম্মাদার হব। সেগুলো হ'ল, যখন কথা বলবে সত্য কথা বলবে, অঙ্গীকার পূরণ করবে, আমানতের খেয়ানত করবে না, লজ্জাস্থানের হেফাযত করবে, চক্ষু অবনত রাখবে এবং হাতকে সংযত রাখবে' *(হাকিম হা/৮০৬৬; মিশকাত হা/৪৮৭০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৪৭০।)*

১৬- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِى إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِى إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِى إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا.

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, নিশ্চয়ই সত্যবাদিতা কল্যাণের দিকে ধাবিত করে। আর কল্যাণ জান্নাতের দিকে ধাবিত করে। কোন লোক যদি সত্য কথা বলে ও সত্য অনুসন্ধান করে তাহলে সে আল্লাহ্র নিকট সত্যবাদী হিসাবে গণ্য হয়। আর তোমরা মিথ্যা থেকে বিরত থাক। কারণ মিথ্যা পাপাচারের দিকে নিয়ে যায়। আর পাপাচার জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। কোন লোক যখন মিথ্যা কথা বলে ও মিথ্যা অনুসন্ধান করে তখন সে আল্লাহ্র নিকট মিথ্যাবাদী বলে লিখিত হয়ে যায়' *(তিরমিযী হা/১৯৭১; মিশকাত হা/৪৮২৪।)*

১৭- عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِى بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

হাকিম ইবনু হিযাম (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে পৃথক না হওয়া পর্যন্ত পুনরায় বিক্রয়ের সুযোগ থাকে। অথবা তিনি বলেছেন, এমনকি পৃথক হওয়া পর্যন্ত। যদি ক্রেতা ও বিক্রেতা সত্য কথা বলে তাহলে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত দেয়া হবে আর যদি তারা পণ্যের কোন দোষ গোপন করে কিংবা মিথ্যা বলে তাহলে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে না' *(ছহীহ বুখারী হা/২০৭৯ ছহীহ মুসলিম হা/৩৯৩৭; মিশকাত হা/২৮০২।)*

১৮- عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنهما قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ.

হাসান ইবনু আলী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট থেকে মুখস্থ করেছি যে, তুমি যে বিষয়ে সন্দেহ কর তাকে ছেড়ে দাও এবং তার দিকে ধাবিত হও যা তুমি সন্দেহ করো না। নিশ্চয়ই সত্যবাদিতা নিরাপত্তা আর মিথ্যা সন্দেহপ্রবণ' *(তিরমিযী হা/২৫১৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪১৬। হাদীছ ছহীহ)*।

১৯- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلاَ بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلاَ بِالأَنْدَادِ وَلاَ تَحْلِفُوا إِلاَّ بِاللَّهِ وَلاَ تَحْلِفُوا بِاللَّهِ إِلاَّ وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের পিতা, মাতা কিংবা কোন দেবদেবীর নামে শপথ করো না। বরং তোমরা শুধুমাত্র শপথ কর আল্লাহ্র নামে। তোমরা শপথ করো আল্লাহ্র নামে কেবল সে বিষয়ে যে বিষয়ে তোমরা সত্যবাদী' *(আবুদাঊদ হা/৩২৫০; নাসাঈ হা/৩৭৬৯; মিশকাত হা/৩৪১৮।)*

২০- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا أُعْطِيَهَا وَلَوْ لَمْ تُصِبْهُ-

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি প্রকৃতার্থে শাহাদত কামনা করে তবে তাকে সে মর্যাদা প্রদান করা হবে যদিও সে তা লাভ করতে না পারে' *(ছহীহ মুসলিম হা/৫০৩৮।)*

২১- عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ-

সাহল ইবনু হানীফ তার পিতা এবং তার পিতা তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্র নিকটে শহীদ হওয়ার আকাঙ্খা পোষণ করে, আল্লাহ তাকে শহীদের মর্যাদায় পৌঁছিয়ে দিবেন যদিও সে বিছানায় মৃত্যুবরণ করে' *(মুসলিম হা/৫০৩৯; মিশকাত হা/৩৮০৮।)*

২২- عَنْ سُوَيْدِ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ خَرَجْنَا نُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ وَمَعَنَا وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ فَأَخَذَهُ عَدُوٌّ لَهُ فَتَحَرَّجَ الْقَوْمُ أَنْ يَحْلِفُوا وَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِى فَخَلَّى سَبِيلَهُ فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ تَحَرَّجُوا أَنْ يَحْلِفُوا وَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِى قَالَ صَدَقْتَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ-

সুওয়াইদ ইবনু হানাযালা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে দেখা করার জন্য রওয়ানা হলাম। তখন আমাদের সাথে ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ)ও ছিলেন। এমন সময় তার এক শত্রু তাকে ধরে ফেলল। দলের লোকেরা এ ব্যাপারে শপথ করত সংকোচবোধ করলে আমি শপথ করে বললাম, সে আমার ভাই। ফলে শত্রু তার পথ ছেড়ে দিল। আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে তাকে ঘটনাটি জানালাম এবং বললাম, দলের লোকেরা এভাবে শপথ করাকে ভাল মনে করেনি। আমি শপথ করে বলেছি, সে আমার ভাই। তিনি বললেন, তুমি সত্য বলেছ। কেননা এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই' *(আবুদাঊদ হা/৩২৫৬; ইবনু মাজাহ হা/২১১৯।)*

মনীষীদের বক্তব্য থেকে :

১. আলী ইবনু আবী ত্বালেব (রাঃ) বলেন, কোন ব্যক্তির নিকট যদি তিনটি গুণ থাকে তাহলে তার জন্য মানুষের উপর তিনটি জিনিস ওয়াজিব হয়ে যায়। গুণগুলো হ'ল- যথা : (১) সে তাদের নিকট কথা বললে তারা তাকে বিশ্বাস করবে (২) লোকেরা তার নিকট আমানত রাখলে সে খেয়ানত করে না (৩) তাদের সাথে ওয়াদা করলে তা পালন করে। তাদের উপর ওয়াজিব হওয়া জিনিস হ'ল : তারা মন থেকে তাকে ভালবাসবে, তার প্রশংসা করবে এবং তাকে সহযোগিতা করবে।

২. আব্দুল ওয়াহেদ ইবনু যায়েদ (রহঃ) বলেন, সত্যবাদিতা হ'ল আল্লাহ্র জন্য সঠিকভাবে কাজ সম্পাদন করা।

৩. ইবরাহীম আল-খাউওয়াছ (রহঃ) বলেন, সত্যবাদীকে তুমি ফরয আদায় করতে বা কোন ফযীলতপূর্ণ আমল করা ব্যতীত (অন্য কোন অবস্থায়) দেখবে না।

৪. জুনাইদ (রহঃ) বলেন, সত্যবাদিতার প্রকৃতি হ'ল, তুমি এমন স্থানে সত্য বলবে মিথ্যা বলা ছাড়া যেখান থেকে তুমি মুক্তি পাবে না।

সারবস্তু

১. সত্যবাদিতা মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
২. সত্যবাদীরা আল্লাহ্র নিকটতম বান্দা।
৩. সত্যবাদিতা আমলকে বৃদ্ধি করে এবং মর্যাদাকে সমুন্নত করে।
৪. সত্যবাদিতা আত্মিক প্রশান্তির নিয়ামক ।
৫. সত্য মুক্তি দেয় আর মিথ্যা ধ্বংস ডেকে আনে।
৬. সত্যকে মিথ্যা দিয়ে কখনো আড়াল করা যায় না।
৭. সত্যবাদিতা জান্নাতের পাথেয়।

ভ্রান্ত আক্বীদা : পর্ব-১

-মুযাফফর বিন মুহসিন

ভূমিকা :

আক্বীদা বা বিশ্বাস মানুষের মূল সম্পদ। বিশুদ্ধ আক্বীদা ছাড়া আমলের কোন মূল্য নেই। অথচ সমাজে ইসলামের নামে এমন অসংখ্য ভ্রান্ত আক্বীদা প্রচলিত আছে, যার দ্বারা ঈমান নষ্ট হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এ জন্য তাদের ইবাদত কবুল হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নেই। তাই নিম্নে কতিপয় ভ্রান্ত আক্বীদা ও তার সঠিক দিক তুলে ধরা হল :

(১) আল্লাহ নিরাকার :

সমাজে প্রচলিত আছে যে, আল্লাহ নিরাকার। অধিকাংশ মানুষ এই আক্বীদায় বিশ্বাসী। অধিকাংশ আলেম এর পক্ষে জোর প্রচারণা চালান।

পর্যালোচনা :

আল্লাহ তা'আলা নিরাকার নন, তাঁর আকার আছে। তিনি শুনেন, দেখেন এবং কথা বলেন। তাঁর হাত, পা, চেহারা, চোখ ইত্যাদি আছে। তবে তাঁর সাথে সৃষ্টির কোন কিছুই তুলনীয় নয়। আল্লাহ বলেন, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ 'কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা' *(শূরা ১১)*। সুতরাং তাঁর আকারের সাথে কোন কিছুর আকারের তুলনা করা যাবে না। যেমন আল্লাহ নিজেই বলেন, فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْأَمْثَالَ 'সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র কোন সাদৃশ্য বর্ণনা করো না' *(নাহল ৭৪)*।

অতএব আল্লাহ্‌র আকার আছে। তবে কোন কিছুর সাথে তা তুলনীয় নয়। কুরআন ও ছহীহ হাদীছে তাঁর আকৃতি সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তার কোন রূপক বা বিকৃত অর্থ করা যাবে না। বরং বলতে হবে তিনি তাঁর মত। নিম্নে কিছু উদাহরণ দেয়া হল :

(ক) আল্লাহ্‌র হাত :

(এক) আল্লাহ তা'আলা ইহুদীদের বক্তব্য এভাবে তুলে ধরেছেন,

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللهِ مَغْلُوْلَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيْهِمْ وَلُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوْطَتَانِ.

'আর ইহুদীরা বলে, আল্লাহ্‌র হাত বন্ধ হয়ে গেছে। তাদের হাতই বন্ধ হয়ে গেছে এবং তাদের এ উক্তির কারণে তাদের উপর অভিশাপ করা হয়েছে; বরং তাঁর (আল্লাহ্‌র) দুই হাতই প্রসারিত' *(মায়েদাহ ৬৪)*।

(দুই) অন্যত্র তিনি বলেন, تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ 'বরকতময় তিনি, যাঁর হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব, তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান' *(মুলক ১)*।

(তিন) আল্লাহ বলেন, يَا إِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ 'হে ইবলীস! আমি যাকে আমার দুই হাত দ্বারা সৃষ্টি করলাম, তাকে সিজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? *(ছোয়াদ ৭৫)*।

(চার) তিনি আরো বলেন,

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِهِ.

'তারা আল্লাহ্‌র উপযুক্ত সম্মান করে না। ক্বিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোয় এবং আকাশ সমূহ ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে তাঁর ডান হাতে' *(যুমার ৬৭)*।

(পাঁচ) আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيْهِمْ 'আল্লাহ্‌র হাত তাদের হাতের উপর' *(ফাতহ ১০)*।

পবিত্র কুরআনে উক্ত মর্মে আরো অনেক আয়াত আছে। তাছাড়া রাসূল (ছাঃ)ও বহু স্থানে আল্লাহ্‌র হাতের কথা বর্ণনা করেছেন।

(ছয়) রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا.

'আল্লাহ তা'আলা রাত্রে তাঁর হাত প্রসারিত করে রাখেন, যাতে দিনে পাপকারী তওবা করে। তিনি দিনে তাঁর হাত প্রসারিত করে রাখেন, যাতে রাতে পাপকারী তওবা করে। পশ্চিম দিকে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ ক্বিয়ামত পর্যন্ত এটা তিনি জারী রাখবেন।[১]

(সাত) অন্যত্র তিনি বলেন,

مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يُرَبِّيْهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّيْ أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُوْنَ مِثْلَ الْجَبَلِ.

'যে ব্যক্তি তার হালাল রোযগার থেকে একটি খেজুর পরিমাণ দান করবে-কারণ আল্লাহ হালাল বস্তু বৈ কোন কিছুই কবুল করেন না, আল্লাহ তা তাঁর ডান হাতে গ্রহণ করবেন। অতঃপর দানকারীর জন্য তা প্রতিপালন করতে থাকেন যেরূপ তোমাদের কেউ তার ঘোড়ার বাচ্চাকে লালন-পালন করে বড় করে থাকে। অবশেষে তা পাহাড় সমতুল্য হয়ে যায়'।[২] উল্লেখ্য যে, উক্ত মর্মে আরো অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।[৩]

(খ) আল্লাহ্‌র পা :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ 'সেদিন পায়ের নলা উন্মোচিত করা হবে এবং তাদেরকে (কাফেরদেরকে) সিজদা করার জন্য আহ্বান করা হবে। কিন্তু তারা সিজদা করতে সক্ষম হবে না' *(ক্বলম ৪২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقٍ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ فَيَبْقَى كُلُّ مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَةً فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُوْدُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا.

'(ক্বিয়ামতের দিন) আমাদের প্রভু পায়ের নলা উন্মুক্ত করে দিবেন। অতঃপর সকল মুমিন পুরুষ ও নারী তাঁকে সিজদা করবে। কিন্তু বাকী থাকবে ঐ সমস্ত লোক, যারা দুনিয়ায় সিজদা করত লোক দেখানো ও প্রচারের জন্য। তারা সিজদা করার জন্য যাবে, কিন্তু তাদের পৃষ্ঠদেশ একখণ্ড তক্তার মত শক্ত হয়ে যাবে'।[৪] আল্লাহ্‌র পা সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

لَا يَزَالُ يُلْقَى فِيْهَا وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ حَتَّى يَضَعَ فِيْهَا رَبُّ الْعَالَمِيْنَ قَدَمَهُ فَيَنْزَوِيْ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ ثُمَّ تَقُوْلُ قَدْ قَدْ بِعِزَّتِكَ وَكَرَمِكَ.

'জাহান্নামে (জাহান্নামীদের) নিক্ষেপ করা হতে থাকবে আর সে (জাহান্নাম) বলবে, আরো আছে কি? শেষ পর্যন্ত জগৎ সমূহের

---

১. মুসলিম হা/৭১৬৫, 'তওবা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫।
২. বুখারী হা/১৪১০, 'যাকাত' অধ্যায়।
৩. বুখারী হা/৭৪১২; বুখারী হা/৩৩৪৮, 'তাফসীর' অধ্যায়; মুসলিম হা/৬৯২১, 'তাক্বদীর' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩।
৪. বুখারী হা/৪৯১৯, 'তাফসীর' অধ্যায়।

প্রতিপালক তাতে পা রাখবেন। ফলে জাহান্নামের একাংশ আরেকাংশের সাথে মিশে যাবে। অতঃপর জাহান্নাম বলবে, আপনার প্রতিপত্তি ও মর্যাদার শপথ! যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে'।[৫]

(গ) আল্লাহ্‌র চোখ :

আল্লাহ তা'আলা মূসা (আঃ)-কে বলেন, وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّيْ وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِيْ 'আমি আমার পক্ষ থেকে তোমার প্রতি ভালবাসা ঢেলে দিয়েছিলাম, যাতে তুমি আমার চোখের সামনে প্রতিপালিত হও' *(ত্বো-হা ৩৯)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ أَلاَ إِنَّ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ অন্ধ নন। সাবধান! দাজ্জালের ডান চোখ কানা। তার চোখটা যেন ফুলে যাওয়া একটি আঙ্গুরের মত'।[৬]

(ঘ) আল্লাহ্‌র চেহারা :

আল্লাহ বলেন, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ 'তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও সে দিকেই আল্লাহ্‌র চেহারা রয়েছে' *(বাক্বারাহ ১১৫)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ 'ভূ-পৃষ্ঠের সবকিছুই ধ্বংসশীল। একমাত্র আপনার মহিমাময় ও মহানুভব পালনকর্তার চেহারা ব্যতীত' *(আর-রহমান ২৬-২৭)*।

(ঙ) আল্লাহ্‌র কথা ও সাক্ষাৎ :

আল্লাহ তা'আলা মূসা (আঃ)-এর সাথে কথা বলেছেন, وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوسَى تَكْلِيمًا 'আর আল্লাহ মূসার সাথে কথা বলেছেন' *(নিসা ১৬৪)*। অন্যত্র বলেন, وَلَمَّا جَاءَ مُوْسَى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِيْ أَنْظُرْ إِلَيْكَ، قَالَ لَنْ تَرَانِيْ 'মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হল, তখন তাঁর প্রতিপালক তাঁর সাথে কথা বললেন। তিনি তখন বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দর্শন দিন, আমি আপনাকে দেখব। তখন আল্লাহ বললেন, তুমি আমাকে আদৌ দেখতে পাবে না' *(আ'রাফ ১৪৩)*। হাদীছেও এ মর্মে অনেক দলীল রয়েছে।[৭]

অপব্যাখ্যা ও তার পর্যালোচনা :

কিছু বাতিল ফের্কা এবং আক্বীদাভ্রষ্ট কিছু মুফাস্‌সির আল্লাহ্‌র হাত, পা, চোখ, চেহারা ইত্যাদির রূপক অর্থ করেছেন। আল্লাহ্‌র হাত বলতে, 'কুদরত' ও নে'মত' বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ্‌র চেহারা বলতে 'সত্তা' ইত্যাদি অর্থ করা হয়েছে।[৮] যামাখশারী (৪৬৭-৫৩৮হিঃ) সূরা ফাত্‌হর ১০ নং আয়াতের অর্থ করেছেন, يُرِيْدُ أَنَّ يَدَ رَسُوْلِ اللهِ الَّتِيْ تَعْلُوْ أَيْدِى الْمُبَايِعِيْنَ هِيَ يَدُ اللهِ وَاللهُ تَعَالَى مُنَزَّهٌ عَنِ الْجَوَارِحِ وَعَنْ صِفَاتِ الْأَجْسَامِ 'তিনি ইচ্ছা করেছেন রাসূল (ছাঃ)-এর হাত বায়'আতকারীদের হাতগুলোর উপর থাকবে। আর সেটাই আল্লাহ্‌র হাত। কারণ আল্লাহ তা'আলা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং শরীরের আকৃতি থেকে মুক্ত'।[৯] তিনি প্রথমাংশে সঠিক উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। কিন্তু পরের অংশে আল্লাহকে নিরাকার সাব্যস্ত করেছেন। অনুরূপ অর্থ করেছেন আবুল বারাকাত আন-নাসাফী।[১০] তাফসীরে বায়যাভীতেও রূপক অর্থ করা হয়েছে।[১১] এধরনের রূপক অর্থ করা আদৌ ঠিক নয়।

দ্বিতীয়ত : উক্ত শব্দগুলোর রূপক অর্থ করা হলে মূল অর্থের সাথে মিলবে না। যেমন- সূরা মায়েদার ৬৪ ও সূরা ছোয়াদের ৭৫ নং আয়াতে 'দুই হাত' বলা হয়েছে। হাতের রূপক অর্থ 'কুদরত' বা 'শক্তি' করলে কখনো দ্বিবচন করা যাবে না।

সুধী পাঠক! আল্লাহ্‌র পরিচয় যখন আল্লাহ নিজেই ব্যক্ত করেছেন, তখন তার রূপক অর্থের প্রশ্নই আসে না। উক্ত আয়াতগুলো দ্বারা রাসূল (ছাঃ) এবং ছাহাবী-তাবেঈগণ তথা সালাফীগণ যা অর্থ নিয়েছেন, আমাদেরকেও সেই অর্থ নিতে হবে। তারা কখনো এ ধরনের বিকৃত অর্থ করেননি। মূল কথা হল, তাফসীরে কাশ্‌শাফ, বায়যাভী, জালালাইন, মাদারেকুত তানযীল, মা'আরেফুল কুরআন ইত্যাদি তাফসীরে এ ধরনের রূপক অর্থ করা আছে। আর উপমহাদেশের সমস্ত মাদরাসায় উক্ত তাফসীরগুলোই পড়ানো হয়। ফলে উক্ত ভ্রান্ত আক্বীদার প্রচলন ঘটেছে। কিন্তু ছহীহ আক্বীদা সম্পন্ন শ্রেষ্ঠ তাফসীর হিসাবে পরিচিত তাফসীরে ইবনে আব্বাস, তাফসীরে তাবারী, ইবনে কাছীর, কুরতুবী, ফাৎহুল ক্বাদীর প্রভৃতি তাফসীর বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম দেশে সমধিক পরিচিত হলেও উপমহাদেশে সেগুলোর কোন গুরুত্ব নেই। একশ্রেণীর মাযহাবী আলেমের কারণেই এই মর্মান্তিক পরিণতি হয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) আরো বলেন,

وَلَهُ يَدٌ وَوَجْهٌ وَنَفْسٌ كَمَا ذَكَرَهُ اللهُ تَعَالَى فِى الْقُرْآنِ فَمَا ذَكَرَهُ اللهُ تَعَالَى فِى الْقُرْآنِ مِنْ ذِكْرِ الْوَجْهِ وَالْيَدِ وَالنَّفْسِ فَهُوَ لَهُ صِفَاتٌ بِلاَ كَيْفٍ وَلاَ يُقَالُ إِنَّ يَدَهُ قُدْرَتُهُ أَوْ نِعْمَتُهُ لِأَنَّ فِيْهِ إِبْطَالُ الصِّفَةِ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْقَدْرِ وَالْاِعْتِزَالِ وَلَكِنَّ يَدَهُ صِفَتُهُ بِلاَ كَيْفٍ وَغَضَبُهُ وَرِضَاهُ صِفَتَانِ مِنْ صِفَاتِ اللهِ تَعَالَى بِلاَ كَيْفٍ.

'তাঁর (আল্লাহ্‌র) হাত, মুখমণ্ডল এবং নফস রয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন। কুরআনে আল্লাহ তাঁর মুখমণ্ডল, হাত ও নফসের যে কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলো তাঁর গুণ। কিন্তু কারো সাথে সেগুলোর সাদৃশ্য নেই। আর একথা বলা যাবে না যে, তাঁর হাত অর্থ তাঁর 'কুদরত' বা 'নে'মত'। কারণ এতে আল্লাহ্‌র গুণকে বাতিল সাব্যস্ত করা হয়। আর এটা ক্বাদারিয়া ও মু'তাযিলাদের বক্তব্য। বরং কারো হাতের সাথে সাদৃশ্য ছাড়াই তাঁর হাত তাঁর গুণ। আর আল্লাহ্‌র রাগ ও সন্তুষ্টি কারো রাগ ও সন্তুষ্টির সাথে সাদৃশ্য ছাড়াই তাঁর দু'টি ছিফাত বা গুণ'।[১২]

সুধী পাঠক! আল্লাহ্‌কে নিরাকার সাব্যস্ত করার অর্থই হল তাঁর মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করা। তাঁর হাত, পা, চোখ, চেহারা আছে, তিনি কথা বলেন, শুনেন, দেখেন বলে নিজের পরিচয় নিজেই দিয়েছেন অথচ তাঁকে অস্তিত্বহীন প্রমাণ করার হীন চেষ্টা করা হয়। এটা মহান আল্লাহ সম্পর্কে চরম বাড়াবাড়ি।

(২) আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান :

আল্লাহ সব জায়গায় অবস্থান করেন, তিনি প্রত্যেক মানুষের মাঝে বিরাজমান এই ভ্রান্ত আক্বীদা অধিকাংশ মানুষের মাঝে প্রচলিত।

---

৫. বুখারী হা/৭৩৮৪, ২/৭১৯ পৃঃ, 'তাওহীদ' অধ্যায়।

৬. বুখারী হা/৩৪৩৯, 'নবীদের ঘটনাবলী' অধ্যায়।

৭. ইবনু মাজাহ হা/১৯০।

৮. ইবনুল ক্বাইয়িম, মুখতাছার ছাওয়ায়েকুল মুরসালাহ ২/১৫৩ পৃঃ।

৯. তাফসীরে কাশ্‌শাফ ৪/৩৩৭ পৃঃ, সূরা ফাতাহ ১০-এর তাফসীর দ্রঃ।

১০. আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বিন মাহমূদ হাফেযুদ্দীন আবুল বারাকাত আন-নাসাফী, মাদারেকুত তানযীল ওয়া হাক্বায়েকুত তা'বীল ৩/৩৩২ পৃঃ সূরা ফাত্‌হ ১০-এর তাফসীর দ্রঃ ও সূরা মায়েদা ৬৪-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ।

১১. নাছিরুদ্দীন আবুল খায়ের আব্দুল্লাহ বিন ওমর বিন মুহাম্মাদ আল-বায়যাভী, আনওয়ারুত তানযীল ও আসরারুত তা'বীল ২/৯২ পৃঃ, সূরা আল-মায়েদা ৬৪-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ।- أي هو ممسك يقتر بالرزق وغل اليد وبسطها مجاز عن البخل والجود ولا قصد فيه إلى إثبات يد وغل وبسط

১২. আল-ফিক্বহুল আকবার, পৃঃ ৬৬-৬৭।

পর্যালোচনা : পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উক্ত বিশ্বাস সঠিক নয়। বরং আল্লাহ আরশে সমুন্নীত। আল্লাহ তাঁর পরিচয় দিয়ে বলেন, الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى 'দয়াময় (আল্লাহ) আরশে সমুন্নীত' *(ত্ব-হা ৫)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِيْ سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ.

'নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক হচ্ছেন সেই আল্লাহ, যিনি আসমান ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশে সমুন্নীত হয়েছেন' *(আ'রাফ ৫৪)*।

এছাড়া সূরা ইউনুস-৩, সূরা রা'দ-২, সূরা ফুরক্বান-৫৯, সূরা সাজদাহ-৪, সূরা হাদীদ-৪ আয়াতসহ মোট ৭টি আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় আল্লাহ তা'আলা আরশে সমুন্নীত। হাদীছ দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে আল্লাহ আরশের উপর।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَضَى اللهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِيْ كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِيْ غَلَبَتْ غَضَبِيْ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন আল্লাহ মাখলূক্ব সৃষ্টির ইচ্ছা করলেন, তখন আরশের উপর তাঁর কাছে রক্ষিত এক কিতাবে লিপিবদ্ধ করেন যে, অবশ্যই আমার করুণা আমার ক্রোধের উপর জয়লাভ করেছে'।[১৩] আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন,

كَانَتْ زَيْنَبُ تَفْخَرُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُوْلُ زَوَّجَكُنَّ أَهَالِيْكُنَّ وَزَوَّجَنِى اللهُ تَعَالَى مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ.

'যয়নব (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর অন্যান্য স্ত্রীগণের উপর গর্ব করে বলতেন, তাঁদের বিয়ে তাঁদের পরিবার দিয়েছে, আর আমার বিয়ে দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ সপ্ত আসমানের উপর থেকে'।[১৪]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ يَقُوْلُ مَنْ يَدْعُوْنِيْ فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِيْ فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِيْ فَأَغْفِرَ لَهُ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে মহান আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেন, কে আছ যে আমাকে ডাকবে আর আমি তার ডাকে সাড়া দিব? কে আছ যে আমার কাছে কিছু চাইবে আর আমি তাকে তা দান করব। কে আছ যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে আর আমি তাকে ক্ষমা করব'।[১৫]

আল্লাহ তা'আলা আসমানে আছেন এটাও স্পষ্টভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ বলেন,

أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ أَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُوْرُ، أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ أَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ.

'তোমরা কি (এ বিষয়ে) নিরাপদ হয়ে গেছ যে, যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের সহ ভূমিকে ধসিয়ে দিবেন না? আর তখন ওটা আকস্মিকভাবে থরথর করে কাঁপতে থাকবে। অথবা তোমরা কি নিরাপদ হয়ে গেছ যে, আসমানে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদের উপর পাথর বর্ষণকারী ঝঞ্ঝাবায়ু প্রেরণ করবেন না? তখন তোমরা জানতে পারবে কিরূপ ছিল আমার সতর্কবাণী'? *(সূরা মুলক ১৬-১৭)*। এছাড়া সূরা আলে ইমরান-৫৫ এবং নিসা-১৫৮ আয়াত দ্বারাও তাঁর আসমানে অবস্থানের কথা প্রমাণিত হয়। হাদীছেও এ ব্যাপারে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। মু'আবিয়া বিন হাকাম আস-সুলামী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَتْ لِيْ جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِيْ قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّئْبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُوْنَ لَكِنِّيْ صَكَكْتُهَا صَكَّةً فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَلَا أُعْتِقُهَا؟ قَالَ ائْتِنِيْ بِهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ لَهَا أَيْنَ اللهُ؟ قَالَتْ فِي السَّمَاءِ قَالَ مَنْ أَنَا؟ قَالَتْ أَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ قَالَ أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ.

'আমার একজন দাসী ছিল। ওহুদ ও জাওয়ানিয়্যাহ নামক স্থানে সে আমার ছাগল চরাত। একদিন দেখি, নেকড়ে বাঘ একটি ছাগল ধরে নিয়ে গেছে। আমি একজন আদম সন্তান হিসাবে অনুরূপ রাগান্বিত হই যেভাবে তারা হয়। ফলে আমি তাকে এক থাপ্পড় মারি। অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসলে একে তিনি বড় অন্যায় মনে করলেন। তাই আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি কি তাকে আযাদ করব না? তিনি বললেন, তাকে আমার নিকট নিয়ে আস। আমি তাকে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট নিয়ে আসলাম। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ কোথায়? সে বলল, আসমানে। তিনি তাকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, আমি কে? তখন সে বলল, আপনি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তাকে মুক্ত করে দাও, কারণ সে একজন ঈমানদার মেয়ে'।[১৬]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوْا مَنْ فِى الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, দয়াশীল মানুষদের উপর দয়াময় আল্লাহ রহম করেন। সুতরাং তোমরা পৃথিবীবাসীর উপর দয়া কর, যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের উপর অনুগ্রহ করবেন।[১৭]

রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাতের জন্য মি'রাজে গিয়েছিলেন সপ্তম আসমানের উপরে এবং বার বার মূসা (আঃ)-এর নিকট থেকে আল্লাহ্র কাছে যাওয়ার বিষয়টি সবারই জানা।[১৮] আরো অনেক দলীল আছে যার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ আরশের উপর সমুন্নীত।[১৯] তাছাড়া মানুষের স্বভাবজাতও প্রমাণ করে আল্লাহ উপরে আছেন। কারণ কোন বিষয়ে আল্লাহকে সাক্ষী রাখতে চাইলে মানুষ আগে উপরের দিকে হাত উঠায়। দুই হাত তুলে দু'আ করার সময়ও মানুষের লক্ষ্য থাকে উপরের দিকে।

জাল হাদীছ ও অপব্যাখ্যা :

আল্লাহ আরশে সমুন্নীত এই ছহীহ আক্বীদাকে ভূলুণ্ঠিত করার জন্য একশ্রেণীর আক্বীদাভ্রষ্ট মহল এর অপব্যাখ্যা করেছে এবং মিথ্যা হাদীছ রচনা করেছে। এভাবে আল্লাহকে সর্বত্র বিরাজমান প্রমাণ করার অপচেষ্টা করা হয়েছে।

জাল হাদীছ সমূহ :

(ক) قَلْبُ الْمُؤْمِنِ عَرْشُ اللهِ **'মুমিনের হৃদয় আল্লাহ্র আরশ'**। বর্ণনাটি মিথ্যা ও উদ্ভট।[২০] উক্ত ভিত্তিহীন বর্ণনার মাধ্যমে প্রমাণ করার চেষ্টা

১৩. ছহীহ বুখারী হা/৩১৯৪, 'সৃষ্টির সূচনা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১; মিশকাত হা/২৩৬৪, 'দু'আ' অধ্যায়, 'আল্লাহ্র রহমতের প্রশস্ততা' অনুচ্ছেদ।
১৪. বুখারী হা/৭৪২০, 'তাওহীদ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২০।
১৫. বুখারী হা/১১৪৫; মুসলিম হা/৭৫৮; মিশকাত হা/১২২৩, 'ছালাত' অধ্যায়, 'তাহাজ্জুদের প্রতি উৎসাহ প্রদান' অনুচ্ছেদ।
১৬. ছহীহ মুসলিম হা/৫৩৭, 'মসজিদ সমূহ' অনুচ্ছেদ।
১৭. আবুদাঊদ হা/৪৯৪১; তিরমিযী হা/১৯২৪, 'সৎ আমল ও সদাচারণ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৬; মিশকাত হা/৪৯৬৯।
১৮. বুখারী হা/৩৮৮৭, 'মর্যাদা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪২।
১৯. বুখারী হা/৪৩৫১, 'মাগাযী' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৬১; মুসলিম হা/২৫০০, 'যাকাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪৮; ছহীহ মুসলিম হা/১২১৮ 'হজ্জ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৯; মুত্তাফাক্ব আলাইহ; মিশকাত হা/৫৮৬২।
২০. কাশফুল খাফা হা/১৮৮৬; ইমাম ছাগানী, আল-মাওযূ'আত হা/৭০।

করা হয় যে, আল্লাহ সব মুমিনের অন্তরে বিরাজমান। যেহেতু পবিত্র কুরআন দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ আরশের উপর সমুন্নীত। তাই মুমিনের অন্তরকে আল্লাহ্র আরশ কল্পনা করা হয়েছে।

(খ) اَلْقَلْبُ بَيْتُ الرَّبِّ 'অন্তর রবের ঘর'। এ বর্ণনাও মিথ্যা ও বাতিল।[২১] উক্ত বর্ণনা দ্বারা বুঝানো হয় যে, যার অন্তর আছে তার মধ্যেই আল্লাহ আছে। সুতরাং 'যত কল্লা তত আল্লাহ'। এভাবে সবকিছুর মধ্যেই আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও উপস্থিতি সাব্যস্ত করা হয়েছে।

কুরআনের আয়াতের অপব্যাখ্যা :

(ক) وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ 'আল্লাহ্র জন্যই পূর্ব ও পশ্চিম। সুতরাং তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও সেদিকেই আল্লাহ্র চেহারা রয়েছে' *(বাক্বারাহ ১১৫)*।

(খ) وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ 'আমি তার ঘাড়ের শাহ রগ অপেক্ষাও নিকটতর' *(ক্বাফ ১৬)*। (গ) অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لاَّ تُبْصِرُوْنَ 'আর আমি তোমাদের অপেক্ষা তার নিকটতর। কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না' *(ওয়াক্বি'আহ ৮৫)*। (ঘ) অন্যত্র রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা মূসা ও হারূণ (আঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেন, لاَ تَخَافَا إِنَّنِيْ مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى 'তোমরা ভয় করো না, আমি তো তোমাদের সঙ্গে আছি। আমি শুনি এবং দেখি' *(ত্বো-হা ৪৬)*।

(ঙ) অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেন, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ 'তোমরা যেখানেই থাক না কেন-তিনি তোমাদের সঙ্গেই আছেন। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন' *(হাদীদ ৪)*। এছাড়া আরশে অবস্থান বলতে 'মালিক হওয়া' ও 'আরশ সৃষ্টির ইচ্ছা করা' ইত্যাদি রূপক অর্থ করা হয়েছে।[২২]

পর্যালোচনা :

(ক) উক্ত আয়াতগুলো পেশ করে প্রমাণ করা হয় স্বয়ং আল্লাহ সবার সাথেই আছেন। তিনি সর্বত্র বিরাজমান। যেমন- ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত কুরআনের সূরা বাক্বারার ১১৫ নং আয়াতটির অনুবাদে বলা হয়েছে, 'যেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাও না কেন, সেদিকই আল্লাহ্র দিক'।[২৩] আর মাসিক মদীনার সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত মা'রেফুল কুরআনে অনুবাদ করা হয়েছে, 'অতএব তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাও, সেদিকেই আল্লাহ বিরাজমান'।[২৪] দুই ধরনের অর্থ পরিলক্ষিত হচ্ছে। অথচ কোনটিই সঠিক হয়নি।

মূলতঃ রাসূল (ছাঃ) এবং কতিপয় ছাহাবী ফজরের ছালাতের সময় ক্বিবলা বুঝতে না পেরে অন্য দিকে মুখ করে ছালাত আদায় করেন। তারই প্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাযিল হয়।[২৫] অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) সওয়ারীর উপর নফল ছালাত আদায় করতেন। আর সওয়ারী যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে যেত। তখন উক্ত আয়াত নাযিল হয়।[২৬] তাই ইবনু আব্বাস, মুজাহিদ প্রমুখ উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেন, এর উদ্দেশ্য 'আল্লাহ্র ক্বিবলা'।[২৭]

অনুরূপভাবে সূরা ত্বো-হার ৩৯ নং আয়াতে আল্লাহ্র চোখের অনুবাদ করা হয়েছে 'দৃষ্টি'।[২৮] যা কুরআনের আয়াতের অর্থের বিকৃতি। এভাবে প্রায় স্থানে পবিত্র কুরআনের অনুবাদ ও ব্যাখ্যায় ছাহাবীদের অর্থ ও ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হয়নি।

(খ) অনুরূপ সূরা ক্বাফ ও ওয়াক্বি'আর মধ্যে আল্লাহ্র নিকটবর্তী থাকার যে কথা এসেছে তার উদ্দেশ্য হল, ফেরেশতাদের নিকটবর্তী হওয়া। অর্থাৎ ফেরেশতারা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নিযুক্ত বলেই আল্লাহ্র দিকে সম্পর্কিত করা হয়েছে।[২৯] যেমন আল্লাহ বলেন, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ 'যখন আমি উহা পাঠ করি, তখন আপনি সেই পাঠের অনুসরণ করুন' *(ক্বিয়ামাহ ১৮)*। এখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট জিবরীল (আঃ)-এর কুরআন পাঠ উদ্দেশ্য। অথচ আল্লাহ নিজের দিকে সম্পর্কিত করেছেন। আল্লাহ্র নির্দেশে যেহেতু জিবরীল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট কুরআন পাঠ করেন, সেহেতু আল্লাহ কুরআন পাঠকে নিজের দিকে সম্পর্কিত করেছেন *(ঐ)*।

(গ) আল্লাহ সাথে থাকার উদ্দেশ্য হল, তাঁর দৃষ্টি ও ক্ষমতা সর্বত্র থাকা। যেমন সূরা হাদীদের ৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন,

أَى رَقِيْبٌ عَلَيْكُمْ شَهِيْدٌ عَلَى أَعْمَالِكُمْ حَيْثُ أَنْتُمْ وَأَيْنَ كُنْتُمْ مِنْ بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ فِىْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فِى الْبُيُوْتِ أَوِ الْقِفَارِ الْجَمِيْعِ فِىْ عِلْمِهِ عَلَى السَّوَاءِ وَتَحْتَ بَصَرِهِ وَسَمْعِهِ فَيَسْمَعُ كَلاَمَكُمْ وَيَرَى مَكَانَكُمْ وَيَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَنَجْوَاكُمْ.

'অর্থাৎ তিনি তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক এবং তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের আমলসমূহের সাক্ষী। তোমরা ভূভাগে বা সমুদ্রে, রাতে বা দিনে, বাড়িতে বা মরুভূমিতে যেখানেই অবস্থান কর না কেন, সবকিছুই সমানভাবে তাঁর জ্ঞান এবং তাঁর শ্রবণ ও দৃষ্টির মধ্যে আছে। তিনি তোমাদের কথা শোনেন, অবস্থান দেখেন এবং গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় সম্পর্কে জানেন'।[৩০] হক্বপন্থী সালাফী ওলামায়ে কেরাম এটাই বুঝেছেন।

সুধী পাঠক! অসংখ্য মুসলিম ছালাত আদায় করে, ছিয়াম পালন করে, হজ্জ করে, যাকাত দেয়, ইসলামী আন্দোলন করে, দাওয়াতী কাজ করে কিন্তু আল্লাহ সম্পর্কে তাদের ধারণা ভুল। তারা অন্য দিকে যত পরিশ্রম করে আক্বীদার ক্ষেত্রে এতটুকুও করতে আগ্রহী নয়। তারা যে আল্লাহ্র ইবাদত করে, যে আল্লাহ্র কাছে সাহায্য চায় সে আল্লাহ অস্তিত্বহীন, নিরাকার। অথচ উক্ত আক্বীদার সাথে আল্লাহ্র গুণের দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। মূলতঃ আল্লাহ সম্পর্কে তাদের উক্ত আক্বীদা পরস্পর বিরোধী। কারণ একদিকে তারা নিরাকার সাব্যস্ত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে, অন্যদিকে তাঁকে সর্বত্র বিরাজমান প্রমাণ করতে যাথাসাধ্য চেষ্টা করে। এটা কেমন নীতি? অতএব সবাইকে আল্লাহ সম্পর্কে বিশুদ্ধ আক্বীদা পোষণ করতে হবে। এক্ষেত্রে কোনরূপ অবহেলা ও অলসতা করা যাবে না। যেমন ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মন্তব্য লক্ষণীয়।

قَالَ أَبُوْ حَنِيفَةَ عَمَّنْ قَالَ لَا أَعْرِفُ رَبِّى فِي السَّمَاءِ أَمْ فِي الْأَرْضِ فَقَدْ كَفَرَ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُوْلُ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى وَعَرْشُهُ فَوْقَ سَبْعِ سَمَوَاتٍ.

'আবু হানীফা (রহঃ) ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন, যে বলে আল্লাহ আসমানে আছেন, না যমীনে আছেন আমি তা জানি না, সে কুফরী করবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, রহমান আরশের উপর সমুন্নীত'। আর তাঁর আরশ সপ্তম আসমানের উপরে'।[৩১]

---

২১. আব্দুর রহমান সাখাবী, আল-মাক্বাছিদুল হাসানাহ হা/৭৭৬, পৃঃ ৪৯২; মোল্লা আলী ক্বারী, আল-মাছনূ ফী মা'রেফাতিল হাদীছিল মাওযূ হা/২১৭, পৃঃ ১৩১; কাশফুল খাফা হা/১৮৮৪ ও ১৮৮৫।
২২. ইবনুল ক্বাইয়িম, মুখতাছার ছাওয়ায়েকুল মুরসালাহ ২/১৫৩ পৃঃ।
২৩. আল-কুআনুল করীম (ঢাকা : ইফাবা, জুন ১৯৯৮), পৃঃ ২৯।
২৪. মুফতী মুহাম্মদ শাফী, অনুবাদ ও সম্পাদনা : মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, তাফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন (সঊদী আরব : খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহদ, কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, তাবি), পৃঃ ৫৫।
২৫. তিরমিযী হা/৩৪৫, 'ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৪৫; ইবনু মাজাহ হা/১০২০।
২৬. ছহীহ মুসলিম হা/১৬৪৪ ও ১৬৪৬, 'মুসাফিরের ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪।
২৭. তিরমিযী হা/২৯৫৮, 'তাফসীর' অধ্যায়, সূরা বাক্বারা ১১৫; তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/৩৯১ পৃঃ; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২/৩৬০।

---

২৮. মাআরেফুল কুরআন পৃঃ ৮৫১।
২৯. শায়খ উছায়মীন, আল-কাওয়াইদুল মুছলা ফী ছিফাতিল্লাহি ওয়া আসমায়িহিল হুসনা, পৃঃ ৭০-৭১।
৩০. তাফসীর ইবনে কাছীর, ৭ম খ-, পৃঃ ৫৬০।
৩১. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূঊ ফাতাওয়া ৫/৪৭ পৃঃ।

ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় যৌবনকালের ভূমিকা

-আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস

ভূমিকা :

মহান আল্লাহ্‌র এই সুন্দর ভুবনে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির দিক নির্দেশনা সম্বলিত স্বভাব ও শান্তির গ্যারান্টিযুক্ত একমাত্র জীবন ব্যবস্থা ইসলাম। আল্লাহ পাক বলেন, إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবন ব্যবস্থা হ'ল ইসলাম' *(আলে-ইমরান ৩/১৯)*। পবিত্র কুরআন, ছহীহ হাদীছ ও ইসলামের ইতিহাস অধ্যয়ন করলে যেখা যায় যে, ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় যুবসমাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। চারিদিকে যখন যুলুম, অত্যাচার ও নির্যাতনের জয়জয়কার চলছিল; অজ্ঞতা, মূর্খতা, হঠকারিতা এবং গোঁড়ামীর কারণে তাওহীদ যখন ভূলুণ্ঠিত হচ্ছিল, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ইবাদতখানা বায়তুল্লাহ শরীফে ৩৬০টি মূর্তির সামনে মানুষ মাথা নত করছিল এবং নযর-নেয়াজ পেশ করছিল, তখন যুবকদের হুঙ্কার ও তাকবীর ধ্বনির মাধ্যমে এবং আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে তাওহীদ ও সুন্নাতের চির অম্লান বাণী উচ্চারিত হয়েছিল এবং প্রকাশ্যে কা'বা ঘরে আল্লাহ্‌র ইবাদত করা শুরু হয়েছিল। তাই ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় যৌবনকালের গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু কথা তুলে ধরার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি। যাতে মানুষ এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তাদের যৌবনের এই সোনালী সময়টাকে অহির বিধান প্রতিষ্ঠায় ব্যয় করতে পারে।

যৌবনকাল : কিছু কথা

একটু চিন্তাশীল মন নিয়ে একনিষ্ঠভাবে ভাবলে যার প্রতি তৎক্ষণাৎ সিজদায় লুটিয়ে পড়তে হয়, সেই মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌র চিরন্তন রীতি অনুযায়ী এ সুন্দর ধূলির ধরণীতে প্রতিনিয়ত মানুষের আগমন ও প্রত্যাগমন ঘটছে। এ আগমন হয় মানুষের অত্যন্ত অসহায় অবস্থায়। যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই থাকে না। যেমন-মহান আল্লাহ বলেন, هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا- إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا- 'মানুষের উপর এমন কিছু সময় অতিবাহিত হয়েছে যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না। আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু থেকে এভাবে যে, তাকে পরীক্ষা করব। অতঃপর তাকে করে দিয়েছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন' *(দাহর ৭৬/১-৩)*। তিনি আরো বলেন, وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 'আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে বের করেছেন যখন তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর দান করেছেন যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর' *(নাহল ১৬/৭৮)*।

এ পৃথিবীতে মানুষের স্বাভাবিক জীবন প্রবাহের ধারাকে মোটামুটি তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়। শৈশব, যৌবন ও বার্ধক্য। এই তিনকালের মধ্যে সকল বিবেচনায় যৌবনকাল হ'ল শ্রেষ্ঠ সময়। শৈশবে মানুষ থাকে অসহায় ও পরনির্ভর। পিতা-মাতা ও অন্যের সহযোগিতা ব্যতীত সে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না এবং এ সময় তার কোন চিন্তার সুষ্ঠু বিকাশ ঘটেনা। অনুরূপভাবে বার্ধক্যেও সে অসহায় দুর্বল ও পরনির্ভর হয়ে পড়ে। মনের ইচ্ছা থাকলেও সে সবকাজ সঠিকভাবে সম্পাদন করতে পারে না। এমনকি চিন্তাশক্তির বিলোপ পর্যন্ত ঘটে থাকে। তাইতো বলা হয়, 'গাছ পাকলে সার আর মানুষ পাকলে অসাড়'। কিন্তু যৌবনকাল এ দু'য়ের ব্যতিক্রম। যৌবনকালে মানুষ অসাধ্য সাধনে আত্মনিয়োগ করতে পারে। তপ্ত লহু ও বাহুর শক্তিবলে শত ঝড়-ঝাপটা, অসত্যের কালোমেঘ ও রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে সত্যের, ন্যায়ের ও অহি-র বিধান প্রতিষ্ঠায় বীর বিক্রমে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। ইংরেজিতে বলা হয় যে, Youth is called the golden season of life 'যৌবনকে জীবনের সোনালী কাল বলা হয়'। আল্লাহ প্রদত্ত অফুরন্ত নে'মতরাজির মধ্যে অন্যতম নে'মত হচ্ছে এই যৌবনের শক্তিমত্তা। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ 'তোমরা যেসব নে'মত ভোগ কর তাতো আল্লাহ্‌রই নিকট হতে; আবার যখন দুঃখ-দৈন্য তোমাদেরকে স্পর্শ করে তখন তোমরা তাঁকেই ব্যাকুলভাবে আহ্বান কর' *(নাহল ১৬/৫৩)*।

যৌবনকালের জবাবদিহিতা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যৌবনকালকে গণীমাতের মাল তথা মূল্যবান সম্পদ হিসাবে উল্লেখ করে তা মূল্যায়ন করতে তাগিদ দিয়েছেন। কেননা এ সময় সম্পর্কে পরকালে জবাবদিহিতা করতে হবে। আল্লাহ বলেন,

عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الأَوْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ.

'আমর ইবনু মায়মূন আল-আওদী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে উপদেশ স্বরূপ বলেন, পাঁচটি বস্তুর পূর্বে পাঁচটি বস্তুকে গণীমত মনে করো। যথা (১) তোমার বার্ধক্য আসার পূর্বে যৌবনকে (২) পীড়িত হওয়ার পূর্বে সুস্বাস্থ্যকে (৩) দারিদ্র্যতার পূর্বে সচ্ছলতাকে (৪) ব্যস্ততার পূর্বে অবসরকে (৫) মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৭৪, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯৪৭, ৯/২০৫ পৃঃ)*।

আল্লাহ প্রদত্ত যৌবনের এই মহা মূল্যবান সময়টাকে আল্লাহ্‌র অহির বিধান প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় ব্যয় না করে হেলায়-দোলায় নষ্ট করলে কিংবা মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত তন্ত্র-মন্ত্র, ইযম-তরীকা ও শিরক-বিদ'আত এবং মনগড়া ইবাদত প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় ব্যয় করলে তার কড়ায় গণ্ডায় হিসাব দিতে হবে কিয়ামতের কঠিন দিবসে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلاَهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ .

'ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন পাঁচটি প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আদম সন্তানকে স্ব স্ব স্থান থেকে এক কদমও নড়াতে দেওয়া হবে না। যথা (১) সে তার জীবনকাল কিভাবে অতিবাহিত করেছে (২) যৌবনকাল কোথায় ব্যয় করেছে (৩) ধন-সম্পদ কিভাবে উপার্জন করেছে (৪) কোন পথে তা ব্যয় করেছে (৫) সে দ্বীনের কতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছে এবং অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী সে আমল করেছে কিনা' *(তিরমিযী হা/২৪১৭; মিশকাত হা/৫১৯৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯৭০, ৯/২১৩ পৃঃ)*।

যৌবনের এই সোনালী সময়ে মানুষের দেহ সাধারণত থাকে সুস্থ, সবল, শক্ত ও উদ্দীপনায় পূর্ণ। এ সময় তার হাতে থাকে উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত সময়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, অধিকাংশ মানুষই তা সুষ্ঠুভাবে ব্যয় করে না। এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ.

'ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, দু'টি নে'মতের ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ ধোঁকার মধ্যে রয়েছে। তাহ'ল সুস্থতা ও সুস্বাস্থ্য' *(বুখারী হা/৬৪১২, 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়; মিশকাত হা/৫১৫৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯২৮, ৯/১৯৯ পৃঃ)।*

ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, من استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط ومن استعملهما في معصية الله فهو المغبون– 'যে ব্যক্তি তার সচ্ছলতা ও সুস্বাস্থ্যকে আল্লাহ্র আনুগত্যের কাজে লাগায়, সে ব্যক্তি হ'ল ঈর্ষণীয়। আর যে ব্যক্তি ঐ দু'টি বস্তুকে আল্লাহ্র অবাধ্যতায় কাজে লাগায়, সে ব্যক্তি হ'ল ধোঁকায় পতিত' *(ফাৎহুল বারী হা/৬৪১৪-এর ব্যাখ্যা; আত-তাহরীক, ১৬তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, নভেম্বর ২০১২, পৃঃ ৬)।*

যৌবন যেমন সুস্থতা ও পূর্ণতার স্বরূপ, তেমনি পরিপূর্ণ জীবন ও প্রাণের স্বরূপ। হক্বের ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের শ্রেষ্ঠ সময় যৌবনকাল। তাইতো ইসলাম শিশু, পঙ্গু, অসুস্থ, বৃদ্ধ ও নারীদের জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম ফরয করেনি। কবি বলেছেন, 'এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাওয়ার শ্রেষ্ঠ সময় তার'।

জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই যৌবনের জয়গান গেয়েছেন। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকদের সাহিত্যকর্মের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ দখল করে আছে এই যৌবনের স্তবগান এবং উৎসাহ ও উদ্দীপনাময় বক্তব্যের সমাহার। বর্তমান ঘুণেধরা এই সমাজের অশ্লীলতা, নগ্নতা, বেহায়পনা, নির্লজ্জতা ও যেনা-ব্যভিচার যুবসমাজই পারে দূর করতে। এক্ষেত্রে যুবকদের ছহীহ পদ্ধতিতে বিবাহ করা একান্ত যরূরী। অন্যথা ছিয়াম পালন করে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখবে। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, মহানবী (ছাঃ) যুবকদের লক্ষ্য করে বলেন, يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ 'হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে বিবাহের সামর্থ্য রাখে সে যেন বিবাহ করে। কেননা উহা চক্ষুকে অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে রক্ষা করে। আর যে সামর্থ্য রাখে না, সে যেন ছিয়াম রাখে। কেননা উহা তার প্রবৃত্তিকে দমন করার উপযুক্ত মাধ্যম' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩০৮০, 'বিবাহ' অধ্যায়; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৯৪৬, ৬/১৪২ পৃঃ)।*

অনুরূপভাবে ছাহাবায়ে কেরামগণও যুবকদেরকে বিভিন্নভাবে স্বাগত জানিয়েছেন। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) (মৃত ৭৪ হিঃ) কোন মুসলিম যুবককে দেখলে খুশি হয়ে বলতেন, مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُوَسِّعَ لَكُمْ فِي الْمَجْلِسِ، وَأَنْ نُفَهِّمَكُمُ الْحَدِيثَ فَإِنَّكُمْ خُلُوفُنَا، وَأَهْلُ الْحَدِيثِ بَعْدَنَا 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অছিয়ত অনুযায়ী আমি তোমাদেরকে মারহাবা জানাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে তোমাদের জন্য মজলিস প্রশস্ত করার ও তোমাদেরকে হাদীছ বুঝাবার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। কেননা তোমরাই আমাদের পরবর্তী বংশধর এবং পরবর্তী আহলেহাদীছ' *(ইমাম আবু বকর আহমাদ বিন আলী আল-খত্বীব বাগদাদী (মৃত ৪৬৩ হিঃ), শারফু আছহাবিল হাদীছ, পৃ ১২; আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (থিসিস) টীকা-৫, পৃঃ ৬৬)।*

যৌবনের শক্তিমত্তা : কবি সাহিত্যিকদের দৃষ্টিতে

যৌবনকাল হচ্ছে অফুরন্ত প্রাণশক্তির আধার। যা মানুষের জীবনকে করে গতিশীল ও প্রত্যাশাময়। দুর্বার উদ্দীপনা, ক্লান্তিহীন গতি, অপরিসীম ঔদার্য, অফুরন্ত প্রাণ চঞ্চলতা এবং অটল সাধনার প্রতীক যৌবন মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে সকল বাধাকে পেরিয়ে সমাজকে কুসংস্কার মুক্ত করে নতুন স্বপ্নময় খেলাফতে রাশেদার সোনালী ইতিহাস কায়েম করতে পারে। যুবসমাজই পারে বিপন্ন মানবতার পাশে দাঁড়িয়ে সেবাব্রতী ভূমিকা পালন করতে। তাইতো দেখা যায় পৃথিবীর প্রতিটি দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনী যেমন সেনা, নৌ, বিমান ও পুলিশ ইত্যাদিতে যুবকদেরকেই নিয়োগ দেওয়া হয় এবং বার্ধক্যে পৌঁছার পূর্বেই তাদেরকে অবসরে পাঠানো হয়। কারণ যেকোন সংকটময় মুহূর্তে তারা যাতে দেশ রক্ষায় প্রবলশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

বাংলার বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬ খ্রিঃ) যুবক ও যৌবন ধর্মের গান গেয়েছেন। তিনি তারুণ্যের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা, অনুরাগ ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। ১৯৩২ সালে সিরাজগঞ্জে মুসলিম যুবসমাজের অভিনন্দনের উত্তরে তাদের উদ্দেশ্যে তিনি যে প্রাণোচ্ছল ভাষণ প্রদান করেছিলেন তারই পরিমার্জিত ও লিখিতরূপ তাঁর 'যৌবনের গান' প্রবন্ধটি। সেখানে তিনি বলেন, 'আমি যে গান গাই, তাহা যৌবনের গান। তারুণ্যে ভরা ভাদরে যদি আমার গান জোয়ার আনিয়া থাকে, তাহা আমার অগোচরে, যে চাঁদ সাগরে জোয়ার জাগায় সে হয়ত তাহার শক্তি সম্মন্ধে আজও নাওয়াকিফ'।......

'আমার একমাত্র সম্বল-আপনাদের তরুণদের প্রতি আমার অপরিসীম ভালবাসা; প্রানের টান। তারুণ্যকে, যৌবনকে, আমি যেদিন হইতে গান গাহিতে শিখিয়াছি। সেদিন হইতে বারে বারে সশ্রদ্ধ সালাম করিয়াছি, সশ্রদ্ধ নমস্কার নিবেদন করিয়াছি, জবা কুসুম শঙ্কাশ তরুণ অরুণকে দেখিয়া প্রথম মানব যেমন করিয়া সশদ্ধ নমস্কার করিয়াছিলেন; আমার প্রথম জাগরণ প্রভাতে তেমন সশ্রদ্ধ বিস্ময় লইয়া যৌবনকে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছি, তাহার স্তবগান গাহিয়াছি। তরুণ অরুণের মতোই যে তারুণ্য তিমির-বিদারী, সে যে আলোর দেবতা। রঙ্গের খেলা খেলিতে খেলিতে তাহার উদয়, রং ছড়াইতে ছড়াইতে তাহার অস্ত। যৌবন সূর্য যেথায় অস্তমিত, দুঃখের তিমির-কুণ্ডলা নিশীথিনীর সেই তো লীলাভূমি'।

তারুণ্য বা বার্ধক্যকে সব সময় বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না। কারণ তরুণ ও তারুণ্য এবং যুবক ও যৌবন এক জিনিস নয়। যার মনে শক্তি আছে, যে মিথ্যা, অন্যায় এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস রাখে, যারা সমাজ থেকে কুসংস্কার, অজ্ঞতা, শিরক, বিদ'আত, মানব মস্তিষ্ক প্রসূত মতবাদ ইত্যাদি দূর করে অহির বিধান প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর এবং যে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে মৃত্যু ভয়ে ভীত হয় না, সেই যুবক। তার বয়স যদি সত্তর-আশি বছর হয়, বয়সের ভারে তার দেহ যদি ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়ে তবুও সে যুবক। যৌবন দেহের বিষয় নয়। মনের শক্তিমত্তাই প্রকৃত যৌবন। যেমন কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন, 'বহু যুবককে দেখিয়াছি যাহাদের যৌবনের উর্দির নিচে বার্ধক্যের কঙ্কাল মূর্তি। আবার বহু বৃদ্ধকে দেখিয়াছি, তাঁহাদের বার্ধক্যের জীর্ণাবরণের তলে মেঘমুক্ত সূর্যের মত প্রদীপ্ত যৌবন'। এজন্য যারা 'পুরাতনকে, মিথ্যাকে, মৃত্যুকে আঁকড়িয়ে পড়িয়া থাকে, মায়াচ্ছন্ন নব যাত্রীর চলার ছন্দে ছন্দ মিলাইয়া যাহারা কুচকাওয়াজ করিতে জানেনা, পারে না, যাহারা জীব হইয়াও জড়, যাহারা অটল সংস্কারের পাষাণস্তূপ আঁকড়িয়ে পড়িয়া আছে, যারা নব অরুণোদয় দেখিয়া নিদ্রাভঙ্গের ভয়ে দ্বাররুদ্ধ করিয়া পড়িয়া থাকে, আলোকপিয়াসী প্রাণচঞ্চল শিশুদের কলকোলাহলে যাহারা বিরক্ত হইয়া অভিসম্পাত করিতে থাকে, বয়স তার যাইহোক হোক না কেন সে কখনো তরুণ নয়। তরুণ তারাই 'যাহার শক্তি অপরিমাণ, গতিবেগ ঝঞ্ঝার ন্যায়, তেজ নির্মেঘ আষাঢ় মধ্যাহ্নের মার্তণ্ডপ্রায়, বিপুল যাহার আশা, ক্লান্তিহীন যাহার উৎসাহ, বিরাট যাহার ঔদার্য, অফুরন্ত যাহার প্রাণ, অটল যাহার সাধনা, মৃত্যু যাহার মুঠিতলে'।

পৃথিবীর যেকোন আদর্শ প্রতিষ্ঠার মূল ভূমিকায় ছিল যুবসমাজ। তারাই দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ। তাদের ত্যাগ-তিতিক্ষা ও জান-মালের কুরবানীর বিনিময়ে ইসলামের আদি যুগ থেকে হক্বের বিজয়ী পতাকা উড্ডীন হয়েছে ও বাতিলের পরাজয় সূচিত হয়েছে। খালেছ তাওহীদে বিশ্বাসী সুন্নাতের অনুসারী একদল মুসলিম যুবক কর্মী বাহিনীর দ্বারাই

নমরূদ ফেরাঊন ও কারূণ এবং যুগে যুগে তাদের উত্তরসূরিরা পরাজিত হয়েছে। তাইতো বাংলার জাতীয় কবি কাজী নজরুলের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে :

আমি যে চির অজেয়
ঝুটা কানূনের নিগড় আমাকে করিতে পারেনি জয়
কত নমরূদ, কত ফেরাউন, কত শাদ্দাদ ও কারূণ
আসিয়াছে মোর এই চলাপথে হইয়া বাধা দারুণ
পুড়ি নাই আমি নমরূদী হুতাশনে
বিকাইনি আমি বিপুল কারূণী ধনে
শাদ্দাদের ঐ অহংকারী মাথা বালুতে মিশেছে শেষে
ফেরাঊন গেছে নীল দরিয়ায় ভেসে
নমরূদ শিরে পড়েছে পয়যার
আমি মুসলিম
এক আল্লাহ ছাড়া করি না কারো তাসলীম
বল সবাই উচ্চ কণ্ঠে
নারায়ে তাকবীর!!

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিম যুবকই তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য ভুলে গিয়ে জ্ঞানার্জন ছেড়ে কুচক্রীদের পাতানো ফাঁদে পড়ে ঈমান আমল উভয়ই হারাচ্ছে। আবার কেউ কেউ কালের দোহাই দিয়ে গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিচ্ছে।

যুবকদের প্রতি আহ্বান :

তরুণ ও যুবকরাই পারে অজ্ঞতা, কুসংস্কার, ভীরুতা ও বাতিলের কালো থাবা থেকে জাতিকে মুক্ত করে অন্ধকারের বদ্ধ দুয়ার খুলে ঝড়ের বেগে এগিয়ে গিয়ে আলোকিত দিন গড়তে। তাইতো আধুনিক যুগের আরবী সাহিত্যের কবি সম্রাট, তারুণ্য উদ্দীপনার ঝাণ্ডাবাহী কবি আহমাদ শাওক্বী (১৮৭০-১৯৩২ খ্রিঃ) যুবকদের পশ্চাদপদতা, অলসতা ও অজ্ঞতা পরিত্যাগের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার জন্য সোনালী প্রভাতের সূচনার আহ্বান জানিয়েছেন তাঁর إلي الشباب 'যুবকদের উদ্দেশ্যে' নামক কবিতার মাধ্যমে। সেখানে তিনি বলেন

١. عصركم حر مستقبلكم * في يمين الله خير الامناء
٢. لا تقولوا حطنا الدهر فما * هو الا من خيال الشعراء
٣. هل علمتم امة في جهلها * ظهرت في المجد حسناء الرداء؟
٤. فخذوا العلم علي أعلامه * واطلبوا الحكمة عند الحكماء
٥. واقرءوا تاريخكم واحتفظوا * بفصيح جاءكم من فصحاء
٦. واحكموا الدنيا بسلطان فما * خلقت نصرتها للضعفاء
٧. واطلبوا المجد علي الارض فان * هي ضاقت فاطلبوه في السماء.

১. (হে যুবসমাজ!) তোমাদের যুগ স্বাধীন, আর তোমাদের ভবিষ্যৎ আল্লাহ্‌র ডান হাতে নিরাপদ।

২. তোমরা বলো না যে, কাল আমাদেরকে অধোমুখি করে রেখেছে। কেননা এটা কবিদের কল্পনা বৈ কিছুই নয়।

৩. তোমরা কি সেই জাতি সম্পর্কে জানতে পেরেছ, যারা অজ্ঞতার মাঝে ডুবে আছে, অথচ তাদের মর্যাদায় উত্তম ও স্থায়ী সভ্যতা আত্মপ্রকাশ করছে?

৪. সুতরাং তোমরা আলিমদের নিকট থেকে জ্ঞান আহরণ কর এবং প্রজ্ঞাবানদের নিকট থেকে প্রজ্ঞা অন্বেষণ কর।

৫. তোমরা তোমাদের ইতিহাস পড় এবং তা প্রাঞ্জল ভাষার মাধ্যমে সংরক্ষণ কর এমনভাবে যেন ভাষা তোমাদের নিকট প্রাঞ্জল ভাষীদের নিকট থেকে এসেছে।

৬. তোমরা ক্ষমতার সাথে পৃথিবীকে শাসন কর। কেননা দুর্বলদের জন্য কোন প্রকার বিজয় সৃষ্টি করা হয়নি।

৭. তোমরা পৃথিবীতে মর্যাদা অন্বেষণ কর। আর তা (অন্বেষণের নেশায়) পৃথিবী সংকীর্ণ হয়ে পড়লে, আকাশে তা অন্বেষণ কর।

অন্যদিকে যোগ্য নেতৃত্ব ও কর্মতৎপরতার মাধ্যমে উন্নত দেশ গঠন এবং তার উন্নতি ও অগ্রগতির ধারাকে অব্যাহত রাখতে যুবসমাজই এগিয়ে আসতে পারে। এজন্য তাদেরকে উপযুক্ত জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে নিজেদের ও দেশের যাবতীয় ত্রুটি, দুর্বলতা ও আলস্য তন্দ্রা দূর করতে হবে। নৈরাশ্য ও হতাশাকে পদদলিত করে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে স্বাধীনতার সোনালী আশায় বুক বেঁধে দৃঢ়তার সাথে সত্যের পথে এগিয়ে আসতে হবে। এ দিকেই ইঙ্গিত করে 'শায়েরুন নীল' বা নীল নদের কবি নামে পরিচিত বিপ্লবী মিসরীয় আরবী কবি হাফিয ইবরাহীম (১৮৭২-১৯৩২ খ্রিঃ) তাঁর تحية العام الهجري 'হিজরী সনের অভিবাদন' কবিতায় বলেন,

(١) رجال الغد المأمول انا بحاجة * الي قادة تبني و شعب يعمر
(٢) رجال الغد المأمول انا بحاجة * الي عالم يدري وداع يذكر
....
(٣) رجال الغد المأمول انا بحاجة * اليكم فسدوا النقص و شمروا
(٤) رجال الغد المأمول لا تتركوا غدا* يمر مرور الامس والعيش اغبر
(٥) رجال الغد المأمول ان بلادكم * تناشدكم بالله ان تتذكروا
(٦) عليكم حقوق للبلاد اجلها * تعهد روض العلم فالروض مقفر
(٧) قصاري مني اوطانكم ان تري لكم * يدا تبتني مجدا ورأسا يفكر
(٨) فكونوا رجالا عاملين اعزة * وصونوا حمي اوطانكم وتحرروا

(১) হে আগামী দিনের প্রত্যাশিত পুরুষরা (যুবসমাজ)! আমাদের এমন কিছু (যুবক ও উদ্দমী) নেতার প্রয়োজন, যারা (দেশ) গড়বে এবং এমন জাতির যারা (দেশে) আবাদ করবে।

(২) হে আগামী দিনের প্রত্যাশিত পুরুষরা (যুবসমাজ)! আমাদের প্রয়োজন এমন একজন আলেমের যিনি সঠিক বিষয় জানবেন (এবং জানাবেন)। আর এমন একজন দাঈর যিনি (জনগণকে) উপদেশ দিবেন।

(৩) হে আগামী দিনের প্রত্যাশিত পুরুষরা (যুবসমাজ)! তোমাদের নিকট আমাদের (আশা ও) প্রয়োজন রয়েছে। তাই তোমরা আমাদের অভ্যন্তরীণ ত্রুটি দূর কর এবং প্রস্তুত হও।

(৪) হে আগামী দিনের প্রত্যাশিত পুরুষরা (যুবসমাজ)! তোমরা আগামীকালকে গতকালের মত অতিবাহিত হতে দিও না, যাতে জীবন ছিল ধুলায় ধূসরিত।

(৫) হে আগামী দিনের প্রত্যাশিত পুরুষরা (যুবসমাজ)! তোমাদের দেশ তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছে যে, তোমরা (দেশের) কথা স্মরণ করবে।

(৬) তোমাদের উপর দেশের কতকগুলো অধিকার রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম হ'ল, জ্ঞানের বাগিচার পরিচর্যা কর। কেননা উহা উজাড় হয়েছে।

(৭) তোমাদের মাতৃভূমির একান্ত আশা যে, উহা তোমাদের জন্য এমন একটি (কর্মঠ) হাত দেখবে, যা উহার মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করবে এবং এমন একটি মাথা দেখবে যা (গঠনমূলক) চিন্তা করবে।

(৮) অতএব নিজেদেরকে সম্মানিত করতে তোমরা সকলে কর্মী হয়ে যাও এবং তোমাদের মাতৃভূমির সংরক্ষণ কর এবং স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব অটুট রাখ।

ঠিক একইভাবে বাংলাদেশের বিশিষ্ট আধুনিক কবি আহসান হাবীব (১৯১৭-১৯৮৫ খ্রিঃ)-এর 'আহ্বান' কবিতার প্রতি ছত্রে ছত্রে তারই প্রতিধ্বনি হয়েছে। কবি বলেন,

আয় অন্ধকারের বদ্ধ দুয়ার খুলে,
বুনো হাওয়ার মতো আয়রে দুলে দুলে
গেয়ে নতুন গান,
আজ মরা গাঙ্গের প্রান্তে নতুন সুরে
ছড়িয়ে দেবে প্রাণ।
যাক বান ডেকে যাক বাইরে এবং ঘরে
আসুক ঝড়ো হাওয়া
এই আকাশ মাটি উঠুক কেঁপে কেঁপে
শুধু ঝড় বয়ে যাক মরা জীবন ছেড়ে
বিজলী দিয়ে হাওয়া
আয় ভাই বোনেরা ভয়-ভাবনাহীন
সেই বিজলী দিয়ে গড়ি নতুন দিন।

পৃথিবী তাকিয়ে আছে তরুণদের জাগরণ কামনায়। অধিকার বঞ্চিতদের তারাই সচেতন করে তুলতে পারে। অসত্য, অন্যায়কে বিদূরিত করে সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে তাওহীদের বাণী প্রতিষ্ঠায় তাদের জয়যাত্রা চলবে ভবিষ্যতের দিকে। যেমন কবি আব্দুল কাদির (১৯০৬-১৯৮৪ খ্রিঃ) তার 'জয়যাত্রা' কবিতায় তুলে ধরেছেন,

যাত্রা সবে শুরু হোক হে নবীন, করো হানি দ্বারে
নবযুগ ডাকিছে তোমারে
তোমার উত্থান মাগি, ভবিষ্যৎ রয়ে প্রতীক্ষায়,
রুদ্ধ বাতায়ন পাশে শঙ্কিত আলোক শিহরায়।
সুপ্ত তাজি বরি লও তারে, লুপ্ত হোক অপমান
দেখা দিক শ্বাশত কল্যাণ
....
অজস্র মৃত্যু লঙ্গি, চলো অনায়াসে
মৃত্যুঞ্জয়ী জীবন উল্লাসে।

যৌবন শক্তির অপব্যবহার : একটি বিশ্লেষণ

সৃষ্টি জগতের আদি থেকে অধ্যাবধি যুবসমাজের দ্বারাই সবধরনের অন্যায় কাজ সংঘঠিত হয়েছে। আবার সমাজের কল্যাণ ও গঠনমূলক কাজের নেতৃত্ব যুবসমাজই দিয়েছে। ভাল-মন্দ, ভাঙ্গা-গড়া ইত্যাদি ব্যাপারে বয়স্কদের তুলনায় যুবকরাই অগ্রগামী। সুতরাং তারা যদি কোন ভাল কাজের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং তা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তবে জীবন দিয়ে হলেও তা সম্পাদন করে। আবার এই যুবকরাই খারাপ পথে পা বাড়ালে জাতির ভাগ্যাকাশে অমানিশার ঘোর অন্ধকার নেমে আসে এবং ধ্বংস সুনিশ্চিত হয়। নদীতে বাঁধ দিয়ে পানির প্রবাহকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে জাতি উন্নতির শিখরে আরোহণ করছে, কিন্তু ভরা বর্ষায় আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে নদীর দু'ধারে উঁচু বাঁধ না দিলে বন্যার পানি নদীর দু'কূল প্লাবিত করে ফল-ফসল, ঘর-বাড়ি, ক্ষেত-খামার সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়। যৌবনকালকে অনুরূপভাবে সুপথে নিয়ন্ত্রণ না করলে যেকোন মুহূর্তে বিপদগামী হয়ে ধ্বংসের পথে পা বাড়াতে বাধ্য।

পৃথিবীর প্রথম হত্যাকাণ্ড যুবক কাবীলের মাধ্যমে সংঘঠিত হয়েছিল শ্রেফ হিংসাবশত ভাই হাবীলকে হত্যা করে *(মায়েদা ৫/২৭-২৮)*। ফলে অন্যায়ভাবে সকল হত্যাকাণ্ডের পাপের একটা অংশ আদম (আঃ)-এর প্রথম পুত্র কাবীলের আমলনামায় যুক্ত হয়ে থাকে *(বুখারী হা/৩০৩৫; মুসলিম, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২১১, 'ইলম' অধ্যায়; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২০১, ২/১০ পৃঃ)*।

হযরত লূত (আঃ)-এর কওমের যুবক সম্প্রদায় শিরক-বিদ'আত ও কুফরীতে লিপ্ত হওয়া ছাড়া সমকামিতার মত নোংরামিতে লিপ্ত হয়েছিল। ফলে আল্লাহ তাদের শহরকে উল্টিয়ে প্রস্তর বর্ষণে সমূলে ধ্বংস করেন *(আনকাবূত ২৯/২৮-৩০; আ'রাফ ৭/৮০; হূদ ১১/৮২-৮৩; নবীদের কাহিনী ১/১৫৮ পৃঃ)*।

সমাজ সংস্কার ও যৌবনকাল :

তাক্বওয়াবান যুবকদের দ্বারাই পৃথিবী উপকৃত হয়েছে এবং পৃথিবীতে উত্তম আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আবার পথভ্রষ্ট যুবকদের দ্বারাই পৃথিবীর বহু সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে। কেননা মহানবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) জান্নাতপিয়াসী তাক্বওয়াশীল যুবকদের নিয়েই বদর, ওহুদ, খন্দক, তাবুকসহ অন্যান্য যুদ্ধে বিজয়লাভ করেছেন। চীন বিপ্লব, ফরাসী বিপ্লব এবং বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা যুদ্ধেও লক্ষ লক্ষ যুবকদের ভূমিকা স্মরণীয়। ইরাক, ইরান, আফগানিস্তান, কাশ্মীর, চেচনিয়া, বসনিয়া, হার্জেগোভিনা, ইরিত্রিয়া, সোমালিয়া, ফিলিস্তীন প্রভৃতি দেশে এক শ্রেণির যুবকদের জানমাল, তপ্ত লহু এবং রাঙা খুনের বিনিময়ে ইসলামের পতাকা ও তাওহীদ-রিসালাতের বাণী রক্ষার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চলছে। জাহান্নামের তীব্র অনলের ভয়ে ভীত এবং জান্নাতের মোহরাঙ্কিত সুধা পানে উদগ্রীব এক শ্রেণির যুবসমাজ ক্ষণস্থায়ী পার্থিব মোহ ডাষ্টবিনে নিক্ষেপ করে অহির বিধান প্রতিষ্ঠার পথে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ বিলিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করছে না। কেননা তাদের হৃদয়ে সদা জাগ্রত আছে পরম করুণাময় আল্লাহর বাণী- إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুমিনদের জান ও মাল জান্নাতের বিনিময়ে। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহ্‌র রাস্তায়। অতঃপর তারা মরে ও মারে। উপরিউক্ত সত্য ওয়াদা মওজুদ রয়েছে তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআনে। আল্লাহ্‌র চেয়ে ওয়াদা পূর্ণকারী আর কে আছে? অতএব তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর তোমাদের ক্রয়-বিক্রয়ের উপরে, যা তোমরা সম্পাদন করেছ তাঁর সাথে। আর সেটিই হল মহান সফলতা' *(তাওবা ৯/১১১)*। অপরদিকে গোটা মুসলিম তথা ইসলামকে পৃথিবী থেকে চিরতরে মুছে দেওয়ার জন্যও এক শ্রেণির রক্তপিপাসু বেঈমান যুবক তাদের সর্বশক্তি মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে নিয়োগ করেছে। ফলে মুসলিম বিশ্বের মানচিত্র আজ রক্তে রঞ্জিত। সুশিক্ষা, নৈতিকতা ও মানবতা শূন্য অমুসলিমদের সংঘবদ্ধতার ফলেই আজ চারদিকে মানবতা কেঁদে মরছে এবং অনৈতিকতার বিজয় হচ্ছে। অশ্লীল গান, নগ্ন ছবি, মদ-জুয়া ইত্যাদি কার্যকলাপে যুবসমাজের প্রভাবই বেশি। মোটকথা, পৃথিবীর প্রতিটি বিভাগেই যুবসমাজের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। তাই আল্লাহ্‌র দেওয়া পবিত্র আমানত যৌবনের প্রতিটি ধাপ, মেধা, শ্রম ও প্রতি ফোটা রক্ত মানুষ সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করলেই পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র শান্তি ও কল্যাণে ভরে যাবে এবং পরকালের ভয়াবহ দিনে আল্লাহ্‌র আরশের ছায়াতলে আশ্রয় লাভের

সৌভাগ্য অর্জন করবে। যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না। অন্যথায় জাহান্নামের লেলিহান শিখায় অগ্নিদগ্ধ হতে হবে। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِى ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ الإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ فِى عِبَادَةِ رَبِّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِى الْمَسَاجِدِ وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِى اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّى أَخَافُ اللَّهَ. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ.

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, সাত শ্রেণির লোকদের আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাঁর আরশের ছায়ার নিচে স্থান দিবেন। সেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না। ১. ন্যায়পরায়ণ শাসক ২. ঐ যুবক যে তার প্রভুর আনুগত্যে যৌবনকে অতিবাহিত করেছে ৩. সেই ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে লটকানো থাকে ৪. সেই দুই ব্যক্তি যারা পরস্পরকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ভালবাসে এবং তারা সেকারণে পরস্পরে মিলিত হয় এবং পরস্পর পৃথকও হয় ৫. সেই ব্যক্তি যাকে কোন সম্ভ্রান্ত বংশের সুন্দরী নারী আহ্বান করে আর সে বলে আমি আল্লাহকে ভয় করি ৬. সেই ব্যক্তি যে গোপনে এমনভাবে দান করে যে, তার ডান হাত কি দান করে তা বাম হাত জানে না ৭. সেই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার দুই চক্ষু অশ্রু বিসর্জন দেয় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭০১, 'ছালাত' অধ্যায়, 'মসজিদ ও ছালাতের স্থান সমূহ' অনুচ্ছেদ-৭, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৪৯, ২/২১৬ পৃঃ)*।

যুবসংগঠন হিসাবে 'বাংলাদেশে আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর মূল্যায়ন :

হক্বের অতন্দ্র প্রহরী নির্ভেজাল তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী এ দেশের একক যুবসংঘঠন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' তার বক্তব্য, লেখনী ও সংগঠনের মাধ্যমে আল্লাহ্র সর্বশেষ অহি-র বিধান অনুযায়ী সার্বিক জীবন গড়ে তোলার আহবান জানিয়ে যুবকদের মাঝে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আক্বীদা ও আমল সংশোধনের মাধ্যমে সমাজের সার্বিক সংস্কার সাধনে ব্রতী এই সংগঠনের দাওয়াতে অসংখ্য যুবক শিরক, বিদ'আত ও তাক্বলীদ মুক্ত হয়ে অহি-র বিধান অনুযায়ী সার্বিক জীবন গড়ে তোলার পথে এগিয়ে আসছে। ইনশাআল্লাহ তাদের এই অগ্রযাত্রা শিরক-বিদ'আতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত এবং দুনিয়াদার পাশ্চাত্যের পদলেহীদের রক্ত চক্ষুকে তোয়াক্কা না করে কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। ঐ যে শুনুন বিশ্বনেতা মহানবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ভবিষদ্বাণী,

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِىَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ.

ছাওবান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'চিরদিন আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল হক্বের উপর বিজয়ী থাকবে। পরিত্যাগকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, এমতাবস্থায় কিয়ামত এসে যাবে। অথচ তারা ঐভাবেই থাকবে' *(মুসলিম, হা/১৯২০, 'ইমারত' অধ্যায়-৩৪, অনুচ্ছেদ-৫৩)*।

উপসংহার :

পরিশেষে বলা যায়, আসুন আমরা আমাদের এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে আল্লাহ প্রদত্ত অমূল্য সম্পদ যৌবনকালের গুরুত্ব উপলব্ধি করে তার যথাযথ সদ্ব্যবহার করে জান্নাতী যুবকদের কাতারে শামিল হতে সর্বাত্মক চেষ্টা করি। আল্লাহ আমাদেরকে সেই তাওফীক দান করুন-আমীন!

[লেখক : কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ ও শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।]

ইসলামের দৃষ্টিতে শিশু অধিকার

-মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান

মুখবন্ধ :

মানব জীবনের সূচনালগ্নে একজন মানুষকে শিশু বলা হয়। আমরা প্রত্যেকে এক সময় শিশু ছিলাম। শিশু-কিশোর বলতে আমরা বুঝি বয়সের স্বল্পতার কারণে যাদের দেহ, মন ও মগজ পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়নি। আজকের শিশু আগামী প্রজন্মের নাগরিক। আজ যারা ছোট, কাল তারা হবে বড়। ভবিষ্যতে তারাই হবে সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্ণধার। একজন মানব শিশু যখন কথা বলতে পারে না, নিজে খেতে পারে না, নিজের পায়ে চলতে পারে না, নিজের ভাল-মন্দ বুঝে না সে সময় থেকে শুরু করে কিশোর বয়স পর্যন্ত তাদের প্রতি ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, সাংগঠনিক এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে কিছু হক্ব বা অধিকার রয়েছে, এটাই শিশু-কিশোরদের অধিকার। অন্যদিকে সোনামণিরা যাতে মনে-প্রাণে কষ্ট না পায়, বুদ্ধিতে বাঁধাপ্রাপ্ত না হয়, দেহের বৃদ্ধি ও মেধা বিকাশে বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়-এরূপ আচরণ করার নামই 'সোনামণি অধিকার'। তাই আজকের শিশু-কিশোরেরা অনাদর ও অবহেলায় অধিকার বঞ্চিত হয়ে বড় হলে ভবিষ্যতে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নেমে আসবে চরম অশান্তি ও বিশৃংখলা। অথচ সোনামণিদের অধিকার রক্ষায় প্রায় দেড় হাযার বছর আগে মহানবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ইসলামের সুমহান জীবনাদর্শের মধ্যে শিশু-কিশোরদের জন্য রেখে গেছেন অধিকার সম্বলিত একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা। ইসলামে শিশু-কিশোরদের উপর সব ধরনের শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার এবং নির্যাতন সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। উৎসাহ দিয়েছে নিরাপদ পরিবেশে জীবন-যাপন করার। নিম্নে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ এবং আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে 'সোনামণি বা শিশুদের অধিকার' বিষয়ে আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

● শিশু-কিশোরদের অধিকার রক্ষায় গৃহীত নীতিমালা :

সোনামণিদের অধিকার রক্ষায় ইসলামের আলোকে পরিচালিত 'সোনামণি' সংগঠন, 'রাষ্ট্রীয় শিশুনীতি' এবং 'জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ' স্বাধীন এই বাংলাদেশের ৫৬,০০০ বর্গমাইলের অভ্যন্তরে কাজ করে যাচ্ছে। ১৯৯০ সালের ২ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদটি আন্তর্জাতিক আইনের একটি অংশে পরিণত হয়। তৎকালীন জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র ১৯২টি রাষ্ট্রের মধ্যে ১৮৯টি রাষ্ট্র এ সনদটি অনুমোদন করে। এর মধ্যে প্রথম যে ২২টি রাষ্ট্র সনদটি অনুমোদন করে বাংলাদেশ তার অন্যতম। জাতিসংঘ এবং এর অঙ্গ সংগঠন 'ইউনিসেফ' (UNICEF) `United Nation Intergrated Children Emergency Fund' শিশু অধিকার ও তাদের স্বাস্থ্য রক্ষায় বর্তমানে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। যদিও তাদের গৃহীত নীতিমালা ইসলামের দৃষ্টিতে পূর্ণমাত্রায় উপযোগী নয়।

● মমতাপূর্ণ আচরণ : প্রেক্ষিত ইসলাম

ইসলামের দৃষ্টিতে সন্তান আল্লাহ্র দেওয়া বিশেষ নে'মত ও অনুগ্রহ। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ 'আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তোমাদের থেকে তোমাদের জোড়া এবং সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জোড়া থেকে তোমাদের পুত্র ও পৌত্রদের আর রিযিক দিয়েছেন তোমাদের উত্তম বস্তু থেকে। তবুও কি তারা বাতিলকে বিশ্বাস করবে এবং আল্লাহ্র নে'মত অস্বীকার করবে'? *(নাহল ১৬/৭২)*। সুতরাং সন্তান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বিশ্ব মানবতার জন্য এক বিশেষ দান ও পৃথিবীর সৌন্দর্যের প্রতীক।

ইসলাম শিশু-কিশোরদের অনেক অধিকার দিয়েছে। তাদের জন্ম থেকে শুরু করে জীবন চলার পথে আরো অনেক অধিকার সেখানে স্বীকৃত। শিশু কিশোরদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আচরণ ছিল অধিক মমতাপূর্ণ। তিনি স্বস্নেহে ও সোহাগভরে ইসলামী সকল প্রকার আদব-কায়েদা তাদের শিক্ষা দিতেন। তিনি তাদের দেখলে খুব খুশী হতেন। তাদের নিকটে যেতেন, সালাম দিয়ে কুশল বিনিময় করতেন, খোঁজ-খবর নিতেন, মাথায় হাত বুলাতেন, কোলে নিতেন, কাঁধে উঠাতেন, আদর-স্নেহ করতেন, খুব ভালবাসতেন। এমনকি চুমু খেতেন এবং দো'আ করতেন। তাদের সাথে তিনি আকর্ষণীয়, রসাত্মক ও উপদেশমূলক কথা বলতেন। আবার কিছুটা হাসি-কৌতুকও করতেন। তিনি খাবারে তাদের অংশীদার করতেন, দৌড় প্রতিযোগিতা করাতেন। পথে দেখা হলে নিজের বাহনে চড়াতেন। ভুল করলে ক্ষমা করে সঠিক জিনিসটা বুঝিয়ে দিতেন। তিনি তাদের বকাবকি, মারপিট ও মুখে আঘাত করতে নিষেধ করেন।

ক. সোনামণিদের জন্মোত্তর অধিকার সমূহ :

ইসলাম শিশু-কিশোরদের জন্ম থেকে তাদের অধিকার রক্ষায় সোচ্চার। সোনামণিদের জন্মোত্তর অধিকার সমূহের মধ্যে নিম্নোক্ত অধিকারগুলো প্রণিধানযোগ্য :

১. কানে আযান শুনার অধিকার : সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথেই তাদের পিতামাতা ও অভিভাবকদের প্রতি কতগুলি কর্তব্য রয়েছে। আবু রাফে' (রাঃ) বলেন,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَذَّنَ فِى أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلاَةِ.

'ফাতিমা (রাঃ) যখন হাসান ইবনে আলী (রাঃ)-কে প্রসব করলেন তখন আমি রাসূল (ছাঃ)-কে ছালাতের আযানের ন্যায় তার কানে আযান দিতে দেখলাম'।[৩২] তাছাড়া বাচ্চার কানের কাছে ধীরে ধীরে নিম্নস্বরে যে কেউ এ আযান দিতে পারে। তবে ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইক্বামত দেওয়ার প্রচলিত রেওয়াজ ঠিক নয়। বরং এ সম্পর্কিত হাদীছটি জাল ও বনোয়াট।[৩৩]

(২) নবজাতকের জন্য তাহনীক করার অধিকার : তাহনীক হচ্ছে কোন আলিম বা তাক্বওয়াশীল ব্যক্তি কর্তৃক খেজুর কিংবা মধু বা মিষ্টি জাতীয় কোন বস্তু চিবিয়ে স্বীয় লালা মিশ্রিত করে নবজাতক শিশুর মুখে দেওয়া। আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ. 'রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে নবজাতক শিশুকে নিয়ে আসা হত। তিনি তাদের জন্য কল্যাণ ও বরকতের দো'আ করতেন এবং তাদেরকে তাহনীক করতেন'।[৩৪]

(৩) 'বিসমিল্লাহ' বলে শিশুকে দুধ পান করানো : শিশুর আদর্শ খাবারের মধ্যে মায়ের দুধ অন্যতম। মায়ের দুধের বিকল্প ও সমকক্ষ আর কিছু নেই। তাই শিশুর শারীরিক ও মানসিক যথাযথ বিকাশের জন্য মায়ের দুধের শক্তি অন্যতম উপাদান। এক্ষেত্রে অলসতা ও অবহেলা করা কোন ক্রমেই উচিৎ নয়। মহান আল্লাহ শিশুর জন্য মায়ের দুধ পান করানোর নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ 'মাতাগণ

---

৩২. আবুদাঊদ হা/৫১০৫; তিরমিযী হা/১৫১৪, মিশকাত হা/৪১৫৭। হাদীছ হাসান।
৩৩. সিলসিলা যঈফাহ হা/৬১২১।
৩৪. মুসলিম হা/৫৭৪৩; মিশকাত হা/৪১৫০।

তাদের সন্তানদের পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাবে, যারা দুধ পানের মেয়াদ পূর্ণ করতে চায়' *(বাক্বারাহ ২/২৩৩)*।

শিশুকে দুধ পান করানোর সর্বোচ্চ সময়সীমা আড়াই বছর। এরপর তাকে স্বাভাবিক খাদ্য খেতে দিবে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে, মায়ের দুধ শিশুদের মেধা বিকাশে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। একজন শিশুর দুই-আড়াই বছরের জন্য অন্যতম নে'মত হচ্ছে তার মায়ের বুকের দুধ। শিশুকে দুধ পান করানোর সময় এবং খাদ্য প্রদানের সময় বিসমিল্লাহ বলে দেয়া পিতা-মাতার কর্তব্য। হুযায়ফাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'শয়তান সেই খাদ্যকে নিজের জন্য হালাল করে নেয় যে খাদ্যে বিসমিল্লাহ বলা হয় না'।[৩৫] আসুন, আমরা দুধ পান করানোর দায়িত্ব পালনে মায়েদেরকে সার্বিক সহযোগিতা করি।

(৪) সন্ধ্যার সময় শিশুকে বাড়ীর বাইরে নিয়ে যাওয়া যাবে না : সন্ধ্যার পর শিশুকে বাড়ীর বাইরে বা ছাদের উপরে নিয়ে না যাওয়া বা যেতে না দেওয়া উচিত। কারণ এ সময় শয়তান বিষাক্ত পোকা-মাকড় আহার করার জন্য বের হয় এবং শিশুদের ক্ষতি করে। জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন সন্ধ্যা হয়, তখন তোমরা তোমাদের শিশুদেরকে বাড়ির বাইরে যেতে দিও না। কারণ সেই সময় শয়তান ছড়িয়ে পড়ে...'।[৩৬] অন্য বর্ণনায় আছে, وَاكْفِتُوا صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ الْعِشَاءِ فَإِنَّ لِلْجِنِّ انْتِشَارًا وَخَطْفَةً 'আর সন্ধ্যার সময় তোমাদের শিশুদেরকে ঘরের ভিতরে আবদ্ধ রাখ। কেননা এ সময় জিনেরা ছড়িয়ে পড়ে এবং (শিশুদের) ছিনিয়ে নেয়'।[৩৭]

(৫) শিশুর ভাল বা উত্তম নাম রাখার অধিকার : আদম (আঃ) থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক মানুষের একটি সুনির্দিষ্ট নাম আছে। সুন্দর ও মাধুর্যপূর্ণ একটি নাম পিতা-মাতার নিকট সন্তানের একটি অধিকার। ইসলাম এ অধিকার সন্তানকে দিয়েছে। তাই রাসূল (ছাঃ) পিতা-মাতাকে সন্তানদের সুন্দর ও ভাল নাম রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। আর কেউ অপছন্দনীয় বা খারাপ নাম রাখলে রাসূল (ছাঃ) তা পরিবর্তন করে দিতেন। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরের দিন অথবা সপ্তম দিনে নাম রাখা সুন্নাত। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ 'তোমাদের নাম সমূহের মধ্যে আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে প্রিয় নাম হচ্ছে আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান'।[৩৮] আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ওমর (রাঃ)-এর কন্যা আছিয়ার নাম পরিবর্তন করে জামীলা রেখেছিলেন'।[৩৯]

(৬) সপ্তম দিনে নবজাতকের আক্বীকা করার অধিকার : সন্তান জন্মের ৭ম দিনে শিশুর অন্যতম অধিকার হল আক্বীকা করা। এটা রাসূল (ছাঃ)-এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আদর্শ। সপ্তম দিনে ছাড়া অন্যদিনে আক্বীকা করার ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায় না। ভেড়া, ছাগল, দুম্বা দ্বারা আক্বীকা করতে হয়। গরু বা উট দ্বারা ভাগে অথবা একটা করে আক্বীকা করার হাদীছটি যঈফ।[৪০] ছেলের জন্য দুটি আর মেয়ের জন্য একটি পশু যবেহ করতে হবে।[৪১] অবশ্য ছেলের জন্য একটি করার হাদীছও আছে।[৪২] আক্বীকার গোশত কুরবানীর গোশতের মত একই ভাবে বণ্টন করতে হয়।

(৭) চুলের ওযন পরিমাণ রূপা ছাদাক্বা করার অধিকার : সপ্তম দিনে আক্বীক্বা করার সময় তার মাথার চুল ফেলে দিতে হবে এবং তার সমপরিমাণ রূপা ছাদাক্বা করতে হবে। এটা তার একটা অধিকার। নবী করীম (ছাঃ) হাসানের পক্ষ থেকে একটি ছাগল আক্বীক্বা করলেন এবং বললেন, হে ফাতিমা! তার মাথাটি কামিয়ে দাও এবং চুলের ওযন পরিমাণ রূপা ছাদাক্বা করো। আলী (রাঃ) বলেন, আমরা তার চুলগুলি ওজন করলাম। তার ওজন এক দিরহাম বা তার চাইতে কিছু কম হল।[৪৩]

(৮) খাৎনা করার অধিকার : খাৎনা করা নবীদের সুন্নাত। ইসলামে অবশ্য পালনীয় একটি যরূরী আদর্শ হচ্ছে খাৎনা করা। অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করলে তার জন্য খাৎনা করা এবং নাভীর নিচের লোম কামিয়ে ফেলা উচিৎ।[৪৪] খাৎনার কোন নির্ধারিত সময় নেই। পুরুষাঙ্গের বর্ধিত চর্মের ভিতরে ময়লা জমে ব্যাকটেরিয়ার সৃষ্টি হতে পারে। এজন্য বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যসম্মত এবং উপকারী বলে খাৎনাকে ইসলাম আবশ্যকীয় করেছে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, অবশ্য পালনীয় পাঁচটি বৈশিষ্ট্য বা স্বভাব রয়েছে। (১) খাৎনা করা (২) নাভীর নিচের লোম পরিষ্কার করা (৩) গোঁফ ছোট করা (৪) নখ কাটা ও (৫) বগলের লোম উপড়িয়ে খেলা।[৪৫] ইবরাহীম (আঃ) আশি বছর বয়সে কুঠার দ্বারা খাৎনা করেছিলেন।[৪৬] সুতরাং আমাদের সোনামণি বালকদের যথাসময়ে খাৎনার ব্যবস্থা করা পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

(৯) উত্তম পোশাকের অধিকার : ঈমান আনার পর মানুষের জন্য সর্বপ্রথম ফরয হল লজ্জাস্থান আবৃত করা বা পোশাক পরিধান করা। মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে পার্থক্য হল পোশাক। ইসলামে পুরুষ ও মহিলাদের পোশাকের ব্যাপারে পৃথক পৃথক নীতিমালা বর্ণিত হয়েছে। তাই আমাদের সোনামণিদেরকে শালীনতা যেন বজায় থাকে এমন ধরনের উত্তম পোশাক পরিধান করাতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ 'হে আদম সন্তান! আমি তোমাদের জন্য অবতীর্ণ করেছি এমন পোশাক যা তোমাদের লজ্জাস্থানকে আবৃত করে ও অবতীর্ণ করেছি সাজ-সজ্জার পোশাক এবং পরহেযগারীর পোশাক (তাক্বওয়ার পোশাক)। এটা সর্বোত্তম (পোশাক)। আর এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ নির্দেশনা, যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা কর' *(আ'রাফ ৭/২৬)*। এ আয়াতে পোশাকের ৩টি গুণের কথা বলা হয়েছে। যথা : (১) তাক্বওয়া বা পরহেযগারিতার পোশাক (২) যা লজ্জাস্থানকে আবৃত করে (৩) সাজ-সজ্জার পোশাক। এ আয়াতটি বিশ্ব মানবতার জন্য, শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য নয়। পোশাক আঁটসাট, ছোটখাটো ও ফিটফাট হবে না। পোশাক তুলনামূলক ঢিলেঢালা ও লম্বা হবে; যা শরীর ঢেকে রাখে ও ভদ্রতার পরিচয় দেয়। আর এ বিষয়ে পিতা-মাতাসহ অভিভাবকদের খেয়াল রাখতে হবে। অন্যদিকে মহান আল্লাহ বলেন, يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ 'হে আদম সন্তান! তোমরা প্রত্যেকটি ইবাদতের স্থানে (ছালাতের সময়) সুন্দর পোশাক পরিধান কর। আর খাও ও পান কর কিন্তু অপচয় করনা। কেননা আল্লাহ অপচয়কারীকে ভালবাসেন না' *(আ'রাফ ৭/৩১)*। সুতরাং পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের দায়িত্ব ও

৩৫. মুসলিম হা/৫৩৭৮; মিশকাত হা/৪১৬০ ও ৪২৩৭।

৩৬. বুখারী হা/৫৬২৩ 'বাসন ঢেকে রাখা' অনুচ্ছেদ; মুসলিম হা/৫৩৬৮; মিশকাত হা/৪২৯৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪১০৯ 'বাসন ঢেকে রাখা' অনুচ্ছেদ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪০।

৩৭. বুখারী হা/৩৩১৬; মুসনাদে আহমাদ হা/১৫২০৬; মুসনাদু আবী ই'য়ালা হা/২১৩০; জামেউছ ছগীর হা/৫৫৬৭; মিশকাত হা/৪২৯৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪১০৯।

৩৮. মুসলিম হা/৫৭০৯; মিশকাত হা/৪৭৫২।

৩৯. মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৫৮।

৪০. মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/১১৬৮।

৪১. নাসাঈ, মিশকাত হা/৪১৫২।

৪২. আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪১৫৫।

৪৩. তিরমিযী হা/১৫১৯, মিশকাত হা/৪১৫৪।

৪৪. আবুদাঊদ, ইরওয়া হা/৭৯।

৪৫. বুখারী হা/৫৮৯১; মুসলিম হা/৬২০; মিশকাত হা/৩৭৯।

৪৬. বুখারী হা/৩৩৫৬; মুসলিম হা/৬২৯০; মিশকাত হা/৫৭০৩।

কর্তব্য হচ্ছে রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশিত পোশাক পরিধানে সোনামণিদেরকে অভ্যস্থ করে গড়ে তোলা।

● **উত্তম পোশাকের কতিপয় গুণাবলী নিম্নরূপ :**

(১) পোশাক পরিধানের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা। ডান দিক থেকে শুরু করা।[৪৭] (২) ঢিলা-ঢালা, সাদা, মার্জিত ও পরিস্কার পোশাক পরিধান করা।[৪৮] (৩) ছেলেদের জন্য রেশমী পোশাক ও স্বর্ণালংকার নিষেধ আর মেয়েদের জন্য হালাল।[৪৯] (৪) ছেলেরা মেয়েদের পোশাক আর মেয়েরা ছেলেদের পোশাক পরিধান করবে না।[৫০] (৫) কাপড়ে কোন প্রাণীর ছবি থাকবে না। (৬) পোশাক টাইট ফিট ও পাতলা হবে না। (৭) পুরুষদের পোশাক গিটের উপরে থাকবে আর মেয়েদের পোশাক গিটের নীচে নামবে।[৫১] (৮) পোশাক খোলার সময় বিসমিল্লাহ বলবে। (৯) নতুন পোশাক পরলে দো'আ পড়বে।

(১০) সুষম খাদ্যের অধিকার : সুস্বাস্থ্য ও রোগমুক্ত সোনামণি পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক সম্পদ। আমরা যদি সুস্থ নাগরিক, সন্তান ও কর্মী পেতে চাই তবে প্রথম থেকে সুষম ও পরিমিত খাদ্যের মাধ্যমে সোনামণিদের গড়ে তুলতে হবে। শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ এবং সুপ্ত প্রতিভা জাগ্রত করতে শুধুমাত্র দামী খাদ্য নয়, অপেক্ষাকৃত কম মূল্যের পুষ্টিকর ও সমৃদ্ধ খাদ্যেরও প্রয়োজন। পড়াশুনা ও কাজ করতে সুস্বাস্থ্য অবশ্যই প্রয়োজন। খাদ্য হলেই যে খেতে হবে তা নয়। বরং হালাল-হারাম বিবেচনা পূর্বক খেতে হবে। শৈশব বয়স থেকেই ভাল ও সুষম খাদ্যের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। নেশা জাতীয় খাদ্য ও হারাম পানীয় এবং অতিভোজন শরীরের পক্ষে যে ক্ষতিকর সে সম্পর্কে শিশুদের সর্তক করতে হবে। সঙ্গ দোষে শিশু-কিশোর, যুবক-যুবতী এমনকি বৃদ্ধরা পর্যন্ত মাদকদ্রব্য সেবন, কোল্ড ড্রিংকিস সহ যাবতীয় নেশা জাতীয় জিনিস গ্রহণ করে থাকে। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 'হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণয়ক তীর সবই ঘৃণ্য বস্তু ও শয়তানী কাজ। অতএব তোমরা তা পরিহার করো। যাতে করে তোমরা সফলকাম হতে পার' *(মায়িদা ৫/৯০)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, তিনি (আল্লাহ) তোমাদের জন্য মৃত প্রাণী, রক্ত, শূকরের মাংস এবং যে সকল প্রাণী আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে যবেহ করা হয়, সে সকল প্রাণীর গোশত হারাম করেছেন' *(বাক্বারাহ ২/১৭৩)*। ১টি আপেলের চেয়ে ১টি পিয়ারা ও টমেটোর মধ্যে ভিটামিন অনেক বেশী। ১০০ গ্রাম চিপসের টাকা দিয়ে ১ কেজি শাক বা সবজি পাওয়া যায়। সুতরাং আমরা আমাদের সন্তানের জন্য প্রাণ খুলে ব্যয় করব, কিন্তু অপব্যয় করব না। অথচ আবার ভাল ও সুষম খাদ্য খাওয়াব।

খ. সোনাণিদের বিকাশের অধিকার :

মহান আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন। যার ধারাবাহিকতা হল মানবাত্মা। অতঃপর মায়ের উদরে শিশু, নবজাতক হিসাবে দুনিয়াতে আগমন। তারপর শৈশব, কৈশর, যুব, পৌঢ়, বৃদ্ধ এবং অবশেষে মৃত্যু। সোনামণিদের সুস্থ বিকাশের জন্য অভিভাবক, পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রের অনেক দায়-দায়িত্ব ও করণীয় রয়েছে। বিকাশ অর্থ বর্ধন, বৃদ্ধি পাওয়া বা পরিবর্তন। অর্থাৎ ছোট থেকে আস্তে আস্তে বড় হওয়াকে বিকাশ বলে। ধাপে ধাপে বড় হওয়ার পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশই বিকাশ। সুস্থ, সুষ্ঠু ও মর্যাদাপূর্ণ নাগরিক পেতে হলে সোনামণিদের সুন্দর সুষ্ঠু বিকাশের প্রয়োজন। এক্ষেত্রে যে উপাদানগুলো প্রয়োজন তা হ'ল- খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান, সুশিক্ষা ও চিকিৎসা, খেলাধূলা, বিশুদ্ধ পানি, তাজা ফলমূল ইত্যাদি যথাযথভাবে প্রদান নিশ্চিত করা। তবেই একজন সুস্থ, বুদ্ধিসম্পন্ন ও ধার্মিক মানুষ হিসাবে সোনামণিদের গড়ে তোলা সম্ভব হবে। সোনামণিদের বিকাশের অধিকারের ক্ষেত্রে ৬টি বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া যরূরী। যথা : (১) শারীরিক বিকাশ : বৃদ্ধি, ওজন ও শক্তি ইত্যাদির বিকাশ। (২) মানসিক বিকাশ : মনোযোগ, চিন্তাশক্তি, সহনশীলতা, সুষ্ঠু আচরণ, একাগ্রতা, সমস্যা সমাধানের শক্তি এবং আল্লাহভীতি ইত্যাদির বিকাশ। (৩) ভাষাগত বিকাশ : কথা বলার ক্ষমতা, কাজ করার ক্ষমতা, প্রশ্ন করার ক্ষমতা ইত্যাদির বিকাশ। (৪) সামাজিক বিকাশ : অন্যের সাথে মিশতে পারা, সামাজিক রীতিনীতি জানা, মানা ও শেখা, কুশল বিনিময়, দলীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, আবেগের নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক ও নাগরিক কর্তব্য পালন, খেলাধূলায় অংশগ্রহণ ও জামা'আতে ছালাত আদায় প্রভৃতি সামাজিক বিকাশের অন্তর্ভুক্ত। (৫) অনুভূতির বিকাশ : সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্না, আনন্দ-বেদনা, উচ্ছাস, আগ্রহ ইত্যাদির বিকাশ। (৬) নৈতিক বিকাশ : ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ, নৈতিক-অনৈতিক, অন্যের জন্য ভাল কিছু করা, অন্যের ক্ষতি হবে এমন কাজ না করা প্রভৃতি নৈতিক বিকাশের অন্তর্ভুক্ত। অতএব সোনামণিদের সুস্থ বিকাশের জন্য, তাদের বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় উপকরণের জন্য এবং অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্বের জন্য পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার স্বার্থে তাদের সুষ্ঠু ও নিরাপদ বিকাশে আমাদের সকলের যথাযথ দায়িত্ব পালন করা একান্ত কর্তব্য।

গ. সোনামণিদের শিক্ষার অধিকার :

ইসলাম শিক্ষার ব্যাপারে অত্যধিক গুরুত্বারোপ করে। মহান আল্লাহ আমাদের শিক্ষার আলো স্বরূপ মহাগ্রন্থ আল-কুরআন নাযিল করেছেন। কুরআন নাযিলের প্রথম শব্দই ছিল 'ইক্বরা' অর্থ পড়। শিক্ষা ব্যতীত কোন জাতির উন্নতি কল্পনা করা যায় না। জাগতিক ও পারলৌকিক উভয় জগতের উন্নতি, অগ্রগতি ও সফলতার জন্য শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন। তবে অবশ্যই ইসলামী নৈতিকতা ও আদর্শভিত্তিক শিক্ষা হতে হবে। শিক্ষা এমন এক আলো যা অজ্ঞতা ও অন্ধকারকে দূরীভূত করে, মানুষকে কল্যাণ ও সমৃদ্ধির পথ দেখায়। শৈশবকাল থেকেই পিতা-মাতা ও অভিভাবককে সোনামণিদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে সচেতন ও যত্নবান হতে হবে। মুসলিম মনীষী ও পণ্ডিতগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় সফলভাবে বিচরণ করেছেন। শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ- بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ 'যদি তোমরা কোন বিষয়ে না জানো, তবে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা কর স্পষ্ট দলীল সহকারে' *(নাহল ১৬/৪৩)*। রাসূল (ছাঃ) আরও বলেন, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ 'বিদ্যার্জন করা সকল মুসলিমের জন্য ফরয'।[৫২]

বর্ণমালা দিয়ে শিক্ষা শুরু হয়না। বরং মায়ের উৎসাহপূর্ণ দৃষ্টি, পিতার প্রশংসনীয় শব্দ ও অনুমোদন, বোনের সহানুভূতি, ভাইয়ের সদয় সহযোগিতা; ময়দান, মাঠ কিংবা কুঞ্জবন থেকে আহরিত পাখির সাথে সোনামণির শিক্ষা হয়। শিশু-কিশোরেরা অবশ্যই অনুভব করতে, পর্যবেক্ষণ করতে কিংবা প্রভাবিত হতে শিখবে। আর এভাবে লুকিয়ে থাকা মন বিকশিত হবে এবং গ্রহণ, মগ্ন ও স্মরণ করতে প্রজ্ঞাত হবে। কেননা যে মন যতবেশী সর্তক ও সচেতন, সে মন তত সহজে ও দ্রুত অজ্ঞাত বিষয়সমূহকে শিখে নিবে। এটাই শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার হাতে খড়ি। শিশু-কিশোরদেরকে শিক্ষা অর্জনে বিভিন্নভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করতে হবে।

অন্যদিকে শিশুদেরকে শুধু কর কর এবং পড় পড় বললেই শিশু করবেনা বা পড়বেনা। এ ক্ষেত্রে পারিবারিক ও সামাজিক পরিকল্পনা ও পরিবেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য ছালাতের গুরুত্ব অপরিসীম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে ৭ বছর বয়সে

---

৪৭. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৫৯।
৪৮. আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৬৩৮।
৪৯. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩২১ ও ১৪২৯।
৫০. বুখারী, মিশকাত হা/৪৪২৯।
৫১. বুখারী ও মুসলিম মিশকাত হা/৪৩১১-১৪।
৫২. ইবনু মাজাহ হা/২২৪; মিশকাত হা/২১৮।

ছালাতের শিক্ষা দাও এবং ১০ বছর বয়সে ছালাত না পড়লে (হালকা) প্রহার কর এবং তাদের বিছানা আলাদা করে দাও'।[৫৩] ছালাত সময়ানুবর্তিতা, পরিচ্ছন্নতা ও শৃংখলা শিক্ষা দেয়। আর এর কার্যকারিতা দীর্ঘমেয়াদী ও চিরকল্যাণকর। এ মর্মে আল্লাহ বলেন, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ 'যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি কখনও সমান হতে পারে'? *(যুমার ৩৯/৯)*। তিনি আরও বলেন, 'আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী, তারাই কেবলমাত্র তাকে ভয় করে' *(ফাতির ৩৫/২৮)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ 'আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকেই কেবল দ্বীনের জ্ঞান দান করেন'।[৫৪] আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইসলামের আলোকে ঢেলে সাজাতে হবে। প্রয়োজনীয় কারিকুলাম ও সিলেবাস অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিতে হবে। অভিভাবকগণ শিশুদের পোশাক-পরিচ্ছদ, শিষ্টাচার, খেলাধূলা, স্কুল, মাদরাসা ও মসজিদে যাওয়াকে নিশ্চিত করবে। শিক্ষকগণ ছাত্রদেরকে আমানত মনে করবেন এবং ভারসাম্য বিধান করবেন। এক্ষেত্রে 'সোনামণি' সংগঠন অতিসহজে আপনার সোনামণিকে আদর-স্নেহের মাধ্যমে সঠিক ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলবে ইনশাআল্লাহ।

ঘ. পরিচর্চা, সুরক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার : আমরা যখন বুঝতে শিখি, পড়াশুনা করি এবং নিজেদের ভাল-মন্দ নিজেরা বুঝি তখন নিজেদের নিরাপত্তা নিজেরাই গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু একজন বৃদ্ধ ও শিশু যারা নিজেদের নিরাপত্তা নিজেরা করতে অক্ষম, তাদের ক্ষেত্রে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের ভূমিকা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো তাদের নিরাপত্তা বিধানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। যথা : (১) গর্ভকালীন নিরাপত্তা (২) শৈশবকালীন শিশুদের পারিবারিক নিরাপত্তা (৩) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত ও অবস্থানকালীন নিরাপত্তা (৪) বয়ঃসন্ধিকালীন নিরাপত্তা (৫) পরিবেশ দূষণ থেকে নিরাপত্তা (৬) দুর্যোগকালীন নিরাপত্তা (৭) গোলমাল, মারামারি ও যুদ্ধকালীন নিরাপত্তা।

(১) গর্ভকালীন নিরাপত্তা : গর্ভকালীন নিরাপত্তা বলতে গর্ভকালীন মায়ের স্বাস্থ্যগত, খাদ্যগত এবং দাম্পত্য ও পারিবারিক নিরাপত্তাকে বুঝায়। সংক্ষেপে গর্ভবতী মায়ের পুষ্টিকর খাদ্য, সঠিক সময়ে চিকিৎসা, টিকা গ্রহণ, সঠিক সময়ে চেকআপ ইত্যাদি প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, শিশু জন্মের পরবর্তী অবস্থায় আতুর ঘর নামে ৬/৭ দিন নানারকম কুসংস্কার পরিলক্ষিত হয়। তাই এগুলি থেকে বিরত থাকতে হবে। বরং সর্বক্ষেত্রে ইসলামী সঠিক আদর্শ অনুসরণ করতে হবে।

(২) শৈশবকালীন শিশুদের পারিবারিক নিরাপত্তা : শিশু যখন আধো আধো কথা বলে তখন থেকে তার সাথে ভাল আচরণ করা ও শুদ্ধ কথা বলা শেখাতে হবে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার ইত্যাদি বলা শিখাতে হবে। তাদের সামনে মিথ্যা বলা, প্রতারণা করা, গালি দেওয়া, রাগ করা বা ঝগড়া বাঁধানো উচিৎ নয়। কারণ শিশু দেখে ও শুনে শেখে। হাঁটা ও চলার সময় তার সঙ্গে থাকতে হবে। ময়লা-আবর্জনা মুখে দেওয়া থেকে, নদী, পুকুর-ডোবার পানি থেকে ও আগুন থেকে সাবধান রাখতে হবে। কারণ সামান্য অসচেতনতাই শিশুর সাময়িক ও দীর্ঘমেয়াদী সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে।

(৩) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতকালীন নিরাপত্তা : অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের দেশে বিদ্যালয়ে শিশুদের যাতায়াতকালীন নিরাপত্তা একেবারে অপ্রতুল। তাই পিতা-মাতাসহ অভিভাবকগণ সর্বদা দুশ্চিন্তাগ্রস্থ থাকেন। শিশু-পাচার, দৈহিক নির্যাতন, যৌন নির্যাতন প্রতিনিয়ত ঘটছেই। সুতরাং অসৎ চরিত্রের এমন ব্যক্তিদের শাস্তি অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। যা সরকার সহ প্রত্যেক সচেতন ব্যক্তির দায়িত্ব। আর এভাবেই তাদের নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব হবে।

(৪) বয়ঃসন্ধিকালীন নিরাপত্তা : একজন শিশুর শৈশব পেরিয়ে কৈশরে পদার্পণ করাকে বয়ঃসন্ধিক্ষণ বলা হয়। এটা মানব জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর সময়। এ সময় সামগ্রিক ও শারীরিক পরিবর্তন ঘটে। জীবনে এক নতুনত্বের আনন্দ ও অনুভূতির জন্ম দেয়। এ সময়ে আবার পদে পদে বিপদ-আপদও আছে। তখন পরিপূর্ণ বুঝ ও বিবেচনা শক্তি থাকে না। এ সময় পিতা-মাতা সহ অভিভাবকদের তাদের প্রতি সর্বদা সর্তক দৃষ্টি রাখতে হবে। এক্ষেত্রে ইসলামী মূল্যবোধ ও সামাজিক সচেতনতাই নিরাপত্তা দিতে পারে।

(৫) পরিবেশগত নিরাপত্তা : একজন শিশুর সার্বিক বিকাশের ক্ষেত্রে তার অবস্থান ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মায়ের কোল, বাড়ীর উঠান, খেলার মাঠ, পুকুরপাড় এমনকি বিছানাপত্র পর্যন্ত নিরাপত্তাহীনতার কারণ হতে পারে। তাদেরকে আবর্জনামুক্ত ও দুর্গন্ধমুক্ত এবং স্বাস্থ্যসম্মত সুন্দর একটি পরিবেশের ব্যবস্থা করা ইসলামী নির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত।

(৬) দুর্যোগকালীন নিরাপত্ত : বন্যা, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্বিপাকে শিশুরা বেশী সমস্যায় পড়ে ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুতরাং বিভিন্ন দুর্যোগের সময় তাদের ব্যাপারে অভিভাবকদের বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন।

(৭) গোলমাল, মারামারি ও যুদ্ধকালীন নিরাপত্তা : গোলমাল, মারামারি বা যুদ্ধ হিংসা, পরশ্রীকাতরতা ও মানবিক দুর্বলতার কারণে ঘটনা ঘটে থাকে। এক্ষেত্রে নারী, শিশু ও বৃদ্ধ মানুষেরা বেশী দুর্ভোগের শিকার হয়। শিশু-কিশোরদের নিরাপত্তা বিধান সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আসুন আমরা সামর্থ্যানুযায়ী শিশুর আহার, তাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি সকল বিষয়ে নিরাপত্তা বিধানে বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়।

ঙ. উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী অর্জনের অধিকার :

ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে, Charactor is crown of life. 'চরিত্র হ'ল জীবনের রাজমুকুট স্বরূপ'। মহান আল্লাহ আমাদেরকে উত্তম স্বভাব-চরিত্র ও আচার ব্যবহারের জ্ঞান দ্বারা সৃজন করেছেন। জীবন গড়ার প্রথম স্তরেই শিশু-কিশোরদেরকে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষা, শিষ্টাচার ও চরিত্র গঠন করাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। কেননা চরিত্রবান ব্যক্তির নিকট সমাজের অন্যরা নিরাপদ থাকে। পক্ষান্তরে দুশ্চরিত্রবান ব্যক্তি থেকে সবাই শঙ্কিত থাকে। তার ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য মানুষ সর্বদা নিরাপদ দূরে অবস্থান করে। উত্তম চরিত্র সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ 'নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত' *(ক্বলম ৬৮/৪)*। তিনি আরো বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 'তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনে সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে' *(আহযাব ৩৩/২১)*। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا 'তোমাদের মধ্যে আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয় সেই ব্যক্তি যে সর্বাধিক উত্তম চরিত্রের অধিকারী'।[৫৫] মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান হল সচ্চরিত্র। আর সচ্চরিত্রের মূল উপাদান হল-সময়ানুবর্তিতা। বিনম্রতা, সত্যবাদিতা, সহনশীলতা, সহিষ্ণুতা, শৃঙ্খলাবোধ, সুশিক্ষা, পরিমিত আহার, পরিমিত ব্যয়, শালীন ও পরিমার্জিত পোশাক, মিষ্ট ভাষা আর মুচকি হাসি ইত্যাদি গুণাবলী সবই সচ্চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত। এর বিপরীত দিকগুলো মানুষকে কলুষিত ও কলঙ্কিত করে। অন্যদিকে আল্লাহ যাকে সচ্চরিত্র প্রদান করেন সে সৌভাগ্যবান। চরিত্রবান ব্যক্তির দ্বারাই দেশ ও জাতির প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়। চরিত্রহীন ব্যক্তির নিকট থেকে অকল্যাণ

৫৩. আবুদাঊদ হা/৪৯৫; মিশকাত হা/৫৭২।
৫৪. বুখারী হা/৭১; মুসলিম হা/২৪৩৬; মিশকাত হা/২০০।
৫৫. বুখারী হা/৩৭৫৯; মিশকাত হা/৫০৭৪।

ছাড়া কিছু পাওয়া যায় না। আসুন আমরা সকলে আমাদের সোনামণিদেরকে উল্লেখিত গুণাবলীর আলোকে সৎচরিত্র গঠনে প্রশিক্ষণ দিয়ে আদর্শ ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ গঠনে উৎসাহিত করি। আমাদের সকলের উচিত চরিত্র গঠনের এ চলমান কাফেলা অব্যাহত রাখা। আল্লাহ আমাদের এ প্রচষ্টাকে কবুল করুন। আমীন!

চ. বৈষম্যহীন আচরণ পাবার অধিকার :

ইসলাম সকল প্রকার বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। জন্মগত, বংশগত, ভাষাগত বা আঞ্চলিকতার বিচারে কোন মানুষের মর্যাদা ও প্রাধান্য স্বীকার করে না। সমাজে সবাই সমান ও সবাই একই মর্যাদার অধিকারী। এর বাস্তব দৃষ্টান্ত হল ছালাত। এখানে ধনী-গরীব, রাজা-বাদশাহ, মন্ত্রী-এমপি, ডিসি, ভিসি, ম্যাজিস্ট্রেট সবাই সমান। কারণ ছালাতে ফকির আগে আসলে সে প্রথম কাতারে দাঁড়াবে এবং মন্ত্রী বা রাজা যেই হোক পরে আসলে, সে পরেই দাঁড়াবে। আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ 'নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই' *(হুজুরাত ৪৯/১০)*।

মানুষ পরস্পর সহনশীল, মমত্ববোধ, আন্তরিকতাপূর্ণ ও হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করবে। ইসলাম পূর্ব যুগে নারীদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। কন্যা সন্তান জন্ম হওয়া তখনকার যুগে ছিল অভিশাপ। তাই কন্যা সন্তান জন্ম হওয়া মাত্র তাদেরকে জীবন্ত প্রোথিত করা হত। কিন্তু পিতা নামের নর পশুদের নিকটে ঐ সন্তানের আর্তচিৎকার তার পাষাণ হৃদয়ে কোন দয়ার উদ্রেক করত না। অথচ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কেউ যদি ২/৩ জন মেয়ে অথবা বোনকে লালন-পালন করে, তাদেরকে শিষ্টাচার শেখায়, তাদের বিবাহের ব্যবস্থা করে ও তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করে, তবে তার জন্য জান্নাত রয়েছে'।[৫৬] আল্লাহ বলেন, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ- بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ 'যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তাকে কোন অপরাধে হত্যা করা হয়েছিল' *(তাকভীর ৮১/৮-৯)*। অন্যদিকে আল্লাহ তা'আলা স্বামীদের লক্ষ্য করে বলেন, 'তোমরা তাদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন কর' *(নিসা ৪/১৯)*। কর্মক্ষেত্রেও নারীদের সমান মর্যাদা ও অধিকার রয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের পুরুষেরা যা উপার্জন করবে তা তোমাদের থাকবে, আর নারীরা যা উপার্জন করবে তা তাদের জন্য থাকবে' *(নিসা ৪/৩২)*। পারিবারিক ব্যয় নির্বাহের জন্য দায়িত্ব পুরুষদের উপর। নারী বা স্ত্রীর দায়িত্ব নয়। রাসূল (ছাঃ) নারীদের লাঞ্ছনা ও অবহেলার মূলোৎপাটন করেছেন। নারীদের সাথে সদ্ব্যবহারের প্রতি উৎসাহিত করেছেন। নারীদের দায়িত্ব যারা পালন করবে তাদের জন্য রাসূল (ছাঃ) জান্নাত লাভের ঘোষণা দিয়েছেন। অথচ ছেলে সন্তানের কারণে জান্নাতে যাবে এমন হাদীছ নেই। আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট এক মহিলা ও দুই কন্যা আসার বুখারী ও মুসলিমের হাদীছটি এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। সুতরাং ইসলামে পুরুষ ও নারী, ছেলে বা মেয়েদের ক্ষেত্রে কোন প্রকার বৈষম্যের স্থান নেই। সোনামণি ছেলে-মেয়ে সবার সাথে সমান আচরণ করতে হবে। সমানভাবে তাদের খাওয়া-দাওয়া, পড়াশুনা ও পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করতে হবে। অতএব আমাদেরকে শিশু-কিশোরদের প্রতি সমান ভালবাসা ও সহানুভূতিশীল আচরণ করার ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

ছ. উত্তম বন্ধুদের সাহচর্যের অধিকার :

জাহেলিয়াতের চরম চারিত্রিক অবক্ষয়ের যুগে আমাদের প্রিয় নবী (ছাঃ)-এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যারা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল, তারাই হয়েছিল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সোনার মানুষ। এর মূল কারণ ছিল তাঁরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে উত্তম সাথী হিসাবে গ্রহণ করেছিল। সুতরাং মানব জীবনে উত্তম বন্ধু বা সাথীর প্রয়োজন অপরিসীম। উত্তম বন্ধুর গুণাবলী সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ 'যারা ভুল করার পর তওবা করে, ছালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে, তারাই হ'ল তোমার দ্বীনী ভাই ও বন্ধু' *(তাওবা ৯/১১)*। বন্ধু অর্থ সাথী, মিত্র, সখা, সুহৃদ, স্বজন, হিতৈষী বা কল্যাণকামী। বন্ধু ছাড়া শিশু-কিশোর তথা যুবক-যুবতীরা নিজেদেরকে খুবই অসহায় মনে করে। একজন ভাল বন্ধু থাকলে জীবনে আর কিছুর প্রয়োজন হয় না। জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য প্রয়োজন ৩টি জিনিস। যথা : (১) কঠোর অধ্যবসায় (২) কর্ম-নিষ্ঠা এবং (৩) ভাল বন্ধুর সাহচর্য। আর ভাল বন্ধুর পরিচয় হবে (১) মহৎ হৃদয় (২) অন্যের মঙ্গলকামী। কারণ আমরা সাধারণত দেখতে পাই ভাল লোকের সাথে ভাল লোকের বন্ধু, চোরের সাথে চোরের বন্ধুত্ব হয়ে থাকে। প্রাথমিক বা ইবতেদায়ীর বন্ধুরা সাধারণত লেখাপড়া ও খেলার সাথী হয়ে থাকে। দাখিল বা উচ্চবিদ্যালয়ের বন্ধুরা সাধারণত লেখাপড়া ও খেলার সাথী হয়ে থাকে। এ সময় থেকে তাদের শারীরিক ও মানসিক কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এ সময়চর্চা জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান। এ সময় ভাল বন্ধুর সাহচর্য ও সঠিক ইসলামী শিক্ষা পেলেই সে প্রকৃত ভাল মানুষ হিসাবে গড়ে উঠে। তাই তো এ সময় পিতা-মাতা ও বড় ভাই স্কুল/মাদরাসা থেকে একটু দেরী করে ফিরলেই বকুনী দেয় বা রাগ করে বা ধমক দেয়। আর কলেজ ও ভার্সিটির জীবন তো অবাধ স্বাধীনতার জীবন। এখানে এসে তারা মনে করে, দুনিয়াটা মস্তবড়। খাও, দাও ফূর্তি কর। যেখানে খুশী সেখানে যাও, বাধা নেই, মানা নেই। মন যা চায় তাই কর, তাই সব খাও। এই সুযোগে প্রায় ৯০% ছাত্র-ছাত্রীরা খারাপের দিকে ধাবিত হয় এবং ১০% ছাত্র-ছাত্রী ইসলামের আদর্শে জীবন গড়ে বলে আমার ব্যক্তিগত জরীপে মনে হয়।

তাই আমার উপদেশ বন্ধুত্ব করার পূর্বে বিয়ের পাত্র দেখার মত তার জীবনের তথ্য মিলিয়ে জেনে, শুনে ও বুঝে একজন প্রকৃত ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত বন্ধু খুঁজতে হবে। সৎ, যোগ্য, ঈমানদার ভাল বন্ধু খুজুন, না পেলে নিঃসঙ্গ থাকুন। এটাই বন্ধুত্বের জন্য চূড়ান্ত ও শেষ উপদেশ।

জ. শ্রমজীবি শিশু-কিশোরদের অধিকার :

মহান আল্লাহ আমাদেরকে শ্রম, কর্মোদ্যম এবং ন্যায়নিষ্ঠার জ্ঞান দান করেছেন। আমাদের প্রিয়নবী (ছাঃ) সহ তাঁর সকল ছাহাবীরা ছিলেন অত্যন্ত পরিশ্রমী। রাসূল (ছাঃ) শ্রমের মূল্যায়ন করতে সকলকে তাগিদ দিয়েছেন। যার আগমন হয়েছিল বঞ্চিত ও অধিকার হারাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে সুন্দর সমৃদ্ধশালী শান্তির সমাজ ও দেশ প্রতিষ্ঠা করা। মহান আল্লাহ বলেন, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ 'নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি শ্রমনির্ভর করে' *(সূরা বালাদ ৯০/৪)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'যখন ছালাত শেষ হয়ে যাবে তখন তোমরা ভূপৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক অন্বেষণ করবে' *(জুমু'আ ৬২/৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'শ্রমিকের ঘাম শুকানোর আগেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও' *(ইবনু মাজাহ হা/২৪৪৩; মিশকাত হা/২৯৮৭)*। তিনি আরও বলেন, مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ 'স্বচ্ছল ব্যক্তির জন্য পাওনা পরিশোধে টাল বাহানা বা বিলম্ব করা যুলুমের নামান্তর'।[৫৭] তাই যথাসম্ভব শ্রম সমাপ্তির পরপর শ্রমিকের প্রাপ্য পরিশোধ করে দেওয়া উচিৎ। সাধ্যাতীত শ্রম নিষিদ্ধ এবং শিশু-কিশোরদের উপর কঠোর বোঝা চাপানোও নিষেধ। শিশু-শ্রম যদি একান্ত প্রয়োজন হয় তবে কর্মঘন্টা নির্ধারণ, বিশ্রাম ও বিনোদন এবং শিক্ষার সুব্যবস্থা থাকতে

৫৬. আহমাদ হা/১১৮৬৩ ও ১১৩২৩।

৫৭. বুখারী হা/২২৮৭; মুসলিম হা/৪০৮৫; মিশকাত হা/২৯০৭।

হবে। এক্ষেত্রে তাদের অধিকারের সার্বিক দিক বিবেচনা করা একান্ত কর্তব্য। নবী (ছাঃ) শ্রমিকের পারিশ্রমিক নির্ধারণ না করে শ্রমিক নিয়োগ দিতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরও বলেন, 'অধীনস্তদের জন্য খাবার ও পোশাকের ব্যবস্থা করবে, তাদের উপর সাধ্যাতীত কাজ চাপিয়ে দিবে না *(মুসলিম)*। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শ অনুসরণ করলে এবং ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়িত হলে আমাদের সমাজ, দেশ ও জাতি সমৃদ্ধ হবে। প্রতিভাবান শ্রমজীবি শিশু-কিশোরদের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। ফলশ্রুতিতে তারা তাদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণ বয়ে আনতে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ।

ঝ. খেলাধূলা, বিনোদন ও শিশুর শরীর চর্চার অধিকার :

মহান আল্লাহ অত্যন্ত সুন্দরভাবে আমাদের শারীরিক অবকাঠামো তৈরী করেছেন। অতঃপর সুস্থ থাকার জন্য খেলাধূলা, বিনোদন ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য খাদ্য-খাবার, আহার-বিহার ও শরীর চর্চার ব্যবস্থা করেছেন। আমাদের এই সুন্দর শরীর আল্লাহ প্রদত্ত নে'মত। আল্লাহ বলেন, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ 'আমি মানুষকে সুন্দর অবয়বে সৃষ্টি করেছি' *(ত্বীন ৯৫/৪)*। শরীর সুস্থ থাকলে মন ভাল থাকে আর শরীর অসুস্থ থাকলে পারিবারিক ও মানসিক চাপ বৃদ্ধি পায় এবং দুঃশ্চিন্তা বাড়ে। ফলে ইবাদত, আনুগত্য, পরিশ্রম, বিনোদন ইত্যাদি কোন কিছুই ভাল লাগে না। এক্ষেত্রে ভাল স্বাস্থের জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত ব্যয়াম করা।

শিশুরা অবোধ। তাই তাদের স্বাস্থ্যের, বিনোদনের ও খেলাধূলার জন্য পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের যথাযথ ভূমিকা রাখতে হবে। খেলাধূলার উপকারিতা ও অপকারিতা সম্পর্কে তাদেরকে জানাতে হবে। খেলাধূলার পরিশ্রমের কারণে রক্ত সঞ্চালন হেতু পরিপাকতন্ত্র সবল হয়, খাদ্য হজমে সহায়ক হয় এবং ঘাম নির্গত হয়ে শরীরের দূষিত পদার্থ বেরিয়ে যায়। সাময়িক ক্লান্তি হলেও দৈহিক শক্তি সঞ্চয় হয়। খাদ্যের চাহিদা বাড়ে এবং শরীর সুস্থ থাকে। এটা শিশুদের অধিকার। এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا 'তোমার শরীরের প্রতি তোমার কর্তব্য ও অধিকার রয়েছে'।[৫৮] শরীরের হক যেমন আরাম করা, তেমন পরিশ্রম করাও একটি অধিকার। খেলবে শিশুরা, খেয়াল রাখবে অভিভাবকগণ। তাস, পাশা, জুয়া, দাবা, কেরাম, লুডু ইত্যাদি খেলা বাচ্চাদের অলস, দুর্বল ও নেশাগ্রস্ত করে তোলে। সুতরাং এ সমস্ত খেলা পরিত্যাগ করে শ্রমনির্ভর খেলা দৌড়, সাঁতার, ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন ও ভলিবল ইত্যাদি খেলায় অভ্যস্ত করে গড়ে তুলতে হবে। শিশুদের শরীরের যত্ন নেয়া ও নিয়মিত শরীর চর্চার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে দেয়া পিতা-মাতা ও অভিভাবকের দায়িত্ব ও কর্তব্য। তবে পড়াশুনা ও ইবাদতে যেন কোন প্রকার ব্যাঘাত না ঘটে সেদিকে সর্বদা লক্ষ্য রাখবেন। হে আল্লাহ! তোমার মদদ কামনা করি। আমীন!

ঞ. শিশু-কিশোরদের বিভিন্নভাবে নির্যাতনসহ যৌন নির্যাতন থেকে রক্ষা পাবার অধিকার :

স্বতঃসিদ্ধ কথা এই যে, আমরা সবাই একদিন ঐ ছোট্ট কোমলমতি ফুটফুটে শিশু হয়ে এ ধরায় এসেছিলাম। কিন্তু আজ একথা সবাই আমরা ভুলতে বসেছি। বর্তমানে ভাবতে অবাক ও কষ্ট লাগে আমরা সোনামণিদের বিভিন্নভাবে নির্যাতন, নিপীড়ন ও অধিকার বঞ্চিত করছি। অথচ মহান আল্লাহ্‌র অন্যতম সৃষ্টি হিসাবে আদর, সোহাগ, স্নেহ ও মমতার বন্ধনে আবদ্ধ থেকে নিজেকে যোগ্য হিসাবে গড়ে ওঠাই তাদের অধিকার। সোনামণিরা নিজ পরিবারে, আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ী (যেমন-খালা, মামা, চাচা, ফুফু এবং দুলাভাই), শিক্ষক ও বন্ধু এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের অসৎ ও দুশ্চরিত্র ব্যক্তিদের মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক এবং নানাভাবে প্রতিনিয়ত নির্যাতিত হচ্ছে। শিশু-কিশোরদের বিভিন্নভাবে নির্যাতনসহ যৌন নির্যাতন থেকে মুক্ত রাখতে হবে। এ ব্যাপারে সামাজিকভাবে গণসচেতনতা এবং প্রশাসনিকভাবে জোরালো আইনগত ভূমিকা পালন করা একান্ত যরূরী।

ট. শিশু-কিশোরদের হত্যা ও পাচার রোধের অধিকার :

পাচার শব্দটি বর্তমানে বেশ সুপরিচিত একটি পরিভাষা। মানব পাচার, মহিলা ও শিশু পাচার এখন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। পাচার বলতে এক শ্রেণির অসাধু ও দুষ্টচক্রকে বুঝায়। যারা অর্থের লোভে মানবতাকে বিসর্জন দিয়ে তাদেরকে ফুসলিয়ে বা অচেতন করে ভিনদেশে পাচার করে দেয়। পরবর্তীতে তাদেরকে হত্যা করে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চড়ামূল্যে বিক্রি করা হয় অথবা তাদেরকে অনৈতিক কাজে ব্যবহার করা হয়। এটা অত্যন্ত ঘৃণ্য, জঘন্য ও নিন্দনীয় কাজ। পাচার একটি পরিবারকে ধ্বংস করে দেয়। বাবা-মা, আত্মীয়স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর সুস্বপ্নকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। এটা বাংলাদেশের একটি জাতীয় সমস্যা, যার দ্রুত নিষ্পত্তি ও অবসান হওয়া একান্ত প্রয়োজন। বিদেশে ভাল চাকুরীর, বিয়ের, লেখাপড়ার, বেড়ানোর এবং অসৎ বন্ধুদের মিথ্যা প্রলোভনের আশ্বাসে প্রতিনিয়ত পুরুষ ও মহিলা এবং শিশু-কিশোর পাচার হচ্ছে। ইসলামে প্রতারণা একটি গর্হিত অপরাধ। মহান আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ 'যারা অন্যায় কাজের চক্রান্তে লেগে থাকে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ হবে' *(ফাত্বির ৩৫/১০)*।

● শিশু-কিশোরদের পাচার রোধে করণীয় :

শিশু-কিশোর পাচাররোধে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সর্বাধিক প্রাধান্য দেওয়া দরকার। (১) নির্জন স্থানে একাকী বেড়ানো, ঘোরাফেরা ও অবস্থান না করা। (২) সর্বদা সচেতনতা ও সাবধানতার নীতি অবলম্বন করা। (৩) আইন-শৃংখলা বাহিনীকে দ্রুত অবহিত করা। (৪) অপহৃত হলে দ্রুত প্রচার মাধ্যম বিশেষত রেডিও, টিভি ও পত্রিকায় তার ছবিসহ বায়োডাটা প্রচার করা। (৫) সীমান্ত প্রহরীদের যথাযথ দায়িত্ব পালন করা *(আলে-ইমরান ২৩/২০০)*। (৬) ধরা পড়লে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। যাতে পরবর্তীকালে কেউ এ কাজের দুঃসাহস দেখাতে না পারে। (৭) আত্মরক্ষার জন্য সোনামণিদের ব্যায়াম বা শরীর চর্চা ও সাঁতারসহ বিভিন্ন কৌশল শিক্ষা দেওয়া।

উপসংহার :

গোলাপের মত সুন্দর, হাসনাহেনার মত সুগন্ধি ছড়ানো নিষ্পাপ, নিষ্কলুষ আমাদের অতি আদরের হৃদয়ের বাঁধন, নয়নের পুত্তলি সোনামণি তথা শিশু-কিশোরদের অধিকার বিষয়ে আলোচনার প্রেক্ষিতে অবগত হলাম যে, এ অধিকারগুলি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের দায়িত্ব পিতা-মাতা, অভিভাবক, শিক্ষক সংগঠন, সমাজ ও রাষ্ট্রের। তাই আসুন! আমরা আমাদের সোনামণিদের সাথে আন্তরিকভাবে মিশে পবিত্র মন নিয়ে তাদেরকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শ হাতে-কলমে জীবন গড়ার বাস্তব প্রশিক্ষণ দেই। যাতে করে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, নৈতিক, সাংগঠনিক ও সামাজিকভাবে সময়, শ্রম, মেধা ও অর্থ ব্যয় করার মানসিকতা নিয়ে শিশু-কিশোরদের সুপ্ত প্রতিভার দীপ্ত প্রভাব জাগ্রত করি। জাতির কাছে তাদের এ অধিকারগুচ্ছ তুলে ধরে ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে জান্নাতের পথ সুগম করি। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে শিশু-কিশোরদের অধিকারগুলি বাস্তবায়নের শক্তি, সামর্থ্য ও তাওফীক দান করুন। আমীন!

[লেখক : প্রথম কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি]

৫৮. মুসলিম হা/২৭৮৭।

পবিত্রতা অর্জনের সাথে সম্পর্কিত বিদ‘আত সমূহ

-বযলুর রহমান

ভূমিকা :

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের সঠিক দিক-নির্দেশনা এখানে মওজুদ রয়েছে। ধর্মীয় ও বৈষয়িক ব্যবস্থাপনার সুনিয়ন্ত্রিত কর্মপদ্ধতি ও কর্মসূচির পূর্ণাঙ্গ ধারাপাত এখানে ঘোষিত হয়েছে। বিশ্ব মানবতার একমাত্র সংবিধান অভ্রান্ত সত্যের চূড়ান্ত উৎস পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রতিটি ছত্রে ছত্রে যার প্রতিধ্বনি পরিলক্ষিত হয়। আর ইবাদতে তাওক্বীফী ও মু‘আমালাতের যাবতীয় বিধি-নিষেধ ও নির্দেশনার সার্বিক কর্মতৎপরতা বিশুদ্ধতার নিরিখে মূল্যায়িত হয়ে থাকে। সুতরাং যাবতীয় কার্যক্রমের সমর্থনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিশুদ্ধ মানদণ্ড থাকতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলেও সত্য যে, মুসলিম সমাজ আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত ব্যবস্থাপনা থেকে যোজন যোজন দূরে অবস্থান করছে। মানুষ ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতার প্রতি লক্ষ্য করে না। ফলে মানুষের আমলী যিন্দেগীর অধিকাংশ কার্যক্রম ধারণা নির্ভর এবং পারিবারিক ও সামাজিক ঐতিহ্যের স্মারক হিসাবে প্রতিপালিত হয়ে থাকে। যা তার যাবতীয় কৃত আমলকে বিনষ্ট করে দেয়। নিম্নে প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলিম সমাজে প্রচলিত ‘পবিত্রতার সাথে সম্পর্কিত বিদ‘আত সমূহ’ উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ।

১. ওযূ ও তায়াম্মুমের নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা :

اَلنِّيَّةُ শব্দটি আরবী। যার শাব্দিক অর্থ পরিকল্পনা করা, ইচ্ছা করা, মনস্থ করা, অন্তরে কোন কিছুর সংকল্প করা, স্থির সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রভৃতি। মূলতঃ এটি نوي মাসদার থেকে উৎসারিত। যার শাব্দিক অর্থ শক্ত আঁটি বা বীচি, দানা বা বীজ। আল্লামা সাইয়েদ সাবেক্ব (রহঃ) বলেন, النية وحقيقتها الارادة المتوجهة نحو الفعل، ابتغاء رضا الله تعالى وامتثال حكمه، وهي عمل قلبي محض لا دخل للسان فيه، والتلفظ بها غير مشروع ‘নিয়ত হ’ল, আল্লাহ তা‘আলার আনুগত্য ও সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কোন কাজ করার সংকল্প করা। এটি শুধুমাত্র মনের সাথে সম্পৃক্ত একটি কাজ। নিয়তের সাথে মৌখিক উচ্চারণের কোন সম্পর্ক নেই। তাছাড়া এটি শরী‘আতসিদ্ধও নয়।[৫৯] আর মূলতঃ মনের ইচ্ছা ও অভিপ্রায়কে নিয়ত বলে। তাছাড়া ত্রুটিযুক্ত দানায় যেমন ত্রুটিযুক্ত ফল উৎপাদন হয়, তেমনি নিয়ত পরিশুদ্ধ না হ’লে জীবনের কৃত সকল আমল বা ইবাদতই বরবাদ হয়ে যাবে। আর এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, বিশ্ব মানবতার প্রত্যেক কাজ তার অন্তরে পরিকল্পিত চিন্তা-চেতনার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। তাই মানুষের সকল কাজ তার নিয়তের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং একনিষ্ঠচিত্তে ও নিবিষ্ট মনে কেবলমাত্র আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণই হবে বিশুদ্ধ নিয়তের মৌলিক দাবী। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ‘প্রত্যেক কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল’।[৬০]

ওযূ ও তায়াম্মুমের নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা স্পষ্টরূপে বিদ‘আত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও তাবে‘-তাবেঈনগণের মধ্যে কেউ সশব্দে নিয়ত করতেন মর্মে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এমনকি আইম্মাতুস সালাফও এর অনুমোদন দেননি। কেননা এটি মানুষের তৈরী বিধান। বরং সুন্নাত হ’ল ওযূ ও তায়াম্মুমের পূর্বে ‘বিসমিল্লাহ’ বলা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এমনটি করতেন। যেমন-

عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ.

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ছালাত হয় না ওযূ ছাড়া আর ওযূ হয় না বিসমিল্লাহ বলা ছাড়া’।[৬১] সুতরাং বর্তমান মুসলিম সমাজে ওযূ ও তায়াম্মুমের নামে যে লিখিত ও প্রচলিত নিয়ত চালু আছে তা স্পষ্ট বিদ‘আত ও ভ্রষ্টতা। অতএব তা পরিত্যাগ করতে হবে। বরং মনে মনে নিয়ত করতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলেও সত্য যে, মাযহাবী ফিক্বহী গ্রন্থসমূহে এটিকে সুন্নাত মনে না করে মনের ইচ্ছার সাথে মিল করার জন্য নিয়ত মুখে উচ্চারণ করাকে ‘উত্তম’ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। প্রসিদ্ধ হানাফী ফক্বীহ সারাখসী বলেন, وَالتَّكَلُّمُ بِالنِّيَّةِ لَا مُعْتَبَرَ بِهِ، فَإِنْ فَعَلَهُ لِيَجْتَمِعَ عَزِيمَةُ قَلْبِهِ فَهُوَ حَسَنٌ ‘(ওযূ বা তায়াম্মুমের শুরুতে) মুখে নিয়ত বলা ধর্তব্য নয়। তবে কেউ যদি মনের ইচ্ছার সাথে মিল করার জন্য মুখে নিয়ত উচ্চারণ করে থাকে, তাহলে তা ভাল’।[৬২] ফক্বীহদের এই মনগড়া বক্তব্যের প্রতিবাদে আল্লামা শায়খ উছায়মীন (রহঃ) পরিষ্কারভাবে বলেছেন, ‘নিয়তের স্থান হ’ল অন্তর। তা মুখে উচ্চারণ করার কোন প্রয়োজন নেই। আপনি যখন ওযূ করবেন তখন এটা একটা নিয়ত। একজন বিবেকবান ও সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ কোন কাজ করবে অথচ নিয়ত করবে না, এটা অসম্ভব....। তাছাড়া রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামগণের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কোন প্রমাণসিদ্ধ দলীল নেই। যারা মুখে উচ্চারণ ও শুনিয়ে নিয়ত করে তাদেরকে দেখবেন হয় তারা মূর্খ নতুবা তারা কোন আলেমের তাক্বলীদ বা অন্ধ অনুসরণ করে থাকে। মুখে উচ্চারণকারীদের যুক্তি হচ্ছে, অন্তরের ইচ্ছার সাথে মুখের কথা ও কাজের মিলের জন্য নিয়ত পাঠ করা উচিত। কিন্তু আমাদের বক্তব্য হ’ল, তাদের এ যুক্তি অসার ও ভিত্তিহীন। কেননা একাজ যদি শরী‘আতসম্মত হ’ত, তা’হলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কথা ও আমলের মাধ্যমে উম্মতের সামনে বর্ণনা করতেন’।[৬৩]

(২) ওযূর অঙ্গগুলো তিনবারের অধিক ধৌত করা :

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ একটি জীবন বিধান। সেখানে কারো কোনরকম কমবেশী করার সুযোগ নেই। অতএব ওযূর ক্ষেত্রে অযাচিত সন্দেহ পোষণ করে অতিরিক্ত পানি ব্যবহার কিংবা তিনবারের অতিরিক্তি ওযূ ও তায়াম্মুমের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত ও মাসাহ করা স্পষ্ট সীমালঙ্ঘন এবং বিদ‘আত। যা রাসূল (ছাঃ) কখনো করেননি। বরং তিনি এ ব্যাপারে অত্যন্ত কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ فَأَرَاهُ الْوُضُوءَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ هَكَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ.

---

৫৯. আল্লামা সাইয়েদ সাবেক্ব (মৃত ১৪২০ হিঃ), ফিক্বহুস সুন্নাহ (তাবি) ১/৪২-৪৩ পৃঃ।

৬০. ছহীহুল বুখারী হা/১ ও ৬৬৮৯; ছহীহ মুসলিম হা/৫০৩৬।

৬১. আবুদাঊদ ১/১৪ পৃঃ, হা/১০১,১০২, ‘ওযূতে বিসমিল্লাহ বলা’ অনুচ্ছেদ-৪৮, ‘পবিত্রতা’ অধ্যায়; ইবনু মাজাহ ১/৩২-৩৩ পৃঃ, হা/৩৯৭-৩৯৯; মিশকাত হা/৪০২।

৬২. ইমাম সারাখসী (রহঃ) (মৃত ৪৮৩ হিঃ), আল-মাবসূত (তাবি) পৃঃ ১৯।

৬৩. মুহাম্মাদ ইবনু ছালেহ উছায়মীন, ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম (তাবি), প্রশ্ন নং : ২২২, ৬৭ পৃঃ ‘ছালাত সংক্রান্ত ফাতাওয়া সমূহ’ অধ্যায়।

'আমর ইবনু শু'আয়ব (রাঃ) তাঁর পিতার সূত্রে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন জনৈক বেদুঈন এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ওযূ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি তাকে ওযূর অঙ্গগুলো তিন-তিনবার ধৌত করে দেখালেন। অতঃপর বললেন, এভাবেই ওযূ করতে হয়। তবে যে ব্যক্তি এর অতিরিক্ত করল সে সীমালঙ্ঘন ও যুলুম করল'।[৬৪] শায়খ আল্লামা আলবানী (রহঃ) বলেন, 'এটি (ওযূতে তিনবারের অধিক ধৌত করা) বিদ'আত'।[৬৫] ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, وَإِنَّمَا تَكُونُ الرَّابِعَةُ بِدْعَةً وَمَكْرُوهَةً 'অর্থাৎ চতুর্থবার ধৌত করা বিদ'আত ও অপছন্দীয়'।[৬৬] ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ) বলেন, 'সন্দেহপোষণকারী ছাড়া কেউ তিনবারের অতিরিক্ত ধৌত করে না'। ইবনুল মুবারক বলেন, 'এটি একটি মহাপাপ'।[৬৭] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّهُ سَيَكُونُ فِى هَذِهِ الأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِى الطُّهُورِ وَالدُّعَاءِ 'আমার উম্মতের মধ্যে এমন কতিপয় লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা দু'আ এবং পবিত্রতা অর্জনের সময় সীমালঙ্ঘন করবে'।[৬৮] সুতরাং ওযূ ও তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। অযাচিত সন্দেহ করে অতিরিক্ত পানির ব্যবহার পরিত্যাগ করতে হবে। কেননা এটা রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক সমর্থিত নয়। আর যা রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক সমর্থিত নয় তা নিঃসন্দেহে বিদ'আত। অতএব ওযূতে তিনবারের অতিরিক্ত পানি ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে।

(৩) ওযূতে ঘাড় মাসাহ করা :

ওযূতে ঘাড় মাসাহ সংক্রান্ত কোন বিশুদ্ধ প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ প্রসঙ্গে যে হাদীছগুলো বর্ণিত হয়েছে তার সবগুলো নিতান্তই দুর্বল, মিথ্যা ও বানোয়াট। বাজারে অসংখ্য 'নামাজ শিক্ষা' বই রয়েছে, যেখানে 'ওযূতে ঘাড় মাসাহ' সম্পর্কে যে হাদীছগুলোর দ্বারা দলীল পেশ করা হয়েছে তার সবগুলোই মুহাদ্দিছগণের সর্বসম্মতিক্রমে যঈফ ও জাল। হাদীছগুলো নিম্নরূপ :

(١) عَنْ طَلْحَةَ بن مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ حَتَّى بَلَغَ الْقَذَالَ وَمَا يَلِيهِ مِنْ مُقَدَّمِ الْعُنُقِ بِمَرَّةٍ.

(১) ত্বালহা ইবনু মুছাররিফ তার পিতার সূত্রে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখলেন যে, তিনি মাথা মাসাহ করতে গিয়ে ঘাড়ের উপরিভাগ পর্যন্ত একবার মাসাহ করলেন।[৬৯]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ।[৭০] ইবনু উ'আইনা বলেন, হাদীছটি মুনকার বা অস্বীকৃত।[৭১] ইমাম শাওকানী বলেন, হাদীছটি অত্যন্ত দুর্বল। উক্ত হাদীছে লায়ছ নামক রাবী অত্যন্ত দুর্বল ও সমালোচিত।[৭২] ইবনু হিব্বান (রহঃ) বলেন, তিনি (লায়ছ) হাদীছের সনদ উলট-পালট করতেন, মুরসাল বর্ণনাকে মারফূ' রূপে বর্ণনা করতেন এবং বিশ্বস্ত রাবীদের নামে এমন সব হাদীছ বর্ণনা করতেন, যা মূলতঃ তাদের বর্ণিত হাদীছ নয়। ইয়াহইয়া ইবনুল কাত্তান, ইবনুল মাহদী, ইবনু মঈন ও আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ) প্রমুখ হাদীছ বিশেষজ্ঞগণ তার বর্ণনা গ্রহণ করতেন না।[৭৩]

(٢) عَنْ اِبْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ مَسَحَ عُنُقَهُ وَيَقُوْلُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عُنُقَهُ لَمْ يَغِلَّ بِالْأَغْلَالِ يَوْمَ القِيَامَةِ.

(২) ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই তিনি যখন ওযূ করতেন তখন তার ঘাড় মাসাহ করতেন, এবং বলতেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ওযূ করবে এবং ঘাড় মাসাহ করবে তাকে ক্বিয়ামতের দিন বেড়ী দ্বারা বেড়ী পরানো হবে না।[৭৪] অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, যে ব্যক্তি মাথার সাথে ঘাড়ের নিম্নদেশ মাসাহ করবে, ক্বিয়ামতের দিন সে বেড়ী থেকে রক্ষা পাবে।[৭৫]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি জাল বা মিথ্যা।[৭৬] উক্ত বর্ণনায় মুহাম্মাদ ইবনু আমর আল-আনছারী ও মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনু মুহাররম নামের দু'জন ব্যক্তি ত্রুটিপূর্ণ। মুহাদ্দিছগণ তাদেরকে দুর্বল বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন।[৭৭]

(٣) عَنْ وَائِلِ بن حُجْرٍ فِي صِفَةِ وَضُوْءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... ثُمَّ مَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثًا، وَمَسَحَ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ، وَمَسَحَ رُقْبَتَهُ وَبَاطِنَ لِحْيَتَهُ بِفَضْلِ مَاءِ الرَّأْسِ...

(৩) ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর ওযূর পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা করে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম... (তিনি তাঁর ওযূতে) তিনবার মাথা মাসাহ করলেন এবং দুই কানের পিঠ মাসাহ করলেন ও ঘাড় মাসাহ করলেন এবং মাথার অতিরিক্ত পানি দিয়ে দাড়ির পেট মাসাহ করেন..।[৭৮]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি জাল।[৭৯] ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, 'এটা জাল হাদীছ। নবী করীম (ছাঃ)-এর বক্তব্য নয়'।[৮০]

(٣) مَسْحُ الرُّقْبَةِ أَمَانٌ مِنَ الْغِلِّ.

(৪) ঘাড় মাসাহ করলে বেড়ী থেকে নিরাপদ থাকবে।[৮১]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি জাল ও ভিত্তিহীন।[৮২] বিশিষ্ট হাদীছ বিশারদ আল্লামা ইবনুছ ছালাহ (রহঃ) বলেন,

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: هَذَا الْخَبَرُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مِنْ قَوْلِ بَعْضِ السَّلَفِ.

---

৬৪. নাসাঈ হা/১৪০, ১/১৮ পৃঃ, 'ওযূতে সীমালঙ্ঘন' অনুচ্ছেদ, ইবনু মাজাহ হা/৪২২, ১/৩৪ পৃ:; আবুদাঊদ হা/১৩৫; ইবনু খুযায়মাহ হা/১৭৪; মিশকাত হা/৪১৭; মুসনাদে আহমাদ হা/৬৬৮৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৯৮০।

৬৫. আলবানী, ছহীহ আবুদাঊদ (কুয়েত, প্রথম সংস্করণ ২০০২ খ্রিঃ/১৪২৩ হিঃ) ১/২৩০ পৃঃ, হা/১২৪-এর আলোচনা দ্রঃ।

৬৬. শায়খ মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ, ফাতাওয়াউল ইসলাম সাওয়াল ওয়াল জাওয়াব (তাবি), প্রশ্ন নং-৭১১৬৯-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৬৭. ফাতাওয়া : দারুল ইফতা (মিসর, তাবি) ৮/৪৩২ পৃঃ।

৬৮. আবুদাঊদ হা/৯৬; ইবনু মাজাহ হা/৩৬৮৪; মিশকাত হা/৪১৮।

৬৯. মুসনাদে আহমাদ হা/১৫৯৯৩; আবুদাঊদ হা/১৩২।

৭০. যঈফ আবুদাঊদ হা/১৩২।

৭১. মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীছিয যঈফাহ ওয়াল মাওযূ'আহ (রিয়ায, ১৯৯২ খ্রিঃ/১৪১২ হিঃ) ১/১৭০ পৃঃ, হা/৭৯-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৭২. ইমাম শাওকানী, নায়লুল আওত্বার তাহক্বীক্ব : ঈছামুদ্দীন আছ-ছাবাবাতী, (দারুল হাদীছ : মিসর, ১ম সংস্করণ ১৪১৩ হিঃ/১৯৯৩ খ্রিঃ) ১/২০২ পৃঃ।

৭৩. ইবনু আবী হাতেম, আল-মাজরূহীন, তাহক্বীক্ব : মাহমুদ ইবরাহীম যায়েদ, (তাবি), ২/২৩১ পৃঃ।

৭৪. আবু নু'আইম ইস্পাহানী, আখবা-রু আছবাহান, (তাবি) হা/৪০৪৮৮, ২/১১৫ পৃঃ।

৭৫. আল-আজলূনী, কাশফুল খাফা (তাবি) হা/২৩০০, ২/২০৮ পৃঃ।

৭৬. সিলসিলা যঈফাহ হা/৭৪৪, ২/১৬৭ পৃঃ।

৭৭. আল-মাছনূ' ফী মা'আরেফাতিল হাদীছিল মাওযূ'; পৃঃ ৭৩; দ্র : সিলসিলা যঈফাহ ১/১৬৯ পৃঃ।

৭৮. আত্ব-তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর, তাহক্বীক্ব : হামদী ইবনু আব্দুল মাজীদ আস-সালাফী, (মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকম, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৪০৪ হিঃ/১৯৮৩ খ্রিঃ) হা/১৭৫৮৪, ২২/৫০ পৃঃ।

৭৯. সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৯, ১/১৬৭ পৃঃ।

৮০. সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৯, ১/১৬৭ পৃঃ; ইমাম নববী, আল-মাজমু' শারহুল মুহাযযাব, (তাবি), ১/৪৬৫ পৃঃ, 'মিসওয়াক' অনুচ্ছেদ।

৮১. আবু মানছূর আদ-দায়লামী, মুসনাদুল ফিরদাউস ১/১৩৩ পৃঃ; ইবনু হাজার আসক্বালানী, তালখীছুল হাবীর ফী তাখরীজি আহাদীছিল রা-ফিঈল কাবীর (দারুল কুতুবিল ইলমিইয়্যাহ, ১৪১৯ হিঃ/১৯৮৯ খ্রিঃ) ১/৪৩৩ পৃঃ।

৮২. সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৯, ১/১৬৭ পৃঃ।

'এটি রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ হিসাবে পরিচিত নয়। বরং এটি পূর্ববর্তী কোন নেককার ব্যক্তির বক্তব্য মাত্র'।[৮৩]

অন্যদিকে এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীছগুলো সম্পর্কে ইমাম নববী (রহঃ) দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন, لَمْ يَصِحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِيْهِ شَيْءٌ قَالَ وَلَيْسَ هُوَ بِسُنَّةٍ بَلْ بِدْعَةٌ 'এ বিষয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর দিকে নিসবত করা হয় এমন কোন বিশুদ্ধ বর্ণনা নেই'। তিনি আরো বলেন, 'এটা তো সুন্নাত নয় বরং বিদ'আত'।[৮৪] ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'ঘাড় মাসাহ সম্পর্কিত বর্ণিত হাদীছগুলো সবই যঈফ'।[৮৫]

আব্দুর রহমান আস-সাহীম (রহঃ) বলেন, لا يُشرع مسح الرقبة عند الوضوء بل هو من المُحدَثات وكل مُحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 'ওযূতে ঘাড় মাসাহ করা কোন শরী'আত নয়, বরং এটি একটি নতুন আবিষ্কার। আর (শরী'আতের নামে) প্রত্যেক নতুন আবিষ্কারই বিদ'আত। আর প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা'।[৮৬] উপরিউক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হল যে, ঘাড় মাসাহ করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে কোন আমল কিংবা কোন নির্দেশনা নেই। সুতরাং ঘাড় মাসাহ করার ভুল অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে।

(৪) ওযূর পর সূরা ক্বদ্‌র পড়া :

ওযূর পর সূরা ক্বদ্‌র পড়া সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থে কিছু বর্ণনা পরিলক্ষিত হয়। আবার এটা প্রমাণের জন্য হাদীছও উল্লেখ করা হয়। অথচ ওযূর পর সূরা ক্বদ্‌র পড়া সুস্পষ্টরূপে বিদ'আত। কেননা এ সম্পর্কিত বর্ণিত হাদীছ মিথ্যা ও বানোয়াট। যা রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণিত নয়। কথিত হাদীছটি নিম্নরূপ :

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ فِيْ إِثْرِ وُضُوْئِهِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ مَرَّةً وَاحِدَةً كَانَ مِنَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَمَنْ قَرَأَهَا مَرَّتَيْنِ كَانَ فِيْ دِيْوَانِ الشُّهَدَاءِ وَمَنْ قَرَأَهَا ثَلَاثًا يَحْشُرُهُ اللهُ مَحْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ.

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি তার ওযূ শেষ করে সূরা ক্বদ্‌র একবার পড়বে, সে সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি দুই বার পাঠ করবে, সে শহীদগণের তালিকাভুক্ত হবে। যে ব্যক্তি তিন বার পাঠ করবে, আল্লাহ তাকে নবীগণের সাথে হাশর-নাশর করাবেন।[৮৭]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি জাল। এর কোন সনদই নেই।[৮৮] আলাউদ্দীন আলী ইবনু হিসামুদ্দীন আল-মুত্তাক্বী (রহঃ) বলেন, 'ওযূর পর সূরা ক্বদ্‌র পাঠ করার ছহীহ হাদীছ সম্মত নয়'।[৮৯] ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ مِنْهَا شَيْءٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مِنْ قَوْلِهِ وَلَا مِنْ فِعْلِهِ 'এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কোন বাণী কিংবা তাঁর কোন আমল প্রমাণিত নেই'।[৯০] অতএব ওযূর পর মিথ্যা ফযীলতের ধোঁকায় পড়ে সূরা ক্বদ্‌র পড়া পরিত্যাগ করতে হবে। ওযূর পরে রাসূল (ছাঃ) যে সুন্দর দো'আ শিক্ষা দিয়েছেন তা পাঠ করতে হবে। যেমন,

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِى مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِى مِنَ الْمُتَطَهِّرِين.

উচ্চারণ : আশহাদু আন লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকা লাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আব্‌দুহূ ওয়া রাসূলুহূ। আল্লা-হুম্মাজ্‌'আলনী মিনাত্ তাউওয়াবীনা ওয়াজ্‌'আলনী মিনাল মুতাত্বাহ্‌হিরীন।

অর্থ : 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি এই মর্মে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন প্রকৃত উপাস্য নেই। তিনি একক ও তাঁর কোন অংশীদার নেই। অতঃপর এই মর্মে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কর'। তাহ'লে তাঁর জন্য জান্নাতের আটটি দরজার সবকটি খুলে দেওয়া হবে। যেটা দিয়ে ইচ্ছা সে প্রবেশ করবে'।[৯১]

(৬) ওযূর প্রত্যেক অঙ্গ ধৌত করার সময় নির্ধারিত দো'আ পাঠ করা :

ওযূর প্রত্যেক অঙ্গ ধৌত করার সময় পৃথক পৃথক দো'আ পাঠ করার কথা বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু বর্ণিত দো'আর পক্ষে কোন প্রমাণ বা দলীল উপস্থাপন করা হয়নি। তাছাড়া এটি রাসূল (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে' তাবেঈনসহ সালাফে সালেহীনের পক্ষ থেকেও প্রমাণিত নয়। বরং তা বিদ'আত। তবে অন্য শব্দে একটি জাল হাদীছ পাওয়া যায়।[৯২] যেমন-'আলী ইবনু আবু তালেব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে ওযূর সময় কতিপয় পঠিতব্য দো'আ শিক্ষা দিয়েছিলেন, যা আমি কখনো ভুলে যায়নি। অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট যখন (ওযূর জন্য) পানি আনা হ'ল, তখন তিনি দু'হাতের কব্জি পর্যন্ত ধৌত করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, বিসমিল্লা-হিল 'আযীম ওয়াল হামদুল্লিাহি আলাল ইসলাম, আল্লা-হুম্মাজ্'আলনী মিনাত তাউওয়াবীনা ওয়াজ'আলনী মিনাল মুতাত্বাহ্‌হিরীন, ওয়াজ'আলনী মিনাল্লাযীনা ইযা 'আত্বায়তাহুম শাকারূ ওয়া ইযা আবতালায়তাহুম ছাবারূ। যখন মুখমণ্ডল ধৌত করলেন, তখন বললেন, আল্লা-হুম্মা হাচ্ছিন ফারজী। এটা তিনি তিনবার বললেন। যখন কুলি করলেন তখন বললেন, আল্লা-হুম্মা আঈন্নী 'আলা তিলাওয়াতি কিতাবাকা ওয়া যিকরিকা। অতঃপর নাক ঝেড়ে বললেন, আল্লা-হুম্মা আরহানী রা-য়েহাতাল জান্নাহ। যখন মুখমণ্ডল ধৌত করলেন তখন বললেন, আল্লা-হুম্মা বাইয়িয ওয়াজহী ইয়াওমা তাবইয়ায্‌যু ওয়ূহুন ওয়া তাসওয়াদ্দু ওয়ূহুন। ডান হাত ধৌত করে বলেন, আল্লা-হুম্মা আতিনী কিতাবী বিইয়ামিনী ওয়া হা-সিবনী হিসাবাই ইয়াসীরা। অতঃপর যখন বাম

---

৮৩. নায়লুল আওত্বার ১/২০৬ পৃঃ; হা/১৯৮-এর আলোচনা দ্রঃ; তালখীছুল হাবীর ১/২৮৭; হা/৯৭-এর আলোচনা দ্রঃ।

৮৪. নায়লুল আওত্বার (তাবি) ১/২০২ পৃঃ; তালখীছুল হাবীর ১/২৮৭ পৃঃ; হা/৯৭-এর আলোচনা দ্রঃ।

৮৫. নায়লুল আওত্বার ১/২০২ পৃঃ।

৮৬. আব্দুর রহমান আস-সাহীম, ইত্তিহাফুল কেরাম বিশারহি উমদাতুল আহকাম ১/৩৯ পৃঃ।

৮৭. কানযুল উম্মাল (আল-মুওয়াস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ৫ম সংস্করণ, ১৪০১ হিঃ/১৯৮১ খ্রিঃ) হা/২৬০৯০, ৯/২৯৯ পৃঃ; জালালুদ্দীন সুয়ূতী, জা-মিউল আহাদীছ, হা/২৩৪৫০; দায়লামী, মুসনাদুল ফেরদাউস-এর বরাতে সুয়ূতী আল-হাবী লিল ফাতাওয়া ২/১১ পৃঃ।

৮৮. সিলসিলা যঈফাহ হা/১৪৪৯ ও ১৫২৭।

৮৯. কানযুল উম্মাল হা/২৬০৮৯, ৯/২৯৯ পৃঃ।

৯০. ইবনু আবেদীন, রদ্দুল মুহতার ১/৩৫৬ পৃঃ 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'ওযূর সুন্নাত সমূহ' অনুচ্ছেদ।

৯১. তিরমিযী ১/৭৭-৭৮, হা/৫৫; ছহীহ মুসলিম হা/৫৭৬,৫৭৭; আবুদাউদ ১/২২-২৩, হা/১৬৯; ইবনু মাজাহ ১/৩৬, হা/৪৬৯-৪৭০; মিশকাত হা/২৮৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৬৯, ২/৪১-৪২।

৯২. তাযকিরাতুল মাওযূ'আত পৃঃ ৩২; আল-ফাওয়াইদুল মাওযূ'আত পৃঃ ১৩, 'পবিত্রতা' অধ্যায়, হা/৩৩।

হাত ধৌত করলেন তখন বললেন, আল্লা-হুম্মা লা তা'তিনী বললেন, আল্লা-হুম্মাজ'আলহু শাইয়ান মাশকূরান ওয়া যানাবান মাগফূরান ওয়া তিজা-রাতান লান তাবূরা। অতঃপর তিনি তাঁর মাথা আসমানের দিকে উঠালেন এবং বললেন, আল-হামদুলিল্লা-হিল্লাযী রাফ'আহা বিগায়রি 'আমাদিন। অতঃপর নবী করীম (ছাঃ) বললেন, এমতাবস্থায় ফেরেশতারা তার মাথার উপরে অবস্থান করে যা সে বলে তারা তার খাতায় লিখে নেন। অতঃপর তারা তা বন্ধ করে আরশের নিচে রেখে দেন। যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।[৯৩]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি জাল। হাদীছটি আবু ইসহাক্ব আস-সাবিঈ আলী থেকে মুনক্বাতে' সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইবনুল মুলাক্কিন (রহঃ) বলেন, হাদীছটি মিথ্যা ও বানোয়াট। উক্ত হাদীছের বর্ণনায় আবু মুক্বাতিল সুলায়মান ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ফযল নামে একজন দুর্বল রাবী রয়েছে।[৯৪] ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, وَأَحَادِيثُ الذِّكْرِ عَلَى أَعْضَاءِ الْوُضُوْءِ كُلُّهَا بَاطِلٌ لَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ يَصِحُّ 'ওযূর প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্য পৃথক পৃথক নির্ধারিত দো'আ পাঠের হাদীছগুলো সবই ভিত্তিহীন। আর এ হাদীছগুলোর মধ্যে কোনটিই বিশুদ্ধ নয়।[৯৫]

সুধী পাঠক! ইসলামী শরী'আত রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে পূর্ণাঙ্গতা পেয়েছে। তাঁর পরে শরী'আতে কোন কিছু সংযোজন-বিয়োজন করা জঘন্যতম অপরাধ। অধিক ফযীলতের আশায় তৈরী করা কোন বিধান পালন করা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে অপমান করার নামান্তর। আর রাসূল (ছাঃ)-এর অপমান করা আল্লাহকে অপমান করার শামিল।[৯৬] সুতরাং ওযূর পরে মানুষের এই বানোয়াট ও বিদ'আতী দো'আ পাঠ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। হে আল্লাহ! আমাদেরকে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত মোতাবেক জীবন-যাপন করার তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!

(৭) কুলুফ নিয়ে হাঁটাহাঁটি করা :

পবিত্রতা অর্জনে সন্দেহ থাকার অজুহাতে কুলুফ নিয়ে পরিধেয় কাপড় উঁচু করে চল্লিশ কদম হাঁটাহাঁটি, বিভিন্ন শারীরিক কসরত, কাশি দেওয়া, নাচানাচি করা, দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকা, টয়লেটে কুলুফের স্তূপ তৈরী করা সবই বর্তমান যুগের নিকৃষ্ট জাহেলিয়াত। ইসলামে এরকম অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ও বেলেল্লাপনার কোন স্থান নেই। কতিপয় ফযীলতপ্রেমী মুসলিম ভাই এমনটি করে থাকেন। বরং এটি করা সুস্পষ্ট বিদ'আত। সুতরাং ইসলামের বিশ্বজনীন মর্যাদাকে ক্ষুণ্নকারী এই বদঅভ্যাস ও নোংরামী অবশ্যই পরিত্যাজ্য। অন্যদিকে পেশাবের ছিটা কাপড়ে লেগে থাকার আশংকা দূরীভূত করার জন্য ইসলাম সুন্দর বিধান দিয়েছে। আর তা হ'ল, ওযূ সম্পাদনের পর হাতে পানি নিয়ে লজ্জাস্থানের দিকে ছিটিয়ে দেওয়া। যেমন-

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَالَ يَتَوَضَّأُ وَيَنْتَضِحُ.

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন পেশাব করতেন তখন ওযূ করতেন এবং (লজ্জাস্থান বরাবর) পানি ছিটিয়ে দিতেন।[৯৭] অতএব প্রচলিত বদ অভ্যাস অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে। মুসলিম জনসাধারণের সকলকে এ বাপারে জোরালো ভূমিকা পালন করতে হবে।

৯৩. জামে'উল আহাদীছ হা/৩৩৬৭২; কানযুল উম্মাল হা/২৬৯৯১।

৯৪. কানযুল উম্মাল ৯/৪৬৭পৃঃ, হা/২৬৯৯১-এর আলোচনা দ্রঃ; জামে'উল আহাদীছ ৩১/২১; ইবনুল মুলাক্কিন, আল-বাদরুল মুনীর, তাহক্বীক্ব : মুছত্বফা আবুল গায়ত্ব এবং আব্দুল্লাহ ইবনু সুলায়মান ও ইয়াসির ইবনু কামাল (রিয়ায : দারুল হিজরাহ, ১ম সংস্করণ ১৪২৫ হিঃ/২০০৪ খ্রিঃ) ২/২৭৩ পৃঃ।

৯৫. ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-মানারুল মুনীফ, তাহক্বীক্ব : আবু গাদ্দাহ (মাকতাবাতুল মাত্ববূ'আতিল ইসলামিইয়্যা : আলেপ্পো, ১৪০৩ হিঃ) ১২০ পৃঃ, অনুচ্ছেদ-৩৯।

৯৬. ছহীহুল বুখারী হা/৭১৩৭; ছহীহ মুসলিম হা/৪৮৫২; মিশকাত হা/৩৬৬১।

৯৭. আবুদাঊদ ১/২২ পৃঃ, হা/১৬৬; নাসাঈ ১/১৭ পৃঃ, হা/১৩৪-১৩৫; ইবনু মাজাহ ১/৩৬ পৃঃ, হা/৪৬১,৬২,৬৪; মিশকাত হা/৩৬৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৩৮, ২/৬৮ পৃঃ।

উপসংহার :

ইসলাম একটি সার্বজনীন ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাধ্যমে ইসলাম পূর্ণতা পেয়েছে। আল্লাহ্র ভাষ্য অনুযায়ী রাসূলের নিঃশর্ত অনুসরণ করা আল্লাহ্র অনুসরণ করার শামিল *(নিসা ৪/৮০)*। আর তার বিরুদ্ধাচরণ করা আল্লাহ্র সাথে বিরুদ্ধাচরণের নামান্তর। সুতরাং পূর্ণাঙ্গ একটি ধর্মে মনুষ্য মস্তিষ্ক প্রসূত বিধানাবলী প্রবেশ করে ইসলামের বিশ্বজনীন মর্যাদাকে চরমভাবে বাধাগ্রস্থ করছে। এমনকি মুসলমানের বহু কষ্টে কৃত আমলসমূহ কুরে কুরে নষ্ট করে দিচ্ছে। অথচ বিদ'আত থেকে আমরা বিরত থাকতে পারছি না। আর এ কথা সত্য যে, ইবাদতের মধ্যে রাসূলের পূর্ণ ইত্তেবা না থাকলে তা আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। তাছাড়া ইসলামে নতুন কোন বিধানের আবিষ্কারক ও প্রতিপালনকারীদের ক্বিয়ামতের দিন রাসূল (ছাঃ) হাউযে কাওছারের পানি পান করাবেন না এবং শাফা'আতও করবেন না। সুতরাং হে বিদ'আতী মুসলিম ভাই ও বোন! সাবধান হোন। বিদ'আত পরিহার করুন। আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে ফিরে আসুন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পতাকাতলে। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন। আমীন!!

কুরআন থেকে উপদেশ নিন

আপনি কি দুঃখভারাক্রান্ত? ⇨ সূরা বাকারাহ ২/২৫

আপনি কি পাপী? ⇨ যুমার ৩৯/৫৩

আপনি কি প্রশান্তির খোঁজে আছেন? ⇨ মায়েদা ৫/১৬

আপনি কি বন্ধুর খোজে আছেন? ⇨ বাকারা ২/২৫৭

আপনি কি লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার? ⇨ আহযাব ৩৩/৩৫

আপনি কি জাতিগত বৈষম্যের শিকার? ⇨ হুজরাত ৪৯/১৩

আপনি কি মুহাব্বত-ভালবাসার সন্ধানে আছেন? ⇨রূম ৩০/২১

আপনি কি হতাশাগ্রস্ত? ⇨ ইউসুফ ১২/৫৭

আপনি কি একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছেন? ⇨ক্বাফ ৫০/১৬

আপনার কি মনে হচ্ছে আপনি মানুষের কাছে প্রাপ্য প্রশংসা পাচ্ছেন না? ⇨ দাহর ৭৬/২২

আপনার কি মনে হচ্ছে যে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত? ⇨ইউসুফ ১২/৮৭

আপনি কি নিজেকে বঞ্চিত মনে করছেন? ⇨ ইবরাহীম ১৪/৩৪

আপনি কি কষ্টে কষ্টে জর্জরিত বোধ করছেন? ⇨ ইনশিরাহ ৯৪/৫, যোহা ৯৩/৫

মানুষ কি প্রতিনিয়ত **আপনার** বিরুদ্ধাচারণ করে? ⇨ ফুরকান ২৫/৬৩

আপনি কি ভয়-ভীতি থেকে মুক্তি পেতে চান? ⇨ বাকারা ২/৬২

আপনি কি আল্লাহর ক্ষমার প্রত্যাশী? ⇨ আলে ইমরান ৩/১৩৫, হিজর ১৫/৪৯

আপনি কি আপনার উপর যুলুমের প্রতিকার খুঁজছেন? ⇨ নাহল ১৬/১২৬, হামীম সিজদাহ ৪১/৩৪-৩৫

আপনি জীবনে সফল হতে চান? ⇨ নূর ২৪/৫২/আলে ইমরান ৩/১৮৫

আপনি কি কোন ব্যক্তিকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছেন না? ⇨ নূর ২৪/২২

দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন

ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

অবক্ষয় যুগে আহলেহাদীছ আন্দোলনের কেন্দ্রসমূহ

এই সময় পাঁচজন ছূফী মুহাদ্দিছের নেতৃত্বে ভারতবর্ষে ইলমে হাদীছ ও আহলেহাদীছ আন্দোলনের পাঁচটি প্রধান কেন্দ্র গড়ে ওঠে।[৯৮] যথা (১) বাহাউদ্দীন যাকারিয়া (৫৭৮-৬৬৬ হিঃ/১১৮৩-১২৬৮ খৃঃ) মুলতানে। (২) নিযামুদ্দীন আউলিয়া (৬৩৪-৭২৫ হিঃ/১২৩৬-১৩২৫ খৃঃ) দিল্লীতে। (৩) শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (মৃঃ ৭০০ হিঃ/১৩০০ খৃঃ) বাংলাদেশের সোনারগাঁয়ে। (৪) শারফুদ্দীন আহমাদ বিন ইয়াহইয়া মুনীরী (৬৬১-৭৮২ হিঃ/১২৬৫-১৩৮০ খৃঃ) বিহারে। (৫) আমীর কবীর আলী বিন শিহাব হামাদানী (৭১৪-৭৮৬ হিঃ/১৩১৪-৮৪ খৃঃ) কাশ্মীরে।

প্রতিটি কেন্দ্রে সৃষ্টি হয় একদল যোগ্য মুহাদ্দিছ শিষ্যমণ্ডলী, যারা সর্বত্র আহলেহাদীছ আন্দোলনের মর্মবাণী প্রচার করতে থাকেন এবং বিভিন্ন প্রকারের শিরক ও বিদ'আতী রসম-রেওয়াজের বেড়াজালে আবদ্ধ মুসলিম সমাজকে নিরপেক্ষভাবে হাদীছ অনুযায়ী জীবনগঠনে উদ্বুদ্ধ করেন।

১ম. মুলতান কেন্দ্র :

ছাহাবী হিবার বিন আস্ওয়াদ (রাঃ)-এর বংশধর শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়ার (৫৭৮-৬৬৬ হিঃ/১১৮৩-১২৬৮ খৃঃ) নেতৃত্বে ইল্মে হাদীছের এই কেন্দ্র গড়ে ওঠে। তিনি এখানেই জন্ম ও মৃত্যুবরণ করেন এবং বুখারা, খোরাসান ও মদীনায় ইল্ম হাছিল করেন।[৯৯] তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ও পৌত্রগণ এই কেন্দ্র চালু রাখেন। উছ-এর অধিবাসী শায়খ জামালুদ্দীন মুহাদ্দিছ (মৃঃ হিজরী ৮ম শতকের প্রথমার্ধে) ও মাখদূম জাহানিয়াঁ সাইয়িদ জালালুদ্দীন বুখারী (৭০৭-৭৮৫ হিঃ/১৩০৭-৮৩ খৃঃ) এই কেন্দ্রের মশহুর আহলেহাদীছ ছাত্র ছিলেন। 'মাশারেকুল আন্ওয়ার' ও 'মাছাবীহুস সুন্নাহ' থেকে তাঁরা নিয়মিত দরস দিতেন। এই কেন্দ্র হ'তে বহু মুহাদ্দিছ ছাত্র সৃষ্টি হয়। যাঁদের জীবনব্যাপী হাদীছের চর্চা ও নিরলস দাওয়াত ও তাবলীগের ফলে স্রোতে ভেসে যাওয়া মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে হাদীছ অনুযায়ী জীবনগঠনের তাকীদ সৃষ্টি হয় এবং আহলেহাদীছ আন্দোলনে জীবন সঞ্চারিত হয়।

২য়. দিল্লী কেন্দ্র :

'নিযামুদ্দীন আউলিয়া' নামে প্রসিদ্ধ ছূফী মুহাদ্দিছ শায়খ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বুখারী বাদায়ূনীর (৬৩৪-৭২৫ হিঃ/১২৩৬-১৩২৫ খৃঃ) নেতৃত্বে এই কেন্দ্র গড়ে ওঠে। অনন্য প্রতিভাধর এই সাধক মাত্র বিশ বৎসর বয়সেই আরবী সাহিত্য ও ফিক্হ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন ও যুগের নিয়মানুযায়ী 'ক্বাযী' হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু উস্তাদ কামালুদ্দীন যাহেদ-এর নিকটে 'মাশারেকুল আন্ওয়ার' হেফয করার ফলে তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে যায়। তিনি প্রচলিত 'তাক্বলীদী' নীতি পরিত্যাগ করে 'মুহাদ্দিছগণের' নীতি গ্রহণ করেন। ইমামের পিছনে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ, গায়েবী জানাযা প্রভৃতির পক্ষে তিনি ফৎওয়া প্রদান করতেন।[১০০] তাঁর মুরীদান ও খলীফাগণের মধ্যে বহু আলিমের সন্ধান পাওয়া যায়, যাঁরা ইল্মে হাদীছে পারদর্শিতা লাভ করেন ও যাঁদের প্রচেষ্টার ফলে আহলেহাদীছ আন্দোলন বিস্মৃতির তলে হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পায়। যেমন- (১) অযোধ্যার শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইয়াহ্ইয়া (মৃঃ ৭৪৭ হিঃ/১৩৪৬ খৃঃ)। ইনিই প্রথম হিন্দুস্থানী মুহাদ্দিছ, যিনি মাশারেকুল আন্ওয়ারের ভাষ্য লেখেন।[১০১] (২) দিল্লীর ফখরুদ্দীন যাররাদ (মৃঃ ৭৪৮ হিঃ/১৩৪৬ খৃঃ)। হেদায়ার পাঠদানের সময় বিভিন্ন মাসআলায় তিনি সর্বদা হাদীছকে অগ্রাধিকার দিতেন। তিনি বলতেন, 'নির্দিষ্ট একটি মাযহাব মান্য করা বিদ'আত' (إختار المذهب المعين بدعة)।[১০২] গিয়াছুদ্দীন তুগলকের দরবারে আহূত বিতর্কসভায় তিনিও স্বীয় উস্তাদ নিযামুদ্দীন আউলিয়ার সাথে ছিলেন।[১০৩] (৩) ঐতিহাসিক যিয়াউদ্দীন বিন মুঈদুল মুলক বারনী (মৃঃ ৭৫৮/১৩৫৭-এর পরে) স্বীয় উস্তাদের শিক্ষার ফলে স্বীয় বিশ্ববিখ্যাত ইতিহাসগ্রন্থ 'তারীখে ফীরোযশাহী'র ভূমিকায় হাদীছ ও ইতিহাসের তুলনামূলক আলোচনায় এই ধারণা ব্যক্ত করেন যে, কুরআন ও হাদীছের চর্চার ফলে মানুষ উদারমনা ও মধ্যপন্থী হয়। দলীয় গোঁড়ামী ও সংকীর্ণতা দূর হয়।[১০৪] (৪) মুহিউদ্দীন বিন জালালুদ্দীন কাশানী (মৃঃ ৭১৯ হিঃ/১৩১৯ খৃঃ) (৫) নিযামুদ্দীন হাশেমী জাফরাবাদী (মৃঃ ৭৩৫ হিঃ/১৩৩৪)। ইনি 'যুবদাতুল মুহাদ্দেছীন' নামে খ্যাত ছিলেন। (৬) শায়খ নাছীরুদ্দীন 'চেরাগে দেহ্লী' (মৃঃ ৭৫৭ হিঃ/১৩৫৬ খৃঃ)। উস্তাদ নিযামুদ্দীনের মৃত্যুর পর ইনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।[১০৫] (৭) সাইয়িদ মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ গেসূদারায (৭২১-৮২৫/১৩২১-১৪২২ খৃঃ) বিখ্যাত অলি ও মুহাদ্দিছ ছিলেন। ইল্মে হাদীছ সহ বিভিন্ন ইসলামী বিষয়ে তিনি একশতের উপরে কিতাব লেখেন।[১০৬] (৮) শায়খ অজীহুদ্দীন দেহলভী (৯) কাযী শিহাবুদ্দীন দৌলতাবাদী (মৃঃ ৮৪৯/১৪৪৫ খৃঃ) প্রমুখ বিদ্বানমণ্ডলী।

৩য় কেন্দ্র. সোনারগাঁও (বাংলাদেশ) :

এই কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা মুহাদ্দিছ শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (মৃঃ ৭০০ হিঃ/১৩০০ খৃঃ) বুখারা হ'তে ইলমে হাদীছের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রথমে দিল্লী আসেন। অল্পদিনে তাঁর সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয় আলেমগণ সক্রিয় হয়ে ওঠেন ও অবশেষে মামলূক সুলতান গিয়াছুদ্দীন বলবনের (৬৬৪-৬৮৭ হিঃ/১২৬৬-১২৮৭ খৃঃ) নির্দেশে তাঁকে দিল্লী ছাড়তে বাধ্য করা হয়।[১০৭] তিনি বিহার হ'য়ে বাংলাদেশের সোনারগাঁয়ে ৬৬৭হিঃ/১২৬৯ খৃষ্টাব্দে উপনীত হন।[১০৮] আবু তাওয়ামাই সর্বপ্রথম হিন্দুস্থানের মাটিতে 'ছহীহায়েন' নিয়ে আসেন এবং সোনারগাঁয়ে তার দরস শুরু করেন। এদিক দিয়ে বাংলাদেশ সত্যিই গৌরবধন্য দেশ। আমৃত্যু তিনি এখানে ইল্মে হাদীছের দরস দেন্। অসংখ্য দেশী-বিদেশী ছাত্রের এখানে আগমন ঘটে। আধুনিক পরিভাষায় যা একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ নেয়। মৃত্যুর

---

৯৮. ডঃ মুহাম্মাদ ইসহাক চারটি কেন্দ্র বলেছেন। ইলমে হাদীছ, প্রাগুক্ত পৃঃ ৮০।
৯৯. প্রাগুক্ত পৃঃ ৭৬।
১০০. প্রাগুক্ত পৃঃ ৯৪-৯৫।
১০১. প্রাগুক্ত পৃঃ ৮২।
১০২. প্রাগুক্ত পৃঃ ৮৩।
১০৩. রঈস আহমাদ নাদবী ও সাথীগণ, 'জামা'আতে আহলেহাদীছ কি তাছনীফী খিদমাত' (বেনারস-ভারত : মাকতাবা সালাফিইয়াহ, ১ম প্রকাশ ১৪০০/১৯৮০), পৃঃ ৭।
১০৪. 'ইল্মে হাদীছ' পৃঃ ৮৪।
১০৫. প্রাগুক্ত পৃঃ ৮৪-৮৫।
১০৬. প্রাগুক্ত পৃঃ ৮৬।
১০৭. প্রাগুক্ত পৃঃ ৮৬-৮৭।
১০৮. ডঃ আতীকুর রহমান কাসেমী, 'আল্লামা শাওক নীমবী : হায়াত ও খিদমাত' (পাটনা-ভারত ১৯৮৭) পৃঃ ১৫।

Contents

পূর্বে তিনি ছহীহ বুখারীর একটি ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেন।[১০৯] সপ্তম শতাব্দী হিজরী শেষে মুহাদ্দিছ আবু তাওয়ামার মৃত্যুর পর তাঁর শিক্ষার আলোকবর্তিকা পরবর্তী আড়াইশত বৎসর যাবত বাংলার যমীনে নিভু নিভু ভাবে হ'লেও আহলেহাদীছ আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখে। দশম শতাব্দী হিজরীর প্রথম দিকে বার ভূঁইয়াদের সময়ে (৯০০-৯৪৫ হিঃ/১৪৯২-১৫৩৮ খৃঃ) তৎকালীন পূর্ব বাংলার রাজধানী হিসাবে সোনারগাঁও একটি সমৃদ্ধিশালী নগরী হওয়ার সাথে সাথে ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবেও খ্যাত ছিল। ঐ সময় মুহাদ্দিছগণের কদর ছিল।[১১০] এতদ্ব্যতীত বাংলার স্বাধীন হুসেন শাহী সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা আলাউদ্দীন হুসাইন শাহ বিন আশরাফ মাক্কী (৯০০-৯৪৫/১৪৯২-১৫১৮ খৃঃ) ইল্‌মে হাদীছের প্রসারে উদার পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। রাজধানী একডালাতে মুহাম্মাদ বিন ইয়াযদান বখশ ওরফে 'খাজেগী শিরওয়ানী'র ন্যায় মুহাদ্দিছগণের অবস্থান ও ছহীহ বুখারী শরীফের লিপির লিপিকরণ-এর স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। সুলতান মালদহের 'পাণ্ডুয়া'তে নূর কুতবে আলমের (৭৫০-৮৫০/১৩৪৯-১৪৪৬ খৃঃ) স্মরণে একটি এবং 'গোরাশহীদ' এলাকায় একটি মাদরাসা স্থাপন করেন। যেখানে প্রচলিত ফেক্বহী ও মা'কূলাতভিত্তিক সিলেবাসের বিপরীতে ইলমে হাদীছকে আবশ্যিক সিলেবাসে পরিণত করেন। এজন্য তাঁকে সমসাময়িক গুজরাটের মুযাফফরশাহী সুলতানদের সাথে তুলনা করা হয়ে থাকে।[১১১] মুহাদ্দিছ শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামার কোন বাংগালী ছাত্রের নাম জানা না গেলেও বাংলাদেশ অঞ্চল যে ইল্‌মে হাদীছের প্রভাবে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিল, একথা বলা চলে।

৪র্থ কেন্দ্র. মুণীর (বিহার) :

সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘ বাইশ বৎসরের স্বনামধন্য ছাত্র ও আল্লামা শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (মৃঃ ৭০০/১৩০০ খৃঃ)-এর জামাতা মুহাদ্দিছ শারফুদ্দীন আহমাদ বিন ইয়াহ্ইয়া মুণীরীকে (৬৬১-৭৮২/১২৬৩-১৩৮০ খৃঃ) কেন্দ্র করে ইল্‌মে হাদীছের এই কেন্দ্র গড়ে ওঠে। তিনি শ্বশুরের নিকট থেকে প্রাপ্ত 'ছহীহায়নের' হাফেয ছিলেন এবং সনদ ও রিজালশাস্ত্র সহ ইল্‌মে হাদীছের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী ছিলেন। 'ছহীহায়েন' ছাড়াও হাদীছের অন্যান্য গ্রন্থাবলী তিনি হেজায হ'তে আনয়ন করেন। তিনি 'আমল বিল হাদীছ'-এর উত্তম নমুনা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কিভাবে 'খরবূযাহ' খেতেন জানতে পারেননি বলে তিনি জীবনে 'খরবূযাহ' খাননি।[১১২] আযানের মধ্যে রাসূলের নাম শুনে চোখে আঙ্গুল রাখা সম্পর্কে তিনি বলতেন, 'এদেশে প্রচলিত এই নিয়মটি কোন হাদীছে পাওয়া যায় না'।[১১৩] মুণীর কেন্দ্রের শ্রেষ্ঠ ছাত্রবৃন্দের মধ্যে শায়খ মুযাফ্ফর বল্‌খী (মৃঃ ৭৮৬/১৩৮৪ খৃঃ), হুসাইন বিন মুইয বিহারী (মৃঃ ৮৪৪/১৪৪১ খৃঃ) 'নওশাহে তাওহীদ' (তাওহীদের বরপুত্র), আহমাদ বিন হাসান বিন মুযাফ্ফর 'লঙ্গরে দরিয়া' (মৃঃ ৮৯১-১৪৮৬ খৃঃ) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[১১৪] বিহারের মুণীর কেন্দ্র মূলতঃ সোনারগাঁ কেন্দ্রেরই প্রতিনিধিত্ব করে এবং বিহার ও আশপাশ এলাকায় আহলেহাদীছ আন্দোলনে গতি সঞ্চার করে। 'লঙ্গরে দরিয়ার' মৃত্যুর সাথে সাথে এই কেন্দ্রের তৎপরতা স্তিমিত হয়ে যায়।

(খ) ফলওয়ারী শরীফ

মুণীর-এর কেন্দ্র স্তিমিত হ'য়ে যাওয়ার পর বিহারের 'ফলওয়ারী শরীফ' ইল্‌মে হাদীছের কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠে। ইয়াহ্ইয়া মুণীরীর শিষ্য মিনহাজুদ্দীন রাস্তীর মাধ্যমে ৮ম শতাব্দী হিজরীতে এই কেন্দ্রের গোড়াপত্তন হ'লেও দশম শতাব্দী হিজরীতে 'শায়খুল মুহাদ্দেছীন' ইয়াসীন গুজরাটির আগমনের পরেই এই কেন্দ্রের সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।[১১৫] মূলতঃ তাঁর প্রচেষ্টায় এটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাদীছ শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়, যা এই অঞ্চলে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রসারে সহায়ক হয়।

৫ম কেন্দ্র. কাশ্মীর :

খোরাসানের বিখ্যাত অলি ও মুহাদ্দিছ আমীর কবীর সাইয়িদ আলী বিন শিহাব হামাদানী (৭১৪-৭৮৬/১৩১৪-৮৪ খৃঃ) ও তাঁর শিষ্যদের মাধ্যমে কাশ্মীর আহলেহাদীছ আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়। ৭৭৩/১৩৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি ৭০০ শত শিষ্য নিয়ে ইরান হ'তে কাশ্মীর আগমন করেন এবং খুবই সফলতার সাথে ইল্‌মে হাদীছের প্রসার ঘটান। কাশ্মীরের শাসক স্বয়ং তাঁর মুরীদ হন। তাঁর মৃত্যুর পরে সাইয়িদ জামালুদ্দীন, কাযী হুসাইন সিরাযী, হাজী মুহাম্মাদ কাশ্মীরী (মৃঃ ১০০৬/১৫৯৭ খৃঃ) প্রমুখ মুহাদ্দিছগণের মাধ্যমে বিশেষ করে শেষোক্ত 'হাজী কাশ্মীরী'র মাধ্যমে এতদঞ্চলে ইল্‌মে হাদীছের প্রসার ও আহলেহীছ আন্দোলনের প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়।[১১৬]

আন্দোলনের অন্যান্য কেন্দ্র :

ইতিপূর্বে বর্ণিত উত্তর ও পূর্ব ভারতের পাঁচটি প্রধান কেন্দ্র ছাড়াও ভারতবর্ষের আরও কয়েকটি স্থানে ইল্‌মে হাদীছের কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। সেসবের মাধ্যমে শিরক-বিদ'আতে আচ্ছন্ন মুসলিম সমাজ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার তথা আহলেহাদীছ আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়। যেমন- (১) মালব : সুলতান মাহমূদ খাল্‌জীর সময়ে (৮৪০-৮৭৪/১৪৩৬-৬৯ খৃঃ) মালবের রাজধানী 'মাণ্ডু' ইল্‌মে হাদীছের কেন্দ্রে পরিণত হয়। শায়খুল মুহাদ্দেছীন সা'আদুল্লাহ মাণ্ডুবী ও আলীমুদ্দীন মাণ্ডুবী এখানকার খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ ছিলেন।[১১৭] (২) সিন্ধু : ইরান হ'তে বিতাড়িত মাখদূম আবদুল আযীয আব্হারীর (মৃঃ ৯২৮/১৫২২ খৃঃ) মাধ্যমে দীর্ঘ সাড়ে চারশত বৎসরের বিরতি শেষে সিন্ধুতে পুনরায় ইল্‌মে হাদীছের পুনরুজ্জীবন ঘটে। তিনি মিশকাতের ভাষ্য লেখেন।[১১৮] (৩) ঝাঁসি ও কাল্‌পী : বাগদাদের মুহাদ্দিছ সাইয়িদ মুহাম্মাদ ইবরাহীম দশম শতাব্দী হিজরীর মধ্যভাগে এখানে এসে প্রথমে ঝাঁসি ও পরে কাল্‌পীতে ইল্‌মে হাদীছের কেন্দ্র গড়ে তোলেন। (৪) আগ্রা : দশম শতাব্দী হিজরীতে আগ্রায় ইল্‌মে হাদীছের তিনটি কেন্দ্র গড়ে ওঠে। যথা : (ক) মাদরাসা রফীউদ্দীন ছাফাবী (মৃঃ ৯৫৪-১৫৪৬) (খ) মাদরাসা হাজী ইবরাহীম মুহাদ্দিছ আকবরাবাদী (মৃঃ ১০১০/১৬০০ খৃঃ) (গ) মাদরাসা সাইয়িদ শাহ মীর (মৃঃ ১০০০/১৫৯১ খৃঃ)[১১৯] (৫) লাক্ষ্ণৌ : মদীনা হ'তে শায়খ যিয়াউদ্দীন মুহাদ্দিছ দশম শতাব্দী হিজরীতে এখানে আগমন করলে লাক্ষ্ণৌ ইল্‌মে

---

১০৯. প্রাগুক্ত পৃঃ ১৫।

১১০. ফরুক মাহমুদ, প্রবন্ধ : সোনার বাংলার অঙ্গনে (ঢাকাঃ দৈনিক ইনকিলাব ৯ই আষাঢ় ১৩৯৫, ২৪শে জুন ১৯৮৮, শুক্রবার) পৃঃ ৮-৯; ১৯৮০ সালে বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন জাতীয় দৈনিক 'ইত্তেফাক'-এর তৎকালীন সম্পাদক জনাব আখতার-উল-আলম বাগদাদ সফরের সময়ে সেখানকার লাইব্রেরীতে উক্ত পাণ্ডুলিপিটি দেখেন, ঐ।

১১১. বর্তমানে ঢাকার জাদুঘরে রক্ষিত নুছরত শাহের আমলে (৯২৪-৩৯/১৫১৯-৩৩ খৃঃ) সোনারগাঁয়ে ১৫২৩ খৃষ্টাব্দে নির্মিত একটি মসজিদের উৎকীর্ণ আরবী শিলালিপি হ'তে একথা অনুমান করা চলে। ঢাকা জাদুঘর, ২য় তলা ২০ নং গ্যালারী, সংগ্রহ নং ৬৬.২৬২।

১১২. Dr. Muhammad Ishaque, INDIA'S CONTRIBUTION, p 115-116; 'ইল্‌মে হাদীছ' পৃঃ ১৩৫-১৩৬।

১১৩. সুলায়মান নাদভী, মা'আরেফ (আযমগড়, উত্তর প্রদেশ-ভারত) ২৩ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা পৃঃ ২৯৫-৯৬; 'ইল্‌মে হাদীছ' পৃঃ ৮৯-৯০; আতীকুর রহমান, 'শাওক নীমবী' পৃঃ ২২।

---

১১৪. প্রাগুক্ত টীকা সমূহ।

১১৫. Dr. Muhammad Ishaque, INDIA'S CONTRIBUTION, p 66-71. 'ইল্‌মে হাদীছ' পৃঃ ৯০-৯২।

১১৬. প্রাগুক্ত পৃঃ ১১৪-১৫; ঐ উর্দু পৃঃ ১৩৫; 'শাওক নীমবী' পৃঃ ২৪।

১১৭. 'ইল্‌মে হাদীছ' পৃঃ ৯২-৯৩, ১৬১।

১১৮. প্রাগুক্ত পৃঃ ১৩১।

১১৯. প্রাগুক্ত পৃঃ ১৩২।

হাদীছের কেন্দ্রে পরিণত হয়। (৬) জৌনপুর : শারকী শাসনামলে (৭৯৭-৮৮৬/১৩৯৪-১৪৭৯ খৃঃ) মুহায্যাবুদ্দীন জৌনপুরী নামে এখানে একজন মুহাদ্দিছের সন্ধান পাওয়া যায়, যিনি মক্কার হাফেয আবদুর রহমান সাখাবীর (মৃঃ ৯০২/১৪৯৫ খৃঃ) ছাত্র ছিলেন। তাছাড়া এখানকার কিছু আলিমকে 'যুবদাতুল মুহাদ্দেছীন' খেতাব দেওয়াতে ধারণা হয় যে, ফিক্বহ ও মা'কূলাত শিক্ষার এই শহরে দক্ষিণ ভারত অথবা হেজায হ'তে সমৃদ্ধিময় শারকী শাসনামলে কিছু মুহাদ্দিছের আগমন ঘটেছিল।[১২০]

দু'জন আপোষহীন ব্যক্তিত্ব :

১. শায়খ মুনাওয়ার বিন আবদুল মজীদ লাহোরী (মৃঃ ১০১০/১৬০০ খৃঃ) অতুলনীয় প্রতিভার অধিকারী এই মুহাদ্দিছ প্রথমে সম্রাট আকবর (৯৬২-১০১২/১৫৫৬-১৬০২ খৃঃ) কর্তৃক ৯৮৫/১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে মালবের 'ছদর' নিযুক্ত হন। কিন্তু আপোষহীন তাওহীদী আকীদার কারণে তিনি আকবরের কোপ দৃষ্টিতে পড়েন। ৯৯৫/১৫৮৭ খৃষ্টাব্দ হ'তে গোয়ালিয়র দূর্গে পাঁচ বছর কারাবাস ছাড়াও তাঁর সকল সহায়-সম্পদ ও কিতাবপত্র বাযেয়াফ্ত করা হয়। কারাগারে থেকেও তিনি তাফসীর ও হাদীছের উপরে কয়েকখানা মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এইভাবে সরকারী নির্যাতন ভোগ করতে করতে অবশেষে তিনি দেহত্যাগ করেন।[১২১] আকবরের দ্বীনে এলাহীর বিরুদ্ধে সম্ভবতঃ তিনিই ছিলেন প্রথম সার্থক প্রতিবাদী কণ্ঠ।

২. শায়খ আহমাদ বিন আবদুল আহাদ সারহিন্দী ওরফে 'মুজাদ্দিদে আল্ফে ছানী' (৯৭১-১০৩৪/১৫৬৪-১৬২৪ খৃঃ)ঃ ওমর ফারূক (রাঃ)-এর বংশধর পূর্ব পাঞ্জাবের সারহিন্দে জন্মগ্রহণকারী এই আপোষহীন ব্যক্তিত্ব ছিহাহ সিত্তাহ ও তাফসীর শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জনের পর ১০০৮/১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লী আগমন করেন।[১২২] এই সময় রাজদরবারে ধর্মের নামে প্রচলিত বিভিন্ন শেরেকী রেওয়াজ এবং খানক্বাহগুলিতে মা'রেফাত শিক্ষার নামে তাওহীদবিরোধী শিরক ও বিদ'আতী রসম-রেওয়াজ দেখে তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠ সোচ্চার হয়ে ওঠে। স্বাভাবিকভাবেই তিনি দরবারী আলেম ও খানক্বাহী ছূফীদের কোপদৃষ্টিতে পড়েন। সম্রাট জাহাঙ্গীর (১০১৩-৩৫/১৬০৫-২৭ খৃঃ) তাঁকে গোয়ালিয়র দূর্গে আটক করেন। দুই তিন বৎসর পরে ভুল বুঝতে পেরে তিনি তাঁকে মুক্ত করে দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন ও স্বীয় দরবারে 'সিজদায়ে তাযীমী'সহ চালুকৃত **১১**টি শেরেকী প্রথার সবগুলি বাতিল করার ওয়াদা করেন।[১২৩] এই ঘটনার পর তিনি সর্বত্র 'মুজাদ্দিদে আল্ফে ছানী' বা দ্বিতীয় সহস্র হিজরী সনের ধর্মসংস্কারক' হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন।[১২৪]

মুজাদ্দিদের বড় কৃতিত্ব ছিল এই যে, ফিক্বহ ও মা'কূলাতের ইল্মে অভ্যস্ত আলেমসমাজ ও জনগণকে তিনি সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ্র দিকে ফিরে আসার অনুপ্রেরণা সৃষ্টিতে সক্ষম হন। দ্বিতীয়তঃ শরীয়ত ও তরীকতকে পৃথকভাবে চিত্রিত করে মুসলিম সমাজেকে যেভাবে দ্বিধাবিভক্ত করে ফেলা হয়েছিল, নিরলস দাওয়াত ও চিঠিপত্রের মাধ্যমে এবং নিজের জীবনের বাস্তব দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তা নিরসনে তিনি অনেকটা সক্ষম হয়েছিলেন।[১২৫] তৃতীয়তঃ প্রচলিত তাক্বলীদী রেওয়াজের বিরুদ্ধে কঠোর মত প্রকাশ করায় মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত দীর্ঘকালের এই প্রথায় একটা দারুণ ধ্বস নামে,[১২৬] যা পরবর্তী অলিউল্লাহ যুগের শুভ সূচনায় সহায়ক হয়। শায়খ আহমদের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র ও শিষ্যগণ তাঁর সংস্কার কার্যক্রম চালু রাখতে চেষ্টা করেন। ১. পুত্র শায়খ মুহাম্মাদ সাঈদ (১০০৩-৭০/১৫৯৪-১৬৫৯ খৃঃ) ২. পৌত্র ফররূখ শাহ বিন সাঈদ (১০৩৮-১১১২/১৬৩৪-১৭০০ খৃঃ)। ইনি সনদসহ ৭০,০০০ হাযার হাদীছের হাফেয ছিলেন।[১২৭] ৩. অন্যতম পুত্র মা'ছূম বিন শায়খ আহমাদ (১০০৯-১০৮০/১৫৯৯-১৬৬৮ খৃঃ)। ৪. পৌত্র সায়ফুদ্দীন বিন মাছূম (মৃঃ ১০৯৮/১৬৮৭ খৃঃ)। ইনি 'মুহিউস্ সুন্নাহ' (সুন্নাতের পুনর্জীবন দানকারী) নামে খ্যাতি লাভ করেন।[১২৮] ৫. খাজা আযম বিন সায়ফুদ্দীন (১০৬৬-১১১৪/১৬৫৫-১৭০৩ খৃঃ)। 'ফায়যুল বারী' নামে ইনি ছহীহ বুখারীর ভাষ্য লেখেন। ৬. শাহ আবু সাঈদ বিন ছফিউল ক্বদর (১১৯৬-১২৫০/১৭৮২-১৮৩৪) ইনি সায়ফুদ্দীন সারহিন্দীর প্রপৌত্র এবং শাহ আবদুল আযীয (১১৫৯-১২৩৯/১৭৪৬-১৮২৩) ও শাহ রফীউদ্দীন বিন অলিউল্লাহ দেহলভীর (১১৬২-১২৩৩/১৭৫০-১৮১৭) ছাত্র ও শহীদে মিল্লাত' শাহ ইসমাঈল (১১৯৩-১২৪৬/১৭৭৯-১৮৩১)-এর সহপাঠী ও সমসাময়িক ছিলেন। এইভাবে সারহিন্দের মুজাদ্দিদ পরিবারের সাথে দিল্লীর মুজাহিদ পরিবারের মণিকাঞ্চন যোগ ঘটে, যা পরবর্তীতে 'দাওয়াত ও জিহাদের' কর্মসূচীর মাধ্যমে উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনে আধুনিক যুগের শুভ সূচনা করে। এই সাথে আমরা দিল্লীর আরেকজন ব্যতিক্রমধর্মী মুহাদ্দিছের নাম উল্লেখ করতে পারি, যিনি ছহীহ আকীদা ও সুন্নাতের পুনর্জাগরণের জন্য দিনরাত পরিশ্রম করেছেন এবং সমসাময়িক আলেম সমাজের তাক্বলীদী আচরণের বিরুদ্ধে সদা সোচ্চার থাকতেন। যিনি ছিলেন মির্যা মাযহার জানাজানাঁ (মৃঃ ১১৯৫/১৭৮১ খৃঃ)। তাক্বলীদপন্থী আলেমদের একদেশদর্শী আচরণে বিস্ময় ও ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলতেন- 'কি তাজ্জবের ব্যাপার যে, মা'ছূম রাসূলের ছহীহ গায়র-মানসূখ হাদীছ মওজূদ থাকতে কাযী ও মুফতীদের ভুলের আশংকাযুক্ত ফেক্বহী ফৎওয়ার উপরে আলম করা হচ্ছে।[১২৯] অবক্ষয়ের যুগের আলোচনা শেষে আমরা এবার আহলেহাদীছ আন্দোলনের আধুনিক যুগে প্রবেশ করতে চেষ্টা পাব।

[বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ' শীর্ষক গ্রন্থ। পৃঃ ২৩৩-২৪০]

---

১২০. প্রাগুক্ত পৃঃ ১৩৩।
১২১. প্রাগুক্ত পৃঃ ১৩৪।
১২২. 'ইলমে হাদীছ' পৃঃ ১৬৩।
১২৩. ইবরাহীম মীর শিয়ালকোটি, 'তারীখে আহলেহাদীছ' (ওখলা, নয়াদিল্লীঃ মাকতাবা তাওহীদ, ২য় সংস্করণ ১৯৮৩) পৃঃ ৩৯৮-৯৯।
১২৪. প্রাগুক্ত পৃঃ ৪০০; মুহাম্মাদ হালীম, মুজাদ্দিদে আ'যম (লাহোরঃ আশরাফ প্রেস, ৪র্থ সংস্করণ ১৯৬৮) পৃঃ ৬৯; 'ইল্মে হাদীছ' পৃঃ ১৬৬।
১২৫. সর্বপ্রথম মাওলানা আবদুল হাকীম শিয়ালকোটি তাঁকে এই 'লকব' প্রদান করেন। পরে তা সর্বসাধারণ্যে চালু হয়ে যায়।-তারীখে আহলেহাদীছ পৃঃ ৩৯৯।
১২৬. 'ইলমে হাদীছ' পৃঃ ১৬৭।
১২৭. যেমন 'তাক্বলীদ'-এর বিরুদ্ধে তাঁর প্রদত্ত বক্তব্য দ্র. মাকতূবাতে ইমাম রব্বানী ১/৩১৩, ১/৪৮, ১/৪০,।
১২৮. 'জুহূদ মুখ্লিছাহ' পৃঃ ৫৭।
১২৯. 'ইল্মে হাদীছ' পৃঃ ১৬৯।
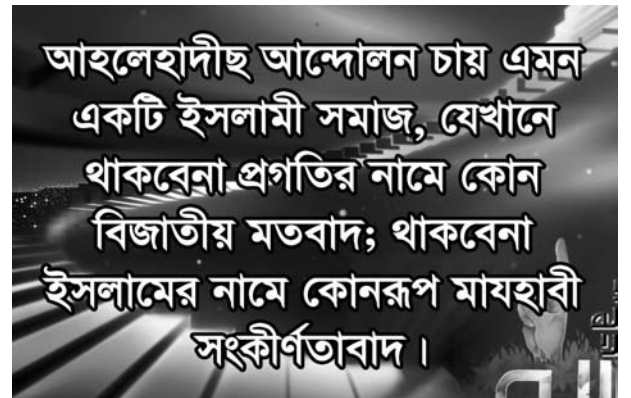
ইসলামের বিধান চিরকল্যাণকর

-অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন

ভূমিকা :

ইসলাম মানব জাতির জন্য সর্বোত্তম জীবন ব্যবস্থা। এর বিধানসমূহ কেবল তত্ত্বগত বুলি নয় বরং তা বিশ্ব মানবতার বাস্তবমুখী ও কল্যাণকামী এক চিরন্তন সংবিধান। ইসলামের বিধান সমূহ যেমন ব্যক্তির জন্য কল্যাণকর, তেমনি সামষ্টিক পর্যায়েও এ বিধানসমূহ অনন্য এক কল্যাণকর ব্যবস্থা। ইসলাম সর্বকালের সকল মানুষের জন্য সর্বোত্তম জীবন ব্যবস্থা। কারণ এর বিধান সবচেয়ে বাস্তবমুখী ও জনকল্যাণকর, যা বিশেষ কোন জাতি-গোষ্ঠীর জন্য নির্ধারিত নয়। তাই বলা যায়, ইসলামী বিধান কার্যকর হলে তার ফলাফল অবশ্যই ইতিবাচক হবে এবং অপরাধের হার আশাতীতভাবে হ্রাস পাবে। বিশ্বের যে কোন দেশে ইসলামের বিধান কার্যকর হলে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসবে এবং সমাজে বসবাসকারী সকল ধর্মের মানুষ মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে। কারণ আল্লাহ্‌র বিধান সত্য ও ন্যায়ে পরিপূর্ণ। মহান আল্লাহ বলেন, وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ‘তোমার রবের কথা সত্য ও ন্যায়ে পরিপূর্ণ। এ কথার পরিবর্তনকারী কেউ নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ’ *(আন‘আম ৬/১১৫)*। মানুষ আশরাফুল মাখলূকাত। কিন্তু সৃষ্টির সেরা জীব হলেও তার জ্ঞান সসীম ও সীমাবদ্ধ। আর এই সীমাবদ্ধ জ্ঞান দিয়ে মানুষ কস্মিনকালেও কোন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে না। পারে না সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, হালাল-হারাম প্রভৃতি বিষয়ে নির্ভুল রূপরেখা পেশ করতে। তাই সমাজ পরিচালনার জন্য মানুষ মনগড়া বিভিন্ন আইন তৈরী করে আবার নিজেই সেই আইন ভঙ্গ করে, সংশোধন আনে এবং পরিবর্তন করে। এখানেই মানুষের বড় দুর্বলতা। মানুষ যে কত অসহায় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অপরদিকে মানুষের রচিত বিধান বা দণ্ডবিধি কতটা যে বর্বর, নির্মম ও ধ্বংসাত্মক তা আজ বিশ্ববাসীর কাছে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। ফলশ্রুতিতে মানুষ আজ এ বিধানের বিরুদ্ধে কথা বলা শুরু করেছে। কারণ এ বিধানে কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বেশী পরিদৃষ্ট হয়। বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন দেশে সামাজিক অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার প্রধানতম কারণ হচ্ছে মানুষের রচিত বিধান বা দণ্ডবিধি। এ বিধান অপরাধ নির্মূল করে না। অপরাধী সংশোধনও হয় না বরং অপরাধীদের হিংস্র ও ক্ষিপ্র করে তোলে। এ বিধানে ব্যভিচারী, চোর ও মদ্যপায়ীদের প্রকৃত শাস্তি হয় না। হয়না হত্যাকারী, সন্ত্রাসী ও ধর্ষকের প্রকৃত শাস্তি। উপরন্তু এ বিধান চোরকে পাকা চোর, সন্ত্রাসীকে বড় সন্ত্রাসী হিসাবে গড়ে তোলে। তাই সঙ্গতকারণে মানুষ আজ ইসলামের দিকে ধাবিত হচ্ছে। কারণ ইসলামের বিধান চিরকল্যাণকর। নিম্নে ইসলামের বিধানের কয়েকটি দিক তুলে ধরা হল।

কিছাছের বিধান :

قصاص এর শাব্দিক অর্থ সমপরিমাণ বা অনুরূপ। অন্যের প্রতি যতটুকু যুলুম করা হয়েছে তার সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করা তার পক্ষে জায়েয। এর চাইতে বেশী কিছু করা জায়েয নয়। কিছাছের বিধান সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ‘হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে কিছাছ গ্রহণ করা ফরয করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে স্বাধীন ব্যক্তি, দাসের ক্ষেত্রে দাস এবং নারীর ক্ষেত্রে নারীর কিছাছ গ্রহণ করবে। অতঃপর তার ভাইয়ের তরফ থেকে যদি কাউকে কিছুটা মাফ করে দেয়া হয়, তাহ’লে যথাযথ বিধির অনুসরণ করবে এবং ভালভাবে তাকে প্রদান করতে হবে। এটা তোমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে সহজ এবং বিশেষ অনুগ্রহ। এরপরও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করে তার জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি’ *(বাক্বারাহ ২/১৭৮)*। কিছাছের বিধান মানুষের কল্যাণে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। এ বিধানের মধ্যে অসংখ্য মানুষের সুস্থ জীবন লুক্কায়িত রয়েছে। সমাজ বা রাষ্ট্রে অন্যায় ও নৃশংসভাবে মানুষ হত্যা হ্রাস করতে হলে এ বিধানের কোন বিকল্প নেই। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ‘হে বুদ্ধিমানগণ! কিছাছের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে। যাতে তোমরা সাবধান হতে পার’ *(বাক্বারাহ ২/১৭৯)*।

এ বিধান বাস্তবায়ন হলে সমাজে হত্যার পরিমাণ কমে যাবে। অন্যরা সতর্ক হবে। শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসবে। আর তা কার্যকর করার দায়িত্ব সরকারের। কোন সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী কিংবা কোন চরমপন্থী মহলের দায়িত্ব নয়। রাষ্ট্রীয়ভাবে কার্যকর হওয়া দেশ সমূহ এর সুফল ভোগ করছে। কিছাছের বিধান ইতিপূর্বে তাওরাতের অনুসারীদের উপর প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু ইহুদীরা এ বিধানকে নিজ স্বার্থে পরিবর্তন করেছিল। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

‘আমি এই গ্রন্থে তাদের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং যখম সমূহের বিনিময়ে সমান যখম। অতঃপর যে ক্ষমা করবে তার পাপ মোচন হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী ফায়ছালা করে না, মূলতঃ তারাই যালেম’ *(মায়েদা ৫/৪৫)*। তাই বলা যায় যে, কিছাছের বিধান একটি সার্বজনীন বিধান। যা রাষ্ট্রীয়ভাবে সকল দেশে বাস্তবায়ন করা অত্যন্ত যরূরী।

চোরের শাস্তির বিধান :

চুরি করা একটি নিকৃষ্ট পেশা। যা সমাজ ও সভ্যতা বিবর্জিত কাজ। এ ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট কর্মের সাথে যদি কেউ সম্পৃক্ত হয় তাহলে ইসলাম তার ব্যাপারে সুন্দর ফায়ছালা প্রদান করেছে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ‘পুরুষ চোর আর নারী চোর তাদের যে কেউ চুরি করলে তোমরা তাদের উভয়ের হাত কেটে দিবে। এটা তাদের কৃতকর্মের ফল। যা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত আদর্শদণ্ড। আর তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়’ *(মায়েদা ৫/৩৮)*। ধনী হোক আর গরীব হোক, উঁচু বংশ হোক আর নিচু বংশ হোক নারী-পুরুষ যে কেউ চুরি করলে অতঃপর তা যদি প্রকাশ পায় তাহলে অবশ্যই তার ডান হাত গিট থেকে কর্তন করতে হবে। নবুওয়াতের যুগে এক সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলা চুরি করলে শাস্তি বাস্তবায়নে টালবাহনা করলে রাসূল (ছাঃ) ধমকের স্বরে বলেন, আমার মেয়ে ফাতেমাও যদি চুরি করত আমি মুহাম্মাদ (ছাঃ) তবুও তার হাত কেটে দিতাম’ *(ছহীহ বুখারী হা/৩৪৭৫ ও ৪৩০৪; মুসলিম হা/৪৫০৫; মিশকাত হা/৩৬১০)*। কারণ এটি আল্লাহ্‌র বিধান। এখানে শিথিলতার কোন সুযোগ নেই। চোরের শাস্তির এই শরিয়তী বিধান

Contents

যদি সরকার বাস্তবায়ন করে তাহলে চোরেরা সাবধান হবে এবং চুরির পরিমাণ হ্রাস পাবে।

অন্যদিকে কেউ কেউ সামান্য কিছু জিনিস চুরি করাকে তেমন অপরাধ বলে মনে করেন না। অথচ এ প্রসঙ্গে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ. 'সেই চোরের উপর আল্লাহ্‌র লা'নত বা অভিশাপ দিয়েছেন যে একটি ডিম চুরি করার ফলে তার হাত কাটা হয়। এমনিভাবে এক গাছি রশি চুরি করার ফলে তার হাত কাটা যায়' *(ছহীহুল বুখারী হা/৬৭৮৩, 'দণ্ডবিধি' অধ্যায়-৯০, অনুচ্ছেদ-৮)*।

সন্ত্রাসের শাস্তির বিধান :

ইসলাম শান্তির ধর্ম। এ ধর্মে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কোন স্থান নেই। মানুষকে নিরাপত্তা দান করা একজন মুসলমানের প্রধান কাজ। যার যবান ও হাত অন্যের জন্য নিরাপদ কেবল সেই মুসলিম। একজন মুসলিম অন্যের নিরাপত্তার জন্য কাজ করে, প্রয়োজনে নিজের জীবন পর্যন্ত বিলিয়ে দেয়। আল্লাহ বলেন, مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا 'যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে অকর্ম সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে, সে যেন সমস্ত মানবমণ্ডলীকে হত্যা করল। আর যে কারো জীবন রক্ষা করল সে যেন সবার জীবন রক্ষা করল' *(মায়েদা ৫/৩২)*। অগত্যা কেউ যদি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে শরীয়তে তার কঠোর শাস্তির বিধান বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে সংগ্রাম করে এবং পৃথিবীতে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয় তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্তপদ সমূহ বিপরীত দিকে হতে কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। আর এটি হল তাদের জন্য পার্থিব লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি' *(মায়েদা ৫/৩৩)*।

ব্যভিচারের শাস্তির বিধান :

ইসলামে ব্যভিচারের শাস্তি সর্বাধিক কঠোর। এতদপ্রসঙ্গে ইসলামী আইনে এই অপরাধ প্রমাণের জন্য শর্তাবলীও অত্যন্ত কড়া আরোপ করা হয়েছে। যাতে সামান্য ত্রুটি থাকলে অথবা সন্দেহ দেখা দিলে ব্যভিচারের চরম শাস্তি হদ মাফ হয়ে অপরাধ অনুযায়ী শুধু দণ্ডমূলক শাস্তি অবশিষ্ট থেকে যায়। অন্যান্য ব্যাপারাদিতে দুই জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুই জন নারীর সাক্ষ্য অপরাধ প্রমাণের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ব্যভিচারের হদ জারী করার জন্য চার জন পুরুষ সাক্ষীর চাক্ষুস ও দ্ব্যর্থহীন সাক্ষ্য যরূরী। যেমন আল্লাহ বলেন, وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا 'আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচারিণী তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চার জন পুরুষকে সাক্ষী হিসাবে তলব কর। অতঃপর তারা যদি সাক্ষ্য প্রদান করে তবে সংশ্লিষ্টদেরকে গৃহে আবদ্ধ রাখ, যে পর্যন্ত মৃত্যু তাদেরকে তুলে না নেয় অথবা আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোন পথ নির্দেশ না করেন' *(নিসা ৪/১৫)*।

উল্লেখ্য যে, এই সাক্ষ্যে দ্বিতীয় সাবধানতা ও কঠোরতা এই যে, যদি সাক্ষ্যের যরূরী কোন শর্ত অনুপস্থিত থাকার কারণে সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হয়, তবে সাক্ষ্যদাতাদের নিস্তার নেই। ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপের অভিযোগে অভিযুক্ত করে তাদের উপর হদ্দে কাযার জারি করা হবে অর্থাৎ আশিটি বেত্রাঘাত করা হবে। তাই সামান্য সন্দেহ থাকলে কোন ব্যক্তি এই সাক্ষ্যদানে অগ্রসর হবে না। যদি সুস্পষ্ট ব্যভিচারের প্রমাণ থাকে এবং সাক্ষ্যপ্রমাণ দ্বারা দুই জন পুরুষ-নারীর অবৈধ অবস্থায় পরিলক্ষিত হওয়া প্রমাণিত হয়, তাহলে বিচারক আল্লাহ্‌র বিধান তথা ব্যভিচারের শাস্তির বিধান কার্যকর করবেন। কারণ এটা আল্লাহ্‌র নির্দেশ। আল্লাহ বলেন, الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 'ব্যভিচারিণী নারী ব্যভিচারী পুরুষ তাদের প্রত্যেককে একশ করে বেত্রাঘাত কর। আল্লাহ্‌র বিধান কার্যকরকরণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হয়ে থাক। মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যেক্ষ করে' *(নূর ২৪/২)*। একশ বেত্রাঘাতের উল্লেখিত শাস্তি শুধু অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য নির্দিষ্ট। কিন্তু বিবাহিতদের শাস্তি প্রস্তারাঘাতে হত্যা করা। ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করার সময় মুসলমানদের একটি দল উপস্থিত থাকা বাঞ্ছনীয়। ইসলামের সব শাস্তি বিশেষতঃ হুদূদ প্রকাশ্য স্থানে প্রয়োগ করার পদ্ধতি প্রচলিত আছে, যাতে দর্শকরা শিক্ষা লাভ করে। এ কারণেই ব্যভিচারের শাস্তি শুধু প্রকাশ্য স্থানে প্রয়োগ করে ইসলাম ক্ষান্ত হয়নি, বরং মুসলমানদের একটি দলকে তাতে উপস্থিত থাকার ও অংশগ্রহণ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে ব্যভিচারের শাস্তির বিধান জনগণের সামনে প্রকাশ্য ময়দানে কার্যকর হলে সমাজ থেকে যেনা-ব্যভিচার, অনাচার ও অবৈধ মেলামেশা সহজেই হ্রাস পাবে। মানুষ সাবধান হবে। ব্যক্তি ও সমাজ সুন্দর হবে। নারীদের পথচলা নিশ্চিন্ত হবে।

সুদ হারাম হওয়ার বিধান :

আল্লাহ সুদকে হারাম করেছেন এবং ব্যবসাকে হালাল করেছেন। সুদ একটি অত্যাচারী প্রথা। এর মাধ্যমে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। এ প্রথার কারণে সম্পদ কতিপয় মানুষের হাতে পুঞ্জীভূত হয়। শ্রেণী বৈষম্য ব্যাপক আকার ধারণ করে। পবিত্র কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা একমাত্র সুদখোরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা করেন। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ– فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর আর সুদের যা কিছু অবশিষ্ট আছে তা সব পরিত্যাগ কর যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। আর যদি তোমরা তা না কর তাহলে তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের পক্ষ হতে যুদ্ধের ঘোষণা শোন' *(বাক্বারাহ ২/২৭৮-২৭৯)*।

অত্যাচারী যালিম সুদখোর ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে রাসূল (ছাঃ) বদদো'আ করেছেন। জাবের (রাঃ) বলেন, لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ. 'রাসূল (ছাঃ) সুদ গ্রহীতা, সুদ দাতা, সুদের লেখক আর সুদের দুজন সাক্ষীকে অভিশাপ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, তারা সকলে সমান অপরাধী' *(মুসলিম হা/৪১৭৭; মিশকাত হা/২৮০৭)*। সুদের কঠিন ভয়াবহতা সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, اَلرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ اَلرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى اَلرِّبَا عِرْضُ اَلرَّجُلِ اَلْمُسْلِمِ 'সুদের ৭৩টি দরজা বা স্তর রয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে সহজ স্তরটি হ'ল আপন মায়ের সাথে ভ্যবিচার করার সমতুল্য। আর সবচেয়ে কঠিন স্তরটি হ'ল কোন মুসলিম ব্যক্তিকে অপমান-অপদস্থ করা' *(মুস্তাদরাক হাকিম হা/২২৫৯; বুলূগুল মারাম হা/৮৩১; ছহীহুল জামে' হা/৩৫৩৯। হাদীছ ছহীহ)*। অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً 'কেউ যদি জেনে শুনে এক টাকা সুদ খায় তাহলে ৩৬

বার যেনা করলে যে পাপ হবে তার চাইতে মারাত্মক পাপ হবে' *(মুসনাদে আহমাদ হা/২২০০৭; দারাকুত্বনী হা/২৮৮০; মিশকাত হা/২৮২৫; ছহীহুল জামে' হা/৩৩৭৫। সনদ ছহীহ)*। আর সুদের সবচেয়ে ছোট ক্ষতি হল মালের বরকত উঠে যায়। যদিও বাহ্যিকভাবে সুদের মাল যতই বেশী দেখা যাক না কেন। এ প্রসঙ্গে রাসূল (ছাঃ) বলেন, الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَى قُلٍّ 'বাহ্যিকভাবে সুদ পরিমাণে যতই বেশী দেখা যাক না কেন প্রকৃতপক্ষে তা কম হয়ে যায়' *(মুসনাদে আহমাদ হা/৩৭৫৪; হাকেম হা/২২৬২; মিশকাত হা/২৮২৭ ছহীহুল জামে' হা/৩৫৪২। হাদীছ ছহীহ)*। অতএব বলা যায় যে, সুদ ধনী-গরিব নির্বিশেষে সবার জন্য হারাম। সকলকেই তা পরিহার করতে হবে। তাহলেই বৈষম্যহীন শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।

পর্দার বিধান :

নেগেটিভ ও পজেটিভ একত্রিত হলে মহা বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। বিদ্যুতের এই বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার জন্য সেখানে আবরণের বা পর্দার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বিদ্যুতের নিয়মের বাইরে কোন নিয়ম পালন করলে যেমন ধ্বংস অনিবার্য, তেমনি নারী জাতিকে পর্দার বাইরে আনলে সমাজ সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য। সৃষ্টির শুরু থেকে নারীকে আকর্ষণীয় করে সৃষ্টি করা হয়েছে। নারীর প্রতি পুরুষের রয়েছে প্রবল আকর্ষণ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ 'নারীদের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট সুশোভিত করা হয়েছে' *(আলে-ইমরান ৩/১৪)*। নারীকে বলা হয়েছে ৩৬ গুণ ক্ষমতা সম্পন্ন ম্যাগনেট বা চম্বুক। আর নরকে দেয়া হয়েছে মাত্র ১ গুণ ক্ষমতা সম্পন্ন লৌহ। চম্বুক ও লৌহ পাশাপাশি অবস্থান করলে একে অপরকে আকর্ষণ করবে। এ আকর্ষণ দূর করতে বিধান দেয়া হয়েছে পর্দার। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا 'হে নবী (ছাঃ)! আপনি আপনার পত্নীদেরকে, আপনার কন্যাদেরকে ও মুমিন নারীদেরকে বলে দিন যে, তারা যেন ওড়না নিজেদের বুকের উপর টেনে দেয়, এটি অধিকতর উপযোগী পদ্ধতি; এতে তাদের পরিচয় পাওয়া যাবে। ফলে তারা নির্যাতিত হবে না। আর আল্লাহ তা'আলা অতিশয় ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু' *(আহযাব ৩৩/৫৯)*। হিজাব বা পর্দার বিধান এজন্য দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন সম্ভ্রান্ত মহিলা হিসাবে পরিচিত হয়। তাছাড়া পর্দার বিধান বাস্তবায়ন হলে নারী জাতি নির্যাতন, ইভটিজিং, বিদ্রুপ ও কটূক্তি থেকে মুক্তি পাবে। হিজাব বা পর্দার বিধান নারীকে অবমূল্যায়ন করে না বরং নারীকে যথার্থ মূল্যায়নের মাধ্যমে নারীর মর্যাদা উর্ধ্বে তুলে ধরে এবং তার সম্ভ্রমকে সুরক্ষা করে। কারণ এটি আল্লাহ্র বিধান, যা নারী জাতিকে সম্মানিত করেছে।

পক্ষান্তরে সেক্যুলার ও পপুলাররা দাবী করে যে, তারা নারীকে উচ্চ মর্যাদা দিয়েছে। অথচ বাস্তবতা হল, তারা নারীদের উচ্চ মর্যাদা থেকে নামিয়ে উপপত্নী, রক্ষিতা, ও মক্ষীরাণী বানিয়ে ছেড়েছে। তারা নারীদেরকে বিলাসী পুরুষদের ভোগের উপকরণ ও যৌন ব্যবসায়ীদের সস্তা পণ্যে পরিণত করেছে। যা শিল্প সংস্কৃতির রঙিন চশমা দিয়ে আড়াল করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে সেক্যুলার ও পপুলার এই সমাজে অসংখ্য নারী প্রতি সেকেণ্ডে ধর্ষণ হচ্ছে। ১৯৯০ সালের এফ. বি. আই. (F.B.I)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী কেবল আমেরিকাতে গড়ে দৈনিক ১০৫৬টি ধর্ষণজনিত অপরাধ সংঘটিত হয়। যা ইসলামী সমাজে কল্পনা করা যায় না। উল্লেখ্য যে, নারীর পাশাপাশি আল্লাহ তা'আলা পুরুষদেরকে পর্দার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ '(হে নবী) আপনি মুমিন পুরুষদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। এটা তাদের জন্য উত্তম। অবশ্যই তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবগত' *(নূর ২৪/৩০)*।
নারীর প্রতি পুরুষদের দৃষ্টি পড়লে অসঙ্গত ও খারাপ চিন্তা তার ভিতরে এসে যেতে পারে। সে জন্য আল্লাহ পুরুষকে দৃষ্টি অবনত রাখার কথা বলেছেন। তাই পর্দার বিধান নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য কল্যাণকর- এটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

নেশা জাতীয় দ্রব্য নিষিদ্ধতার বিধান :

নেশা শুধু ব্যক্তিকেই ধ্বংস করে না বরং এর ফলে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে কুলষিত করার অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে এই নেশা। এটি ইবলীসের অন্যতম অস্ত্র। মহান আল্লাহ যিনি অনন্ত জ্ঞানের মালিক তিনি আমাদেরকে এই লোভনীয় ফাঁদ থেকে সতর্ক করে দিয়েছেন। ইসলামের যাবতীয় বিধি-নিষেধ মানব কল্যাণের লক্ষ্যেই প্রদত্ত হয়েছে। যাতে করে মানুষের স্বাভাবিক গতি ঠিক থাকে। সমাজ সুন্দর হয়।

নেশা জাতীয় দ্রব্য বা মদ পান হ'ল মানুষের ফিতরাতের বিপরীতমুখী কাজ। যা মানুষকে পশুর স্তরে নামিয়ে দেয়। নেশা অসংখ্য মানুষের অকাল মৃত্যুর কারণ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। ঐশী রহমানের মত অসংখ্য ঘাতকের জন্ম এই নেশার কারণে হয়েছে। শুধু তাই নয় ব্যভিচার, ধর্ষণ, এইডস, ক্যান্সার সহ ইত্যাদি মারাত্মক রোগের প্রাদুর্ভাব নেশা জাতীয় দ্রব্য যারা পান করে তাদের মাঝে বেশী দেখা যায়। আমেরিকার ন্যাশনাল ক্রাইম ভিকটিমাইজেশন সার্ভে ব্যুরো অব জাস্টিস (U S. Department of Justice)-এর জরিপ অনুসারে কেবল ১৯৯৬ সালে গড়ে প্রতিদিন ২৭১৩ টি ধর্ষণের ঘটনা রেকর্ড করা হয়। পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, অধিকাংশ ধর্ষক এ ঘটনার সময় মাতাল ছিল। এমনকি মা, বোন, কন্যা সন্তানও এদের হাত থেকে রেহায় পায়নি। মারাত্মক প্রাণঘাতী রোগ এইডস বিস্তারের প্রধান কারণ হ'ল এই মদপান। পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মানুষ শুধু মদ পানের কারণে অকালে ঝরে যায়। সুতরাং বলা যায় নেশা জাতীয় দ্রব্য পান একটি মারাত্মক প্রাণঘাতি ব্যাধি ও জঘন্যতম অপরাধ। এ জন্য ইসলাম নেশা জাতীয় সকল প্রকার দ্রব্য হারাম ঘোষণা করেছে। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 'হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, পূজার বেদী এবং ভাগ্য নির্দেশক তীর এসবই নোংরা ও অপবিত্র। এগুলো শয়তানের কাজ ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং তোমরা তা থেকে বেঁচে থাক। যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার' *(মায়েদা ৫/৯০)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ 'সকল প্রকার নেশাজাত দ্রব্যই মদ। আর সব ধরনের মদই হারাম' *(ছহীহ মুসলিম হা/৫৩৩৭, 'পানাহার অধ্যায়-৩৭, অনুচ্ছেদ-৭)*। তিনি আরও বলেন, مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ 'যে বস্তুর বেশী পরিমাণ নেশা সৃষ্টি করে,তার কম পরিমাণও হারাম' *(আবুদাউদ হা/৩৬৮১; ইবনু মাজাহ হা/৩৩৯২; তিরমিযী হা/১৮৬৫; নাসাঈ হা/৫৬০৭; মিশকাত হা/৩৬৪৫; আহমাদ হা/৬৫৫৮)*। অতএব মদ, সিগারেট, তামাক, জর্দা, গুল ইত্যাদি নেশা জাতীয় দ্রব্য ব্যবহার করা ইসলামী শরী'আতে স্পষ্টরূপে হারাম।

পরিশেষে বলা যায় যে, ইসলামের বিধান চিরকল্যাণকর। মানুষের সার্বিক কল্যাণে আল্লাহ তা'আলা এই অভ্রান্ত ও অপরিবর্তনীয় বিধান দান করেছেন। অতএব অনুপম এই কালজয়ী অভ্রান্ত বিধান বাস্তবায়নে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রসহ প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীকে এগিয়ে আসতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন এবং আমাদের প্রতি সহায় হৌন। আমিন!

[লেখক : সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ ও কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ]

গৃহযুদ্ধের দাবানলে জ্বলছে সিরিয়া : মুক্তির পথ কোথায়?

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

আজ থেকে প্রায় ২ বছর আগে সিরিয়াতে আরব বসন্তের ঢেউ লাগে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আসাদ পরিবারের শাসনের বিরুদ্ধে সিরিয়ার মানুষ ফুঁসে উঠে। কিন্তু সে বসন্তের ঢেউ এখনো আলোর মুখ দেখেনি, বরং বিরাজ করছে গ্রীষ্মের অস্থিরতা। মিসর ও তিউনিসিয়ার মত এখানে বিনা রক্তপাতে ফল নির্ধারণের মত কিছুই ঘটেনি। লিবিয়ার মত এখানকার বিদ্রোহ সশস্ত্র যুদ্ধে রূপান্তরিত হলেও সফলতা এখনো অধরা। বরং দিন দিন পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে। একদিকে বাশার

আল-আসাদের অনমনীয়তা ও তাঁর প্রতি রাশিয়াসহ কট্টর শীআপন্থী হিযবুল্লাহ এবং তার পৃষ্ঠপোষক ইরানের সমর্থন, অন্যদিকে বিদ্রোহীদের প্রতি সঊদী, কুয়েত এবং তুরস্কের সমর্থন এই যুদ্ধকে এক অনিশ্চিত গন্তব্যের দিকে ঠেলে দিয়েছে। আর হিযবুল্লাহ্‌র প্রত্যক্ষ যোগদান এই যুদ্ধকে শী'আ-সুন্নী যুদ্ধে পরিণত করে দিয়েছে। ফলত আজ মধ্যপ্রাচ্যের সর্বত্র শী'আ-সুন্নী উত্তেজনা বিরাজ করছে। মধ্যপ্রাচ্য পরিণত হয়েছে এক জ্বলন্ত অগ্নিগর্ভে। হাযার হাযার আবাল বৃদ্ধ বণিতার ছোপ ছোপ রক্তে সিরিয়ার মাটি আজ রঞ্জিত। লাখ লাখ মানুষ গৃহহারা হয়ে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে। সরব বিশ্ব মোড়লরা নীরব দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তোড়জোড় যা করা হচ্ছে তা নামে মাত্র, এতে আন্তরিকতার লেশমাত্র নেই। একটু বাড়িয়ে বললে ভুল হবেনা যে, সিরিয়ার গৃহযুদ্ধকে ইচ্ছাকৃত ভাবে জিইয়ে রাখা হচ্ছে। সিরিয়ার এই ভয়াবহ পরিস্থিতি মুসলিম বিশ্বকে এক দীর্ঘস্থায়ী সংকটের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বাশার আল-আসাদ এবং তার আলাভী সম্প্রদায় ও তার সহযোগী ইরান এবং হিযবুল্লাহ সম্পর্কে মুসলিম বিশ্বকে আরেকবার ভাবতে হচ্ছে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে সিরিয়ার বর্তমান আবস্থা বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

কুরআন ও হাদীছে সিরিয়ার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব :

রাসূল (ছাঃ) সিরিয়ার জন্য বরকতের দো'আ করেছেন। তিনি বলেন, اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَأْمِنَا اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا 'হে আল্লাহ! আমাদের সিরিয়ায় বরকত দাও। হে আল্লাহ! আমাদের ইয়ামেনে বরকত দাও। এই দো'আ তিনি তিন বার করেন *(বুখারী, মিশকাত হা/ ৬২৬২)*। অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, طُوبَى لِلشَّامِ قِيلَ وَلِمَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ مَلَائِكَةَ الرَّحْمَنِ بَاسِطَةٌ أَجْنِحَتَهَا عَلَيْهَا 'সিরিয়ার জন্য সুসংবাদ। জিজ্ঞেস করা হ'ল কেন হে রাসূল (ছাঃ)? তিনি বলেন, কেননা আল্লাহ্‌র ফেরেশতারা এর উপর তাদের পাখা বিছিয়ে রাখে' *(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/ ৬২৬৪)*।

রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, سَيَصِيرُ الْأَمْرُ إِلَى أَنْ تَكُونُوا جُنُودًا مُجَنَّدَةً جُنْدٌ بِالشَّامِ وَجُنْدٌ بِالْيَمَنِ وَجُنْدٌ بِالْعِرَاقِ قَالَ ابْنُ حَوَالَةَ خِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ فَقَالَ عَلَيْكَ بِالشَّامِ فَإِنَّهَا خِيرَةُ اللَّهِ مِنْ أَرْضِهِ يَجْتَبِي إِلَيْهَا خِيرَتَهُ مِنْ عِبَادِهِ فَأَمَّا إِنْ أَبَيْتُمْ فَعَلَيْكُمْ بِيَمَنِكُمْ وَاسْقُوا مِنْ غُدُرِكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَوَكَّلَ لِي بِالشَّامِ وَأَهْلِهِ 'পরিস্থিতি তার কাজের ধারা অনুযায়ী চলতে থাকবে যতক্ষণ তোমরা তিনটি বাহিনীতে পরিণত না হও। একটি বাহিনী শামের, আরেকটি বাহিনী ইয়ামানের এবং অপরটি ইরাকের। ইবন হাওয়ালাহ (রাঃ) বললেন, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! যদি আমি সেই দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকি তবে আমার জন্য একটি নির্ধারণ করে দিন। উত্তরে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমার শামে যাওয়া উচিত হবে। কারণ এটি আল্লাহ্‌র ভূমিসমূহের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম এবং তাঁর সবচেয়ে ভাল বান্দারাই সেখানে জড়ো হবে। আর যদি তুমি তা না চাও তবে তোমার ইয়ামান যাওয়া উচিত এবং সেখানকার কূপ থেকে পানি পান করা উচিত। কারণ আল্লাহ আমাকে নিশ্চিত করেছেন যে, তিনি শাম এবং তার মানুষের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন' *(আহমাদ ৪/১১০, আবুদাঊদ হা/২৪৮৩, মিশকাত হা/ ৬২৬৭)*। তিনি আরো বলেন, إِنَّ فُسْطَاطَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْمَلْحَمَةِ بِالْغُوطَةِ إِلَى جَانِبِ مَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا دِمَشْقُ مِنْ خَيْرِ مَدَائِنِ الشَّامِ 'কুফফার মুশরিকদের সাথে মহাযুদ্ধের দিন (কিয়ামতের পূর্বের কোন যুদ্ধ বা দাজ্জালের সাথে যে যুদ্ধ হবে) মুসলমানদের তাঁবু (ফিল্ড হেডকোয়ার্টার) 'গুতা' নামক স্থানে হবে যা একটি শহরের পাশে আবস্থিত। যার নাম দিমাশক যা শাম বা সিরিয়ার শ্রেষ্ঠ নগরী' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৬২৭২)*। উল্লেখ্য যে, 'গুতা' নামক জায়গাটা বর্তমানে সিরিয়ার রাজধানী দামেশক থেকে ৮ কিঃমিঃ পূর্বে আবস্থিত। এখানকার মওসুম শুষ্ক ও গরম *(তিসরী জঙ্গে আযীম আওর দাজ্জাল, মুহাম্মাদ আসেম উমর, ফরিদ বুক ডিপো, দিল্লী, পৃ, ৬৯)*। উপরের হাদীছগুলো প্রমাণ করে শাম বা সিরিয়া একটি বরকতময় জায়গা।

অতীত ও বর্তমানের আলোকে সিরিয়া :

সিরিয়া (আরবীতে السورية আস-সূরিয়া) এশিয়ার মধ্যপ্রাচ্যের একটি রাষ্ট্র। এর দক্ষিণে তুর্কী ও পূর্বে ইরাক। ভূমধ্যসাগরের নীল জলরাশি এর পশ্চিম পাদদেশে এসে আছড়ে পড়েছে। উত্তরে রয়েছে এরই খণ্ডিত অংশ ইসরায়েল, লেবানন, জর্ডান ও ফিলিস্তীন। আরবীতে 'শাম' বললে বর্তমান সিরিয়া, জর্ডান, ইসরায়েল, লেবানন ও ফিলিস্তীনের কিছু অংশকে বুঝায়। ১ম বিশ্বযুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদী ফ্রান্স তাদের দখলদারী টিকিয়ে রাখার জন্য একে টুকরা টুকরা করে। এর সরকারী নাম আরব প্রজাতন্ত্রী সিরিয়া (الجمهورية العربية السورية)। আয়তন মোট ১,৮৫,১৮০ বর্গ কি.মি.। জনসংখ্যা ২০,৩১৪,৭৪৭। সিরিয়া সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয় ১৭ এপ্রিল ১৯৪৬ সালে। জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর। তখন থেকেই পৃথিবীর মানচিত্রে এ দেশ স্বাধীন দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। সরকারী ভাষা আরবী। এখানকার প্রায় চার-পঞ্চমাংশ লোক আরবী ভাষাতে কথা বলে। সিরিয়াতে প্রচলিত অন্যান্য ভাষার মধ্যে আদিজে ভাষা, আরামীয় ভাষা, আর্মেনীয় ভাষা, আজারবাইজানি ভাষা, দোমারি ভাষা (রোমানি ভাষা), কুর্দী ভাষা এবং সিরীয় ভাষা উল্লেখযোগ্য। আন্তর্জাতিক কাজকর্মে ফরাসি ভাষা ব্যবহার করা হয়।

মুসলিম সংখ্যা ৯৫%। তন্মধ্য ৮৫% সুন্নী এবং ১৬% শী'আ। মুদ্রার নাম সিরিয়ান পাউণ্ড। শিক্ষিতের হার ৭৫%।

সিরিয়া এক ঐতিহাসিক জনপদ। সিরিয়ায় জনবসতি শুরু হয় ৪৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। ইসলামের ইতিহাসে সিরিয়া একটি বিরাট অংশ দখল করে আছে। এই ভূমিতেই রোমানদের পরাজিত করে ইসলাম বিশ্বশক্তিতে পরিণত হয়। উমাইয়া খিলাফতের গোড়াপত্তনও এখানে হয়। বহুদিন যাবত দামেশক ইসলামী খিলাফতের রাজধানী ছিল। এখানে বসেই মুসলমানরা একসময় অত্যন্ত প্রতাপের সাথে অর্ধ জাহান শাসন করেছে। এই মাটিতেই সিংহ শার্দুল ছালাহুদ্দীন আইয়ূবী ইসলামের দুশমন ক্রুসেডারদের নাকানি চুবানি খাইয়ে ছেড়েছেন। এই মাটিতে বসেই আপোষহীন মুজাদ্দিদ ও মুহাদ্দিছ ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) ও নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) ইসলামের বিশুদ্ধতাবাদী আন্দোলনের শক্তিমান প্রবল দীপ্তিশিখা প্রজ্জ্বলন করেছেন। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে আরব জাতীয়তাবাদের উত্থানও এখানেই ঘটে। এরই পথ ধরে দীর্ঘ সংগ্রামের পর সিরিয়া স্বাধীনতা লাভ করে। ৭০-এর দশকে অনেকটা নাটকীয়ভাবে সিরিয়ার শাসন ক্ষমতায় আসাদ পরিবারের আগমন ঘটে। ইসরায়েলের কাছে গোলান মালভূমি হারানো নিয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আল-আতাসি তৎকালীন সেনাপ্রধান হাফিয আল-আসাদকে সকল সরকারী ও সামরিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন। সরে দাঁড়াবার নির্দেশ পাবার পর হাফিয আল-আসাদ ও মুস্তাফা ত'লাস বাথ পার্টির অভ্যন্তরে একটি অভ্যুত্থান ঘটান। ফলস্বরূপ রাষ্ট্রপতি আল-আতাসি, বাথ মহাসচিব সালাহ জাদীদ ও অন্যান্য সহযোগী সমেত কারান্তরীণ হন। এই অভ্যুত্থানটিকে সাধারণ সিরীয়রা স্বাগত জানিয়েছিল। যা সিরিয়ার 'সংশোধনী বিপ্লব' (কারেক্টিভ রেভুল্যুশান) নামে খ্যাত হয়। এইভাবে ১৯৭১ সালে রক্তপাতহীন এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসেন সিরিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট বাশারের পিতা হাফিয আল-আসাদ। তখন থেকে সিরিয়ায় শুরু হয় আসাদ পরিবারের শাসন। হাফিজ আল আসাদ তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ২৯ বছর প্রতাপের সাথে সিরিয়া শাসন করেছেন। প্রেসিডেন্ট আসাদের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী হিসেবে তাঁর পুত্র বাশার আল-আসাদ সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন ১০ জুন ২০০০ সালে। অতঃপর ২০১১ সালে তিউনিসিয়া, লিবিয়া, মিশর ও ইয়েমেনে যে গণজাগরণ, গণঅভ্যুত্থান তথা 'আরব বসন্ত' শুরু হয় তার ছোঁয়া লাগে সিরিয়ায়। মূলতঃ সিরিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ সুন্নী হলেও শাসন ক্ষমতায় তাদের কোন অংশীদারিত্ব নেই। সেখানে তারা বহুদিন থেকে নিকৃষ্ট বাতেনী ফিরকা নুসাইরিয়াদের নির্যাতনের যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছে। ইতিপূর্বে তাদের অনেক বিদ্রোহকে অস্ত্রের জোরে নির্মমভাবে দমন করা হয়েছে। এভাবেই এক ভয়াবহ যুদ্ধের উৎপত্তি ঘটে সিরিয়ায়।

জাতিসংঘের মতে সিরিয়ায় গত দু'বছরে সংঘাত-সহিংসতার হাত থেকে জান বাঁচাতে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে যত মানুষ তাঁদের সংখ্যা এখন ১০ লক্ষে গিয়ে পৌঁছেছে। আর দেশের ভেতরে গৃহহারা-ঘরছাড়া হয়েছেন আরো লক্ষ লক্ষ মানুষ। জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থা মার্চ মাসের এক পরিসংখ্যানে এ তথ্য প্রকাশ করেছে। অন্যদিকে এ পর্যন্ত ৬০ হাযারের অধিক মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে যার মধ্যে রয়েছে অসংখ্য নারী ও শিশু। সিরিয়ার বর্তমান সহিংসতার কারণে সেখানে খাদ্য সাহায্য পৌঁছানো যাচ্ছে না। ফলে ২২ মাস ধরে চলা সংঘর্ষে ১০ লাখ মানুষ খাদ্যাভাব ও অসহায় পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে। সিরিয়ার চলমান সংকট নিরসনে এ পর্যন্ত বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথমে ঝানু কূটনীতিক কফি আনানকে সিরিয়া সংকট সমাধানে জাতিসংঘ ও আরব লীগের বিশেষ দূত হিসেবে নিয়োগ করা হয়। তিনি সংকট সমাধানে ছয় দফা 'শান্তি পরিকল্পনা' নিয়ে এগিয়ে যান। সংকট সমাধানে দেশটির উপর অবরোধ আরোপের জন্য জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে কয়েকবার প্রস্তাব তোলা হয়। কিন্তু চীন ও রাশিয়ার ভেটোর কারণে তা নাকচ হয়ে যায়। সর্বশেষ প্রস্তাব তৈরী করেছিল যুক্তরাজ্য। এটি পাশ হলে দেশটিতে বাইরের সামরিক হস্তক্ষেপের সুযোগ সৃষ্টি হত। কিন্তু পুনরায় ভেটো দেয়ায় এ পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। ফলে কফি আনানের ছয় দফা 'শান্তি পরিকল্পনা' কূটনৈতিক সমাধিতে পরিণত হয়। উত্তাল সিরিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠায় কফি আনানের ব্যর্থতার পর জাতিসংঘ ও আরব লীগের বিশেষ দূতের দায়িত্ব নিয়েছেন লাখদার ব্রাহিমি। অশান্ত সিরিয়ায় শান্তির বার্তা আনতে তিনি নিরন্তর চেষ্টা চালাচ্ছেন। সিরিয়া সরকার ও বিদ্রোহীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে চলেছেন। পরোক্ষভাবে পক্ষ নেওয়া দেশগুলোর সাথে দফায় দফায় বৈঠক করছেন। সর্বশেষ জেনেভায় অনুষ্ঠিত হয় ত্রিপক্ষীয় আলোচনা। কিন্তু তাতেও কোন ফল হয় নি। এদিকে কট্টরপন্থী শী'আ গ্রুপ হিযবুল্লাহও এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে যুদ্ধের আগুনে আরো ঘি ঢেলেছে। ফলত যুদ্ধটি সকল পক্ষেরই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং নিছক রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব থেকে শী'আ-সুন্নী যুদ্ধে রূপ নেয়। আজ পুরো মুসলিম দুনিয়া থেকে সুন্নী মুজাহিদরা নিজেদের ভাইদের রক্ষার জন্য শামে এসে জমা হচ্ছে। ঠিক শী'আরাও এভাবে এখানে আসছে। পরিস্থিতি আজ এমন হয়ে গেছে যে, শামে যেন শী'আ-সুন্নী বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। এদিকে বিশ্ব মোড়লরা নিজ নিজ স্বার্থকে সামনে রেখে এই যুদ্ধ নিয়ে ভয়াবহ খেলায় মেতে উঠেছে। আমেরিকা বাশার আল-আসাদের পতন চাইলেও সে তার পরিবর্তে তাঁবেদার সরকার চায়। তাই সিরিয়ার 'ফ্রী সিরিয়ান আর্মি' সে সমর্থন করলেও অস্ত্র সহযোগিতা দিচ্ছে না। কেননা এই অস্ত্র সেখানে যুদ্ধরত ইসলামপন্থীদের হাতে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে রাশিয়ার সাথে সিরিয়ার বরাবর ঘনিষ্ঠ কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। বাশারের পিতা হাফেয আল-আসাদ স্নায়ুযুদ্ধকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পরবর্তীতে রাশিয়ান ফেডারেশনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছেন এবং বাশার এই বন্ধুত্বকে আরও শক্তিশালী করেছেন। ফলে রাশিয়া এই যুদ্ধে একচেটিয়াভাবে সিরিয়ার পক্ষ নিয়েছে। আর অন্যদিকে ইরান শুধু সমর্থন নয় বরং হিযবুল্লাহকে সরাসরি মাঠে নামিয়েছে। সঊদী আরবও পূর্ণভাবে বিদ্রোহী সুন্নীদের আর্থিক ও সামরিক সহায়তা প্রদান করছে। ফলত গৌণভাবে শী'আ-সুন্নী যুদ্ধ এবং বাহ্যত বিশ্বমোড়ল দেশগুলোর ক্ষমতার দ্বন্দ্বে পরিণত হওয়া এই যুদ্ধের ভবিষ্যৎ কি হতে পারে তা নিয়ে মুসলিম বিশ্বে চরম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে। এই যুদ্ধের ভবিষ্যৎ কি তা আন্দাজ করা মুশকিল হলেও এটা নিশ্চিত যে, এই যুদ্ধে যে পক্ষের জয় হবে তার উপর ভবিষ্যৎ বিশ্ব রাজনীতিরও অনেক কিছুই নির্ভর করছে।

বাশার আল-আসাদ ও তার সম্প্রদায়ের আসল চেহারা :

বাশার আল-আসাদ (بشار الأسد)-এর জন্ম ১৯৬৫ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর। তিনি সাবেক সিরীয় রাষ্ট্রপতি হাফেয আল-আসাদের পুত্র ও রাজনৈতিক উত্তরসূরী। আল-আসাদ পরিবার সিরিয়ার রাজনৈতিক পরিসরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পরিবারটি মূলত সিরিয়ার সংখ্যালঘু আলাবী বা নুসাইরিয়া সম্প্রদায় হতে আগত, যার আদিবাস মূলত লাতাশিয়া প্রদেশের ক্বারদাহা শহরে। আরবীতে 'আল-আসাদ' শব্দের অর্থ 'সিংহ'। ১৯৭০ সালে এই পরিবার সিরিয়ার রাজনীতিতে 'সংশোধনী বিপ্লব' (কারেক্টিভ রেভুল্যুশান) নামক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আগমন করে।

এরপর থেকে আজ পর্যন্তসিরিয়ায় ক্ষমতাসীন বাশার আল-আসাদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ সিরিয়ার সামরিক অসামরিক বিভিন্ন নীতিনির্ধারণী ও নেতৃস্থানীয় পদসমূহে আসীন রয়েছেন। পরিবারের সদস্য ছাড়াও মূল আলাব সম্প্রদায়ের প্রচুর মানুষও সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ অধিকার করে আছেন। বাশার আল-আসাদের নেতৃত্বাধীন বাথ পার্টি বর্তমানে সাংবিধানিকভাবে সিরিয়ার সরকারী দল। ২০০০ সালে রাষ্ট্রপতিত্ব গ্রহণের আগ পর্যন্ত বাশার সিরিয়ার

Contents

রাজনীতিতে তেমনভাবে জড়িত হননি। বরং ক্ষমতার রাজনৈতিক কার্যক্রম বলতে তিনি এর আগে সিরিয়ার কম্পিউটার সমিতির প্রধান ছিলেন। উল্লেখ্য, এই কম্পিউটার সমিতির অবদানেই ২০০১ সালে সিরিয়ায় ইন্টারনেটের বিস্তার ঘটে। বাশার আল-আসাদ ২০০১ সালে একটি গণভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি পদে স্থায়িত্ব অর্জন করেন। প্রথমে আমরা তাদের সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচনা করব।

বাশার আল-আসাদ নুসাইরিয়া সম্প্রদায়ের অধিবাসী। মূলতঃ নুসাইরিয়া একটি বাতেনী ফিরকা। এদের আকীদা অত্যন্ত জঘন্য। এমনকি আনেক শী'আও এদের মুসলিম মনে করেনা। বর্তমান তাদের অধিকাংশ লোকের বসবাস সিরিয়ার দক্ষিণ ও উত্তরাঞ্চলে। তুরস্কের দক্ষিণাঞ্চল, লেবাননের উত্তরাঞ্চল, ইরান, তুর্কিস্তান ও কুর্দিস্তানে তাদের বসবাস রয়েছে। এই ফিরকার বিভিন্ন নাম রয়েছে, যার কতিপয় তারা পছন্দ করে, কতিপয় অপছন্দ করে। যেমন- আন-নুসাইরিয়া, আলাভী, সূরাহ্কা প্রমুখ।

নুসাইরিয়দের উত্থান :

শী'আদের ধারণা সব যুগে একজন ইমাম থাকেন যিনি মানুষের যাবতীয় বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন। কোন যুগ ইমামবিহীন থাকা সম্ভব নয়, অন্যথায় মানুষের জীবন অচল হতে বাধ্য। রাজতন্ত্রের ন্যায় ইমামের ছেলে ইমাম হবেন, অন্য কেউ নয়। এ হিসাবে শী'আদের একাদশ ইমাম হাসান আসকারী নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যাওয়ার কারণে ইমামিয়া আক্বীদা চরম সংকটের সম্মুখীন হয়। কেউ হাসান আসকারির ছেলে ধারণা করে নেন এক ব্যক্তিকে, যার নাম মুহাম্মাদ। যেহেতু বাস্তবে ছিল না, তাই তারা বলেন জন্মের পরই সে গর্তে বা সমাধিগৃহে আশ্রয় নিয়েছে। অপর দল বাস্তবতা মেনে নিয়ে তার সন্তানের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। এভাবে তাদের মধ্যে বিভিন্ন দল-উপদলের সৃষ্টি হয়। দ্বাদশ ইমাম যেহেতু বাহ্যিক ছিলেন না, তাই যারা অদৃশ্য ইমাম মানে তারা 'বাব' মতবাদ উদ্ভাবন করেন। আর 'বাব' হ'ল আহলে বাইতের খাস ব্যক্তি, তিনি অদৃশ্য ইমাম ও মানুষের মাঝে মধ্যস্থতা করেন।

এ কুসংস্কারের জন্য তারা একটি জাল হাদীছ পেশ করে। তাদের ধারণায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন : **أنا مدينة العلم وعلى بابها فمن أراد العلم فليأته من بابــه** 'আমি জ্ঞানের শহর এবং আলী হল তার দরজা। সুতরাং যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণ করে, সে যেন অবশ্যই আলীর দরজায় আসে' *(হাদীছটি জাল, সিলসিলা যঈফাহ, হা/২৯৫৫)*। প্রথম 'বাব' আলী ইব্‌ন আবু তালিব, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর 'বাব' ছিলেন। দ্বিতীয় 'বাব' সালমান ফারসী (রাঃ), তিনি আলী ইবনে আবু তালিবের 'বাব' ছিলেন। এভাবে তারা একাদশ ইমাম হাসান আসকারী পর্যন্ত 'বাব' বা দ্বার নির্ধারণ করে। অতঃপর দ্বাদশ ইমামের 'বাব' নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হয়। নুসাইরিদের দাবী দ্বাদশ ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আসকারির কোন 'বাব' ছিল না, বরং 'বাব'-এর ধারাটি একাদশ ইমাম হাসান আসকারি পর্যন্ত চলমান ছিল, অর্থাৎ তিনি 'বাব' ছিলেন আবু শুআইব মুহাম্মদ ইবনে নুসাইরের। এ থেকে নুসাইরিয়া ও দ্বাদশ ইমামিয়ার মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। তাই মুহাম্মদ ইবনে নুসাইর ও তার দল শী'আ দ্বাদশ ইমামিয়া থেকে বের হয়ে যায়। আর এভাবেই নুসাইরিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়।

নুসাইরিয়াদের বিভ্রান্তিকর আক্বীদা :

১, নুসাইরিরা সম্প্রদায় আলী (রাঃ)-এর প্রভুত্বে বিশ্বাস করে। খ্রিস্টানদের ত্রিত্ববাদের ন্যায় এক সত্তা তিন সত্তার মধ্যে দেহ ধারণ করার মতবাদ নুসাইরিয়দের ধর্মে রয়েছে। তারা মনে করে এ তিন সত্তা মূলত এক সত্তা ও চিরস্থায়ী।

নুসাইরিয়দের তিন সত্তার নীতি খ্রিস্টানদের ত্রিত্ববাদের সমতুল্য। তারা তিন সত্তার জন্য তিনটি শব্দ ব্যবহার করে। যথা : (ع.م.س) তারা বলে, এ তিন সত্তার মধ্যে আল্লাহ দেহধারণ করেছেন। এক. আলী, তার জন্য তারা (المعــنى) শব্দ ব্যবহার করে। দুই. মুহাম্মাদ, তার জন্য তারা (الاسم) শব্দ ব্যবহার করে। তিন. সালমান, তার জন্য তারা (البــاب) শব্দ ব্যবহার করে। ع দ্বারা আলি, م দ্বারা মুহাম্মাদ ও س দ্বারা সালমান ফারসি উদ্দেশ্য *(নুসাইরিয়া সম্প্রদায়, ডঃ গালিব ইবন আলী আওয়াজী, অনুবাদ, সানাউল্লাহ নাজির আহমাদ, ইসলাম প্রচার ব্যুরো, রাবওয়াহ, রিয়াদ পৃ.১৯)*।

২, আলী মুহাম্মাদকে সৃষ্টি করেছেন, মুহাম্মাদ সৃষ্টি করেছেন সালমান ফারসিকে, সালমান ফারসি সৃষ্টি করেছেন পঞ্চ ইয়াতীমকে, যাদের হাতে আসমান-যমীনের নিয়ন্ত্রণ। তারা হলেন–

১. **মিকদাদ :** তিনি মানুষের রব ও সৃষ্টিকর্তা। তার দায়িত্বে রয়েছে বিদ্যুৎ চমক, মেঘের গর্জন ও ভূমিকম্প।

২. **আবুদ দার (আবু যর গিফারী) :** তিনি নক্ষত্র ও তারকারাজির কক্ষপথসমূহ নিয়ন্ত্রণ করেন।

৩. **আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা আল-আনছারী :** তিনি বাতাসের নিয়ন্ত্রক ও মানুষের রূহ কব্জাকারী।

৪. **উছমান ইবনে মায'উন :** তিনি শরীরের জ্বর, পেট ও মানুষিক রোগ নিয়ন্ত্রণকারী।

৫. **কুম্বর ইবনে কাদান :** তিনি মানুষের শরীরে রূহ সঞ্চারকারী *(ঐ, পৃ. ৫৪)*।

এসব আক্বীদা প্রমাণ দেয় তারা ইসলামের নাম ব্যতীত কিছুই গ্রহণ করেনি। এ সবই কুফরী আক্বীদা। এর যে কোনো একটি আল্লাহ্‌র দ্বীন থেকে বের করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট।

৩. তাদের এক গুরুত্বপূর্ণ আক্বীদা হ'ল, তারা পুনর্জন্মে বিশ্বাসী। তারা এ বিশ্বাসের অন্তরালে কিয়ামত, পরকাল, প্রতিদান ও হিসাব-নিকাশ অস্বীকার করে। তাদের নিকট শরীরই জান্নাত বা জাহান্নাম। তারা সুন্দর, সুখী ও ভালো শরীরে প্রস্থান করে শান্তি পায়; আর কুৎসিত, দুঃখী ও খারাপ শরীরে প্রস্থান করে শাস্তি ভোগ করে। যেমন কুকুর, শূকর, সাপ, বিচ্ছু ও গুবরেপোকা। এভাবে চিরজীবন শরীরই তাদের জান্নাত বা জাহান্নাম। এ ছাড়া কিয়ামত, পুনরুত্থান, জান্নাত, জাহান্নাম বলতে কিছু নেই *(ঐ, পৃ. ৬৯)*।

৪. তারা মদের মত নিকৃষ্ট বস্তুকে পবিত্র মনে করে। ধর্ম শেখার জন্য মদ খাওয়া অপরিহার্য বলে তারা বিশ্বাস করে।

আর এই সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে এতটুকুই বলা যথেষ্ট যে, যখন সিরিয়ার মুসলমানরা স্বাধীনতার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়ে নিজেদের রক্তে দামেশকের রাজপথ রঞ্জিত করছিল, তখন এই সম্প্রদায় ফ্রান্সের লেজুড়বৃত্তিতে ব্যস্ত ছিল *(মধ্যপ্রাচ্য ঃ অতীত ও বর্তমান, ইয়াহিয়া আরমাজানী, বঙ্গানুবাদ ঃ মুহাম্মাদ ইনামুল হক, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, পৃ, ৩২৮)*।

বাশার আল-আসাদ পরিবারের ইসলামবিদ্বেষী কর্মকাণ্ড :

আসলে শী'আরা সর্বদা ইসলামের ক্ষতি করার চেষ্টা করেছে। এরা মুখে ইসলামের নাম নিলেও এদের অন্তরে রয়েছে চরম ঘৃণা। যার বহিঃপ্রকাশ সুযোগ মত ভয়াবহভাবে ঘটে। যেমন ২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২ ইং হামা শহরে নুসাইরি (আলাবি) বংশের প্রেসিডেন্ট আসাদ ও তার সহোদর কর্নেল রিফাত আসাদের নেতৃত্বে সিরিয়ান সেনাবাহিনী আহলে সুন্নাহ, বিশেষ করে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের উপর যে আক্রমণ ও গণহত্যা পরিচালনা করেছিল নিকট অতীতে তার নযীর বিরল। সে গণহত্যায় গুম, গ্রেফতার ও দেশত্যাগী ছাড়াও শুধু সরকারী হিসাবেই নারকীয় হত্যার শিকার হয়েছিল প্রায় ৪০ হাযার সাধারণ মানুষ। পৈশাচিক এ দমন অভিযানের বিরুদ্ধে জাতিগত প্রতিবাদ ও বহির্বিশ্বের চাপ ঠেকানোর জন্য সকল প্রকার মিডিয়া বন্ধ

করে দেয়াসহ সংবাদপত্রের উপর কঠিন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। হামা শহরের সাথে সংযোগ স্থাপনকারী সব রাস্তার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। শহর থেকে কাউকে বের হতে দেয়া হয়নি। বিদ্যুৎ ও টেলিফোন সংযোগ কেটে দেয়া হয়, ফলে হামলার প্রথম দিন মঙ্গলবার রাতেই পুরো শহর বিভীষিকাময় অন্ধকারে পতিত হয়। বহু মসজিদ ও গির্জা ধ্বংস করা হয়, অলিতে-গলিতে হত্যাযজ্ঞ চলে, হাযার হাযার মানুষকে হত্যা করা হয়, বহু কবরস্থান গুড়িয়ে দেয়া হয়। অবশেষে স্বৈরশাসক ও তার বাহিনীর হাতে (০২-২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২ইং) লাগাতার ২৭ দিন ব্যাপী চলমান গণহত্যা ও বাড়ি-ঘর ধ্বংসের পর হামা শহরের এক তৃতীয়াংশ নিঃশেষ হলে এ ধ্বংসযজ্ঞের সমাপ্তি ঘটে।

অন্যদিকে বাহ্যত দেখা যায় যে, বাশার সরকার ইসরায়েল ও আমেরিকা বিরোধী। এ বিষয়টিও প্রশ্নসাপেক্ষ। ১৯৬৭ সনে ইসরাইল মিসরে হামলা করে সিনাই উপত্যকা দখল করে নেয়। ফলে আরব-ইসরাইল যুদ্ধ আরম্ভ হয়, যা ছয়দিন ব্যাপী স্থায়ী হয়েছিল। সিরিয়া ও জর্ডানের চুক্তি ছিল যে, ফিলিস্তীনিদের সাহায্যে জর্ডান ও সিরিয়া ইসরাইলের উপর একযোগে আক্রমণ করবে। নির্দিষ্ট সময়ে জর্ডান হামলা করেছে ঠিক, কিন্তু সিরিয়ার সেনাপ্রধান ফিলিস্তীনীদের সাহায্য করা থেকে বিরত থাকে। ফশ্রুতিতে মিসর, জর্ডান ও সিরিয়ার পরাজয় ঘটে। এ যুদ্ধে ইসরাইল মার্কিন সামরিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে মিসরের সিনাই মরুভূমি, সিরিয়ার গোলান মালভূমি, জর্ডান নদীর পশ্চিম তীর, বায়তুল মোকাদ্দাসের পূর্বাংশ এবং গাযা উপত্যকা দখল করে নেয়। তখন সিরিয়ার সেনাবাহিনী প্রধান ছিল বর্তমান প্রেসিডেন্ট বাশার-এর পিতা হাফেয আল-আসাদ। হাফেয আল-আসাদ তার বাহিনীকে হামলায় অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখে এবং সিরিয়ার উঁচু ভূখণ্ড গোলান মালভূমি ইসরাইলের হাতে তুলে দেয়, যা ছিল যুদ্ধের কৌশলগত দিক থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেখান থেকে সিরিয়ার সৈন্যবাহিনী সরিয়ে আনে, অতঃপর সংবাদপত্রে মিথ্যা প্রচার করে যে, ইসরাইল গোলান মালভূমি দখল করে নিয়েছে, অথচ তখনো ইসরাইল বাহিনী সেখানে পৌঁছায়নি। তখন সিরিয়ার প্রধানমন্ত্রী সালাহ জাদীদ হাফেয আল-আসাদের ভূমিকার সমালোচনা করেন। এভাবে হাফেয আল-আসাদ জর্ডানের সাথে গাদ্দারি করে ইসরাইলের হাতে নিজ দেশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমি তুলে দেয়। এ ঘটনার পর প্রধানমন্ত্রী সালাহ জাদীদ ও সেনাবাহিনী প্রধান হাফেয আল-আসাদের মধ্যে তীব্র বিরোধ সৃষ্টি হয়। সালাহ জাদীদ যরূরী বৈঠক ডেকে তাকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেন, কিন্তু হাফেয আল-আসাদ সেনাবাহিনীতে থাকা তার ঘনিষ্ঠ সাথীদের নিয়ে নূরুদ্দীন আতাসি ও সালাহ জাদীদকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করে জেলে বন্দী করে *(প্রেসিডেন্ট 'নুরুদ্দিন আতাসি' ও প্রধানমন্ত্রী 'সালাহ জাদিদ' উভয়ের মেয়াদকাল ২৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬ইং, ১৮ নভেম্বর, ১৯৭০ইং)*। এখানে নুসাইরী বংশদ্ভূত হাফেয আল-আসাদ বংশের মুসলিম বিদ্বেষ ও গাদ্দারি সুস্পষ্ট *(দেখুনঃ হাফিয আল-আসাদ, উইকিপিডিয়া)*।

হিযবুল্লাহর মুখোশ উন্মোচন :

সিরিয়া যুদ্ধের অন্যতম শরীক হিযবুল্লাহ। এই গ্রুপটি এখন বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ করার পাশাপাশি প্রায় ৬০০০ সিরীয় সৈন্যকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। সুতরাং তার সম্পর্কে না জানলেই নয়। আরবী ভাষায় حـزب الله অর্থ 'আল্লাহর দল'। মূলতঃ হিযবুল্লাহ হচ্ছে লেবাননের শী'আ অধ্যুষিত গেরিলা সংগঠন যার প্রধান হাসান নাসরুল্লাহ। ১৯৮২ সনে প্রতিষ্ঠা হলেও রাজনৈতিক অঙ্গনে সংগঠনটির অনুপ্রবেশ ঘটে ১৯৮৫ সালে। ইরানের মদদপুষ্ট সংগঠন حركة أمل الشيعية اللبنانيـــة (লেবাননী শী'আদের স্বার্থ বাস্তবায়নকারী আন্দোলন) থেকে 'হিযবুল্লাহ'র জন্ম। প্রথমে মূল সংগঠনের নামানুসারে হিযবুল্লাহর নামকরণ করা হয় حركة أمـل الـشيعية (শী'আদের স্বার্থ বাস্তবায়নকারী আন্দোলন)। অতঃপর বৃহৎ লক্ষ্যে এ নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় أمل الإســلامية (ইসলামী স্বার্থ বাস্তবায়নকারী আন্দোলন)। কারণ حركة أمل الشيعية এর তৎপরতা লেবাননী শী'আদের রাজনৈতিক অঙ্গনে সীমাবদ্ধ ছিল, তাকে ব্যাপক করে 'আমালুল ইসলামিয়াহ' নামকরণ করা হয়, যেন লেবানন ও অন্যান্য মুসলিম দেশে শী'আ মতবাদ প্রচারে 'আমালুল ইসলামিয়া'-কে মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এজন্য তারা জিহাদী গ্রুপের আকৃতি ধারণ করে, যেন মানুষ বোঝে তাদের উদ্দেশ্য মুসলিম উম্মাহ থেকে ইহুদী আগ্রাসন প্রতিরোধ করা ও ইসলামের পবিত্র ভূমিসমূহ সংরক্ষণ করা। যদিও তাদর যাবতীয় অর্থের যোগানদাতা ইরান। এভাবে সম্পূর্ণ নতুন নামে অপর একটি সংগঠনের জন্ম দেওয়া হল, যা বর্তমান 'হিযবুল্লাহ' নামে প্রসিদ্ধ *(হিযবুল্লাহ সম্পর্কে কি জানেন?, আলী আস সাদিক; অনুবাদ : সানাউল্লাহ নাজির আহমাদ, ইসলাম প্রচার ব্যুরো, রাবওয়াহ সেন্টার, রিয়াদ, পৃ. ৭)*।

'হারাকাতুল আমাল' নামের যে সংগঠন থেকে হিযবুল্লাহর উত্থান তারা কিভাবে সুন্নী মুসলমানদের উপর নির্যাতনের ষ্টীম রোলার চালিয়েছে বিশেষ করে ফিলিস্তিনী অসহায় শরণার্থীদের সাথে তারা কিভাবে গাদ্দারী করেছে তার কিছু নমুনা তুলে ধরা হল–

১. ২০/৫/১৯৮৫ইং সোমবার : রামাযানের প্রথম রাতে 'হারাকতে আমালে'র মিলিশিয়ারা 'সাবরা' ও 'শাতিলা' নামক দুটি ফিলিস্তীনী শিবিরে হামলা করে। অতঃপর গাজার হাসপাতালে কর্মরত ডাক্তার, নার্স ও স্টাফদের ধরে 'আমালে'র স্থানীয় অফিস 'জালুল'-এ নিয়ে আসে। শীআ যোদ্ধারা কয়েকটি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান যেমন 'রেড ক্রিসেন্ট' ও 'রেড ক্রস' সংস্থার চিকিৎসার সরঞ্জামাদি বহনকারী এম্বুলেন্সকে শরণার্থী শিবিরে প্রবেশে বাঁধা দেয় এবং হাসপাতাল থেকে পানি ও বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেয় *('হিযবুল্লাহ সম্পর্কে কি জানেন? পৃ ১৬)*।

২. ২০/৫/১৯৮৫ইং সোমবার : ভোর পাঁচটায় 'সাবরা' শরণার্থী শিবির কামান ও বন্দুকের গোলার শিকার হয়। একই দিন সকাল সাতটায় 'বুরজুল বারাজেনাহ' শরণার্থী শিবিরেও তার বিস্তার ঘটে। যখন 'হরকতে আমালে'র নৃশংস হামলা নারী, পুরুষ ও শিশুদের নির্বিচারে শিকার করছিল, তখন 'নবীহ বারিহ' লেবাননের ষষ্ঠ ব্রিগেডকে নির্দেশ করল সুন্নীদের বিপক্ষে 'আমালে'র যোদ্ধাদের সাহায্য কর। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ষষ্ঠ ব্রিগেড এসে চতুর্দিক থেকে 'বুরজুল বারাজেনাহ' শিবিরে গোলা বর্ষণ শুরু করল *(ঐ)*।

৩. ১৮/৬/১৯৮৫ইং : এই দিন 'হরকতে আমালে'র আগুনে বিধ্বস্ত শিবির থেকে ফিলিস্তীনীরা মুক্ত হয়। পুরো একমাস ভয়-ভীতি-আতঙ্ক ও ক্ষুধার্ত জীবনে তারা কুকুর ও বিড়াল পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়েছিল। এমনকি মুসলমানরা বলতে বাধ্য হয় যে, এর চাইতে তো ইহুদীরা ভাল। ৯০% বাড়ি-ঘর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। নানা তথ্য থেকে হতাহতের সংখ্যা ৩১০০ বলে জানা যায়। ১৫ হাযার শরণার্থী বাড়ি-ঘর ছেড়ে চলে যায়, যা ছিল মোট আশ্রয়প্রাপ্তদের প্রায় ৪০%।

৪. ৪/৬/১৯৮৫ইং : এই দিন কুয়েতী সংবাদ সংস্থা ও তার আগের দিন 'আল-ওয়াতান' ম্যাগাজিন প্রচার করে যে, 'আমালে'র যোদ্ধারা 'সাবরা' শরণার্থী শিবিরে পরিবারের সামনে থেকে ২৫ জন যুবতীকে অপহরণ করে তাদের শ্লীলতাহানির মত জঘন্য অপরাধ করেছে।

ইসরাইলি সৈন্যরা যখন লেবানন ঢুকে শী'আদের মদদে ফিলিস্তীনী স্বাধীনতাকামীদের দমন করে, তখন শী'আরা দক্ষিণ লেবাননে ইহুদী সৈন্যদের ফুল ও তোরণ দিয়ে অভ্যর্থনা জানায়! *(হিযবুল্লাহ সম্পর্কে কি জানেন? পৃ ২১)*। এ বিষয়টি হিযবুল্লাহর তৎকালীন সেক্রেটারি জেনারেল হাসান নাসরুল্লাহও স্বীকার করেছেন *(ঐ, পৃ.২১)*। বর্তমান হিযবুল্লাহ প্রধান নেতা হাসান নাসরুল্লাহ। যিনি এক সময় এই 'হারকাতে আমালে'র বেক্কা প্রদেশের প্রধান ও কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য ছিলেন।

আর হাসান নাসরুল্লাহ সম্পর্কে জানার জন্য বেশী তথ্যানুসন্ধান ও গবেষণার প্রয়োজন নেই। এতটুকু জানাই যথেষ্ট যে, সে জাফরী শী'আ দ্বাদশ ইমামিয়ার অন্তর্ভুক্ত। যাদের নিকট আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের উপায় হচ্ছে ছাহাবীদের গালমন্দ করা। সত্যিকার অর্থে যদি হাসান নাসরুল্লাহ ইসরাইলের জন্য হুমকি হত, তাহলে সে কিভাবে লেবাননের উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিম চষে বেড়ায়, ইসরাইলের বিষোদগার করে বেতার-যন্ত্র ও টিভির পর্দায় সাক্ষাৎকার দেয়। কিভাবে নিজস্ব টিভি চ্যানেল পরিচালনা করে। কিভাবে বিশাল জনসভায় ইসরাঈলকে হুমকি দেয়, যেসব সভার দিন-তারিখ ও স্থান পূর্ব থেকে নির্ধারিত থাকে, অথচ ইসরাইল তাকে কিছু বলে না? তার গাড়ি, বাড়ি বা জনসভাকে লক্ষ্য করে কোন মিসাইল ছুড়ে না? তাকে হত্যার জন্য কেন কোন পুরস্কার ঘোষণা করা হয়না? পক্ষান্তরে সুন্নী যোদ্ধাদের মাথার জন্য লাখ লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। ড্রোন হামলা হয়তোবা শুধু সুন্নীদের জন্যই নির্ধারণ করা হয়েছে যাতে তারা লুকিয়েও বাঁচতে না পারে।

যাইহোক এই সুন্নী বিদ্বেষী মনোভাব নিয়ে হিযবুল্লাহর যাত্রা শুরু হয়। এরপর হিযবুল্লাহর জনসমর্থন বৃদ্ধির স্বার্থে ২০০৬ সালে এক নতুন নাটক মঞ্চস্থ করা হয়। এই নাটকে হিযবুল্লাহ ফিলিস্তীনের দখলকৃত যমীন মুক্ত করার নামে দু'জন ইসরাইলী সেনাকে অপহরণ করে। সাথে সাথে ইসরায়েলের সাথে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয় এবং যুদ্ধ শেষে হিযবুল্লাহ বিজয় লাভ করেছে বলে প্রচারণা চালানো হয়। এই 'বিজয়ে'র পর হিযবুল্লাহ নেতা হাসান নাসরুল্লাহ রীতিমত হিরো বনে যান। যারা গতকালও সুন্নী মুসলিমদের উপর নিধনযজ্ঞ পরিচালনা করেছে। দক্ষিণ বৈরূতে ফিলিস্তীনী শরণার্থী শিবির 'বারাজানাহ' ক্যাম্পে নিরীহ নিরপরাধ নিরস্ত্র সুন্নী মুসলিমদেরকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করেছে। হলুদ মিডিয়ার কল্যাণে তারাই আজ বীর মুজাহিদ! সত্যিই মিরাকেল! বিচিত্র সেলুকাস এ পৃথিবী!

আসলে এটা যে একটি নিছক নাটকই ছিল তা যেকোন বিবেকবান মানুষ মাত্র বুঝতে পারবে। যেখানে সকল আরব রাষ্ট্র মিলে ইসরায়েলের সাথে যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারেনা। সেখানে মুষ্টিমেয় জনবল আর অস্ত্রবল নিয়ে হিযবুল্লাহ একাই জয়লাভ করল! হঠাৎ কোন উস্কানী ছাড়াই কেন হিযবুল্লাহ ইসরায়েলের দু'জন সেনাকে অপহরণ করল? অথচ যখন হামাসের দু'জন নেতা আহমাদ ইয়াসীন ও আব্দুল আজিজ রানতিসিকে হত্যা করা হয়, তখন কেন হিযবুল্লাহ একটি মিসাইলও ইসরাইলের দিকে নিক্ষেপ করেনি? গাজায় যখন গণহত্যা চালানো হয় তখন কেন সে ইসরায়েলের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়নি। অথচ তারা ইসরাইলের কলিজায় বসে আছে। তাদেরই বেশী প্রয়োজন ছিল সাহায্য, সমর্থন ও অস্ত্র সহযোগিতা করার! আর সত্যি বলতে কি, এই যুদ্ধে ফিলিস্তীনী জমি পুনরুদ্ধার তো অনেক দূরের কথা বরং হিযবুল্লাহর সাথে এই যুদ্ধ ইসরায়েলকে নিরাপত্তার নামে লেবানন সীমান্তে সৈন্য মোতায়েন থেকে শুরু করে অনেক কিছুই করার সুযোগ করে দিয়েছে। এই যুদ্ধের ব্যাপারে স্বয়ং হাসান নাসরুল্লাহ ২৭/০৭/২০০৬ইং লেবাননের New TV চ্যানেলের এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'যদি জানতাম দু'জন ইসরাইলি সৈন্য অপহরণ করার ফলে লেবাননের এ পরিমাণ ক্ষতি হবে, তাহলে কখনো এ নির্দেশ দিতাম না'। তিনি আরো বলেন, দু'জন সৈন্য অপহরণ করার ফলে যে ক্ষতি হয়েছে, হিযবুল্লাহ তার একভাগেরও আশঙ্কা করেনি। কারণ যুদ্ধের ইতিহাসে এ পরিমাণ ক্ষতি কখনো হয়নি। হাসান নাসরুল্লাহ আরো বলেন, হিযবুল্লাহ দ্বিতীয়বার কখনো ইসরাইলের সাথে যুদ্ধে জড়াবে না' *(আশ-শারকুল আওসাত সংখ্যা : ১০১৩৫, তারিখ: ২৮/৮/২০০৬ইং-এর বরাতে, ঐ, পৃ. ১০৭)*।

হাসান নাসরুল্লাহ'র এই কথাকে সামনে রেখে যদি আমরা একটু আগ বাড়িয়ে বলি তাহ'লে ভুল হবেনা যে, দু'জন ইসরাইলী সৈন্য অপহরণ করে সে লেবাননের উপর ইসরাইলকে ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালনার পথ সুগম করে দিয়েছে। এরূপ কাজ হাসান নাসরুল্লাহর পূর্বে তার পূর্বসূরি আব্বাস মুসাভিও করেছিল। ১৯৮৬ইং সালে মধ্য ফেব্রুয়ারিতে দু'জন ইসরাইলী সৈন্য অপহরণ করে লেবাননে তাদেরকে হামলার সুযোগ করে দিয়েছিল, যার ফলে তারা লেবাননী সামরিক শক্তি ও তাদের অর্থ-সম্পদের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। কেননা আল-কুদস মুক্ত করা

তার লক্ষ্য নয়। যেমন ২০০০ইং সালে 'বিনতে জাবিল' এলাকা হ'তে ইসরাইলীদের হটে যাওয়ার পর হাসান নাসরুল্লাহ হাযার হাযার দক্ষিণাঞ্চলীয় যোদ্ধার সামনে ঘোষণা দেন যে, হিযবুল্লাহ কখনো কুদসকে মুক্ত করার জন্য ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না! *(ঐ, পৃ. ১১২)*। শুধু এখানেই নয় হিযবুল্লাহর এক সময়ের সেক্রেটারি জেনারেল সুবহি তুফাইলি বলেন, 'নিশ্চয়ই হিযবুল্লাহ ইসরাইলের বর্ডার পাহারাদার। এ কথার সত্যতা যে যাচাই করতে চায়, সে যেন অস্ত্র হাতে সীমান্তের দিকে অগ্রসর হয় এবং ইহুদী শত্রুদের বিপক্ষে দাঁড়ায়, তাহলে অবশ্যই দেখা যাবে যে, হিযবুল্লাহ কিভাবে সশস্ত্র যোদ্ধাদের প্রতিহত করে'! কারণ, যারা সেখানে যাওয়ার চেষ্টা করেছে, তারা এখন জেলখানায় বন্দী। যাদেরকে হিযবুল্লাহ বন্দী করেছে' *(ঐ, পৃ. ১১৪ ও ১১৬)*।

উল্লেখ্য যে, সুবহি তুফাইলি হিযবুল্লাহর সাবেক সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। যখন তিনি দেখলেন যে, হিযবুল্লাহ প্রতিরোধ ত্যাগ করে সিরিয়ান ও ইরানী স্বার্থের শুধু সেবক হয়নি, বরং ইসরাইলী উত্তর প্রান্তের সীমানার নিরাপত্তা প্রহরীও বনে গেছে, আর কোনো মুজাহিদ ইসরাইলে হামলা করার চেষ্টা করলে তাকে তারা বাঁধা দেয় ও গ্রেফতার করে। তখন তিনি হিযবুল্লাহ থেকে পৃথক হয়ে যান। ইহুদী এরিয়েল শ্যারন স্বীয় ডাইরিতে লিখেছে, 'দীর্ঘ ইতিহাসে কখনো দেখিনি শী'আদের সাথে ইসরাইলের শত্রুতা রয়েছে' *(শ্যারনের ডায়রি, পৃ.৫৮৩ -এর বরাতে ঐ, পৃ. ১৩৬)*। এ ব্যাপারে শায়খ ইউসুফ আল-কারযাভী বলেন, 'হিযবুল্লাহ নয় হিযবুশ শয়তান। তাইতো আমরা দেখতে পাচ্ছি তথাকথিত ইসলামের খাদেম সিরিয়াতে বাশার আল আসাদের যালিম সরকারের পক্ষ নিয়ে সুন্নীদের বিরুদ্ধে এক ভয়াবহ যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে' *(salafibd.com)*।

আল-কুদস রক্ষা'র বুলি ইরানের এক নিকৃষ্ট তাকিআ নীতি :

সিরিয়া যুদ্ধে আপামর মুসলিম জনতা অনেক বিভ্রান্ত হচ্ছে। তাদের ধারণামতে, ইরান ও হিযবুল্লাহ সহ শী'আ গোষ্ঠী সর্বদা বায়তুল আক্বসা মুক্ত করার জন্য বড় বড় কথা বলে, ইরানের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমাদিনেযাদ ইসরাঈলকে দুনিয়ার বুক থেকে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য হুমকি দেয়, খোমেনী সালমান রুশদীকে হত্যার ফতওয়া দেয়, তাহলে তারা কিভাবে ইসলামবিরোধী হতে পারে? মূল বিষয়টি হ'ল, আসলে 'আল কুদস' রক্ষা ইরান ও হিযবুল্লাহ সহ শী'আদের একটি নিকৃষ্ট তাকিয়া। প্রথমত আমরা জানব তাকিয়া কি? 'তাকিয়া'কে আমরা এক বাক্যে মুনাফেকী বা ধোঁকা দেয়া নীতি বলতে পারি। অন্তরে কোন কথা গোপন রেখে মুখে তার উল্টা বলাকে তাকিয়া বলা হয়। শী'আরা একে নেকীর কাজ মনে করে। শুধু নেকীর

কাজ নয় ছালাত-ছিয়ামের মত ফরয কাজ মনে করে। যেমন ইহসান ইলাহী যহীর (রহঃ) তার 'আশ-শী'আ ওয়াস সুন্নাহ বইয়ে বলেন, শী'আ মুহাদ্দিছ ইবনে কুম্মি তার 'ইতিকাদাত' বইয়ে লিখেছেন, 'তাকিয়া করা ছালাতের মত ফরয। যে ব্যক্তি তাকিয়া করবেনা সে আল্লাহ্‌র দ্বীন থেকে এবং শী'আ আক্বীদা থেকে বের হয়ে যাবে *(আশ-শী'আ ওয়াস সুন্নাহ, ইহসান ইলাহী যহীর, উর্দু অনুবাদ : আতাউর রহমান সাকিব, ইদারা তরজুমানে সুন্নাহ, লাহোর, ১৯৯০, পৃ.১৮৭)*। তাহলে যাদের নিকট মিথ্যার মত মহাপাপ ফরয ইবাদত, তাদের কথা কিভাবে বিশ্বাস করা যায়? এই তাকিয়ার আশ্রয় নিয়েই এরা আলী (রাঃ)-কে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে কুফাতে রাজধানী করতে বলে এবং বিপদের সময় ধোঁকা দেয়। এভাবেই তারা হোসাইন (রাঃ)-কে ধোঁকা দিয়ে হত্যা করে, এই কুফার লোকেরাই ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-কে বিষ পান করিয়ে হত্যা করে, ইমাম বুখারী (রহঃ)-কে তাড়িয়ে দেয় এবং তিনি আল্লাহ্‌র কাছে মৃত্যু কামনা করে দুনিয়া থেকে চলে যান। এই কুফাতেই শী'আসহ সকল জঘন্য ফিরকার উৎপত্তি, এরাই লাখ লাখ হাদীছকে জাল করেছে, এরাই তাশিয়ার আশ্রয় নিয়ে বাগদাদের খলীফাকে ধোঁকা দিয়ে মোঙ্গলদের হাতে বাগদাদকে তুলে দেয়। এরপর তারা সেখানে স্মরণকালের ভয়াবহতম গণহত্যা চালায়। এরাই আবার 'বায়তুল আকছা' রক্ষা করার নামে মুসলিম বিশ্বে সুন্নী নিধন প্রক্রিয়া চালানোর এক ভয়ংকর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। কুদস রক্ষা যে তাদের জঘন্য তাক্বিয়া তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল তাদের বিশ্বাস মতে, বায়তুল আকছা দুনিয়াতে নয় আসমানে অবস্থিত। শী'আদের আল্লামা 'জাফর মুরতাযা আল-আমেলী' তার এই তথ্য প্রচারের কারণে ইরানের প্রেসিডেন্ট আহমাদিনেজাদ নিজে তাকে সম্মানিত করেন! অথচ মিথ্যাচার, অপব্যাখ্যা, মসজিদে আকছা সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়ানো ও আসমানে মসজিদে আকছা বলার কারণে বইটি নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত হওয়ার উপযুক্ত ছিল।

শীআদের মুফাসসির 'আল-ফায়েদ আল-কাশানী' লিখিত 'তাফসীরে সাফি' গ্রন্থে মি'রাজ সংক্রান্ত আয়াত ...سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِه *(বনী ইসরাঈল ১)*-এর ব্যাখ্যায় বলেন, (তার ইসরা হয়েছিল) আসমানে বিদ্যমান মসজিদে আকছা পর্যন্ত, বিভিন্ন বর্ণনা থেকে এটাই প্রমাণিত হয়' *(ফায়েদ আল-কাশানি লিখিত 'তাফসীরে সাফি, ৩/১৬৬-এর বরাতে 'শীআ ও মসজিদে আকছা', তারিক আহমাদ হিজাযী, অনুবাদ : সানাউল্লাহ নাজির আহমাদ, ইসলাম প্রচার ব্যুরো, রাবওয়াহ, রিয়াদ পৃ. ১০)*।

এছাড়া আব্দুল আলী আল-হুওয়াইযী রচিত 'তাফসীরে নুরুছ ছাকলাইন', মুহাম্মাদ ইব্ন আইয়াশ আস-সালামি আস-সামারকান্দী রচিত 'তাফসীরুল আইয়াশী', হাশেম আল-বাহরানি রচিত 'আল-বুরহান ফি তাফসীরিল কুরআন' সহ বিভিন্ন তাফসীর ও হাদীছ গ্রন্থে তারা জোরালোভাবে দাবী করেছে কুদস ফিলিস্তীনে নয় বরং আসমানে। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, এ বিষয়ে ইহুদী ও শী'আ একই আকীদা পোষণ করে। আর হবেই না বা কেন, এই ফিরকার জন্মই তো দিয়েছে ইহুদী আব্দুল্লাহ বিন সাবা। চরম মুসলিম বিদ্বেষী ইহুদীদের কোন লেখা, কিতাব ও গবেষণা পাওয়া যাবে না মসজিদে আকছা সম্পর্কে, যেখানে তারা বায়তুল আকছার পবিত্রতার ব্যাপারে সন্দেহের সৃষ্টি করেনি। যাতে করে মুসলমানদের মাঝ থেকে 'বায়তুল আকছা'র ভালবাসা উঠে যায়। তাহ'লে যারা বাইতুল আকছাকে গুরুত্বহীন করার জন্য পরোক্ষভাবে ইহুদীদের পক্ষে প্রচারনা চালায় তারা কিভাবে বাইতুল আকছা মুক্ত করতে পারে?

২য় প্রমাণ হচ্ছে শী'আ দ্বাদশ ইমামিয়ার নিকট ততক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ নিষিদ্ধ যতক্ষণ তাদের দ্বাদশ ইমাম অদৃশ্য জগত থেকে বের না হয়। এটাই তাদের বিশ্বাস। তাদের কিতাবের ভাষা হচ্ছে, 'ইমামের ঝাণ্ডার পূর্বে যে ঝাণ্ডাই উত্তোলন করা হবে, সেই ঝাণ্ডাধারী হবে তাগুত'। অদৃশ্য জগত থেকে ইমাম বের হয়ে ইয়াহূদী ও নাছারাদের সাথে সন্ধি করবেন, আলে-দাউদের বিধান মতে ফয়ছালা করবেন, কা'বা ধ্বংস করবেন, আহলে-সুন্নাহকে হত্যা করবেন, কারণ তারা শী'আ ইমামিয়াদের দুশমন। আবু বকর ও ওমর (রাঃ)-কে কবর থেকে বের করে তাদেরকে শূলীতে চড়াবেন, অতঃপর তাদেরকে জ্বালিয়ে দিবেন *(كتاب الغيبة للنعماني পৃ.৭০-এর বরাতে 'হিযবুল্লাহ সম্পর্কে কি জানেন?', পৃ. ১০৯)*।

৩য় প্রমাণ হল, তাদের নিকটে মসজিদে আকছার কোন মূল্য নেই। তাদের নিকটে কারবালা ও কুফার মসজিদ মসজিদে আকছার চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। যার প্রমাণ শীআ মতবাদ প্রচারকারী মাসিক পত্রিকা 'আল-মিম্বার' *(ওয়েবসাইট: www.14masom.com/menber)*। এ পত্রিকা ডিসেম্বর ১৯৯৯ইং থেকে শুরু করে কুয়েত সরকারের ২০০৪ইং সনে 'খুদ্দামুল মাহিদ' সংস্থা নিষিদ্ধ করা ও সাহাবীদের গালি দেয়ার অপরাধে ইয়াসির হাবিবকে কারাদণ্ড প্রদানের আগ পর্যন্ত নিয়মিত প্রকাশিত হত। এ পত্রিকায় 'কুদসের পূর্বে কারবালা স্বাধীন কর' শিরোনামে একটি সম্পাদকীয় ছাপা হয়েছিল, তাতে লেখা হয়

কুদসের যত মর্যাদা ও পবিত্রতাই থাক, তা কখনো কারবালার সমপরিমাণ নয়। কুদস কারবালার মত নয়' *(শী'আ ও মসজিদে আকছা, পৃ ৩৬)*। আবার তারাই বায়তুল আকছা মুক্ত করার ব্যাপারে বড় বড় কথা বলে। এতদসত্ত্বেও তারা প্রচার করে যে, কুদসই তাদের প্রথম বিষয় এবং তারা দুর্বল ফিলিস্তীনীদের পক্ষে। তারা মসজিদে আকছাকে মুক্ত করার জন্য যুদ্ধ করবে। তারা কুদসকে সাহায্য করার জন্য একটি দিন নির্ধারণ করে তার নাম রেখেছে 'কুদস দিবস'। কুদসকে মুক্ত করার জন্য একটি বাহিনীর নাম রেখেছে 'জায়শুল কুদস' ও 'ফায়লাকুল কুদস'। কুদসের জন্য একটি সম্প্রচার সংস্থা করেছে, যার নাম 'কুদস সম্প্রচার সংস্থা'। কুদসের জন্য তাদের নির্দিষ্ট একটি পথ রয়েছে, যার নাম 'তারীকুল কুদস'। অথচ আমরা দেখছি সে পথ মোড় ঘুরিয়ে ইরাক ও আফগানিস্তানের দিকে ধাবিত হচ্ছে! আমরা দেখার অপেক্ষায় আছি, ইরানের কোন ব্যক্তি কুদসকে মুক্ত করার জন্য জীবন দেয়! ইহুদীদের সাথে তাদের শত্রুতার দাবী মূলতঃ প্রতারণা, ইসরাইলী রাষ্ট্রের উপর হামলার হুমকি মানুষের চোখে ধুলো দেওয়ার নামান্তর। যেমন ইহুদী সাংবাদিক 'ইউসি মালিমান' বলেন, 'এটা কোনোভাবে সম্ভব নয় যে, ইসরাইল ইরানের পারমাণবিক স্থাপনাসমূহে হামলা করবে, উপরন্তু একাধিক গোয়েন্দা কর্মকর্তা নিশ্চিত করেছে যে, ইরান যদিও কথার মাধ্যমে ইসরাইলের উপর হামলা করে, যা থেকে তার সাথে ইরানের শত্রুতা বুঝা যায়। প্রকৃতপক্ষে ইরানী পারমাণবিক বোমাগুলো আরব রাষ্ট্রসমূহের দিকে তাক করা *(জারীদাতুল আম্বিয়া ৭৯৩১ সংখ্যার বরাতে 'হিযবুল্লাহ সম্পর্কে কি জানেন?', পৃ. ৯৫)*।

আর সত্যি বলতে কি ফিলিস্তীন জয় করেছে উমর (রাঃ)। সুতরাং যারা আক্বীদা ও দ্বীন হিসেবে উমর (রাঃ)-কে লানত করে, গালি দেয়, তার নামে নিরীহ প্রাণীদের বেদম প্রহার করে, যারা বিশ্বাস করে শেষ

যামানায় ইমাম মাহদী উমর ও আবু বকর (রাঃ)-কে কবর থেকে তুলে আগুনে জ্বালিয়ে দিবেন, তারা ফিলিস্তীন মুক্ত করার জন্য জীবন দিবে তা দিবা স্বপ্ন বৈ কিছু নয়। অন্যদিকে রাসুল (ছাঃ) বলেছেন, তায়ালিসা কাপড় পরিহিত ইস্পাহানের ৭০,০০০ হাযার ইহুদী দাজ্জালের অনুসারী হবে *(মুসলিম, হা/৭৫৭৯)*। মজার ব্যাপার হ'ল এই ইস্পাহান শহরটি বর্তমান ইরানের রাজধানী তেহরান থেকে ৩৪০ কিঃমিঃ দূরে অবস্থিত, যা মধ্য ইরানের একটি প্রসিদ্ধ প্রদেশ। সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, যারা দাজ্জালের অনুসরণ করবে তাদের বাসস্থল হবে ইরান। হয় এই ইরানীরাই ইহুদী হয়ে যাবে, বা ইহুদীরা এখানে চলে আসবে বা শী'আদেরকেই পরোক্ষভাবে ইহুদী বলা হয়েছে।

সিরিয়া যুদ্ধের ব্যাপারে সমকালীন উলামাদের ফাতাওয়া :

সিরিয়া যুদ্ধের ব্যাপারে মুসলিম বিশ্বের ১০৭ জন বিদগ্ধ পণ্ডিত একটি বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন। সেই বিবৃতিতে মুসলিম বিশ্ব সহ পুরো দুনিয়ার কাছে মোট ৬টি আবেদন করা হয়। সেখানে তারা সাধারণ নিরীহ জনগণ হত্যা বন্ধ করার জন্য উভয় গ্রুপের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তারা বলেন, আল্লাহর দরবারে হত্যাকারী অবস্থায় উপস্থিত হওয়ার চাইতে নিহত অবস্থায় উপস্থিত হওয়া অনেক শ্রেয়। এ ছাড়াও তারা সারা দুনিয়ার মুসলিমদের কাছে সিরিয়ার সুন্নী মুসলমানদের প্রতি যেভাবে সম্ভব সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আবেদন করেছেন। তা সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে হোক বা নৈতিক সমর্থনের মাধ্যমেই হোক।

বর্তমান পরিস্থিতির বিশ্লেষণ :

উপরে আলোচিত বিষয়গুলোকে সামনে রাখলে বর্তমান সিরিয়া পরিস্থিতির একটা নতুন রূপ আমাদের সামনে দাঁড়ায়। এখানে আমরা সিরিয়ার সকল পক্ষকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি।

সুন্নীপক্ষ : জাবহাতুন নুছরা, ফ্রী সিরিয়ান আর্মী, সৌদী আরব, তুরস্ক এবং ইরান ছাড়া আরব বিশ্বের প্রায় সব দেশ। আমেরিকা, বৃটেন সহ

ইউরোপীয়ান দেশগুলো এই পক্ষ সমর্থন করেছে।

শী'আ পক্ষ : সিরিয়া, ইরান, হিযবুল্লাহ, রাশিয়া ও চীন।

উপরে উল্লেখিত সকলের লক্ষ্য এক হলেও উদ্দেশ্য এক নয়। যেমন সোভিয়েত ইউনিয়ন বিরোধী যুদ্ধে মুজাহিদ ও আমেরিকার লক্ষ্য এক থাকলেও উদ্দেশ্য আলাদা ছিল। শুধু আলাদা নয় আমেরিকা মুজাহিদদের উদ্দেশ্যের বিরোধীও ছিল, যা কখনই অস্পষ্ট ছিল না। উভয়ের লক্ষ্য ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের পরাজয়, কিন্তু উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে মুজাহিদদের চাওয়া ছিল ইসলাম প্রতিষ্ঠা, অন্যদিকে আমেরিকার চাওয়া ছিল সুপার পাওয়ার হওয়ার স্বপ্ন পূরণে একমাত্র বাধাকে দূরীভূত করা। ফলত যুদ্ধ জয়ের পর মুজাহিদরা তাদের নিজ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করলে তাদের এক সময়ের মিত্র আমেরিকাই স্বমূর্তি ধারণ করে তাদের ঘোর বিরোধী হয়ে দাঁড়ায়। ঠিক অনুরূপভাবে বর্তমান সিরিয়াতে বাশার আল-আসাদের পক্ষে লড়াইরত সকল পক্ষের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একই। কিন্তু বাশার আল আসাদের বিপক্ষে লড়াইরতদের লক্ষ্য এক হলেও উদ্দেশ্য আলাদা আলাদা। তথা শী'আ পক্ষের সকলের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হচ্ছে বাশার আল-আসাদের মসনদ অক্ষুণ্ণ রাখা ও সুন্নী নিধন করতঃ শী'আদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ আশংকামুক্ত করা। আর সুন্নী পক্ষের মধ্যে আমেরিকাসহ অন্যান্য ইসলাম বিরোধী শক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে সিরিয়াকে অস্থিতিশীল করার মাধ্যমে সিরিয়াকে বিভক্তির দিকে ঠেলে দেওয়া। এছাড়াও এই যুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করার মাধ্যমে ইরান ও সউদী আরবের মদদপুষ্টদের লড়াইকে সরাসরি ইরান-সউদী আরব লড়াইয়ে পরিণত করা এবং ইসরায়েলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। তাইতো সে বন্ধ করার সমর্থ থাকা সত্ত্বেও এই যুদ্ধকে ইচ্ছাকৃতভাবে দীর্ঘায়িত করছে। বাশার আল-আসাদের বিরোধিতা করলেও তাকে হটানোর জন্য বিদ্রোহীদের পর্যাপ্ত কোন সাহায্য আমেরিকা করেনি। এ দ্বিমুখী নীতিই তার উদ্দেশ্যকে পরিষ্কার করেছে। অন্য দিকে 'ফ্রী সিরিয়ান আর্মী' দীর্ঘদিনের বাশার শাসনের অবসান চায়। সউদী আরবের উদ্দেশ্য কিছুটা ওপেন সিক্রেট। কেননা সউদী আরবের সাথে ইরানের ভূরাজনৈতিক দ্বন্দ্ব বহু দিনের। আর এটা যে মাযহাবগত কারণেই তা ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। যেমন কিছু দিন আগে বাহরাইনের শী'আ বিদ্রোহ দমনের জন্য সউদী আরব সরাসরি সেনা অভিযান চালিয়েছিল। অন্যদিকে ইরান বিদ্রোহীদের সর্বাত্মক সহযোগিতা দান করতঃ এই অভিযানের ব্যাপারে কড়া ভাষায় নিন্দা জানিয়েছিল। ঠিক অনুরূপভাবে ইরাকের নুরী আল-মালেকীর শী'আ প্রশাসনকে সউদী আরব কখনো মেনে নেয়নি, কিন্তু ইরান সুগভীর সম্পর্ক স্থাপন করেছে। তাই তো ইরাকে নিযুক্ত মার্কিন সাবেক রাষ্ট্রদূত ক্রিস্টোফার হিল অভিযোগ করেছেন, ইরাকের সহিংসতায় মদদ রয়েছে প্রতিবেশী সউদী আরবের। ক্রিস্টোফার হিল গোয়েন্দা সূত্রের বরাত দিয়ে গোপন বার্তায় আরও জানান, সউদী আরব ইরাকের প্রধানমন্ত্রী নূরী আল-মালিকির সরকারকে অস্থিতিশীল করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে *(আমারদেশ অনলাইন, ১৩/৮/২০১৩)*।

সুতরাং সিরিয়াতে শী'আ শাসনের পতন ঘটিয়ে ইরানকে কোনঠাসা করাই সউদী আরবের আসল উদ্দেশ্য। 'জাবহাতুন নুছরা'সহ অন্যান্য মুজাহিদ গ্রুপগুলোর উদ্দেশ্যও কিছুটা অভিন্ন। বাশারের পতনের সাথে সাথে তারা সেখানে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তাদের এই উদ্দেশ্যের ভিন্নতার কারণেই তারা আমেরিকার সাহায্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অন্যদিকে তুরস্ক সহ ইখওয়ানপন্থী গ্রুপের উদ্দেশ্যও বাশারের পতন ঘটানো হলেও তারা কট্টর ইসলামপন্থীদের ক্ষমতায় দেখতে চায়না। এই হিসেবে তুরস্ক ও সউদী আরবের দ্বন্দ্বও ইতিমধ্যে সামনে এসেছে। আর মিসরের ঘটনাও সউদী আরবের সাথে ইখওয়ানপন্থীদের দূরত্বের প্রমাণ বহন করে। ধারণা করা হয় যে, মিসরের ইখওয়ান সরকার ক্ষমতায় আসার পরে ইরানের সাথে সম্পর্ক ভাল করার যথেষ্ট উদ্যোগ নেয়, যা সউদী আরব মোটেও সুদৃষ্টিতে নেয়নি। যাইহোক বিদ্রোহী পক্ষগুলোর এই উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা তাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলতঃ বাশার আল-আসাদের শক্তিশালী জোটের সামনে তারা শক্তভাবে দাঁড়াতে পারছেনা। এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, সিরিয়ার ক্ষমতাসীন দল 'বাথ পার্টি' একটি সমাজতান্ত্রিক দল। অন্যদিকে যারা বিদ্রোহ করছে তাদের দাবী আনুযায়ী তারা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চায়। আর ইরানের দাবী আনুযায়ী ইরান একটি ইসলামী দেশ। সেই হিসেবে ইরান বিদ্রোহীদের সাহায্য করবে এমনটাই হওয়া ছিল স্বাভাবিক, যেমন তারা বাহরাইনে বিদ্রোহীদের ইসলামের নামে সর্বাত্মক সাহায্য ও সহযোগিতা করেছিল। কিন্তু এখানে ঘটল একদম উল্টা। সহযোগিতা অনেক দূরে থাক তারা এখানে বিদ্রোহীদের দমনের জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। তাদের এই অবস্থানের জন্য আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, বরং যদি আরো কিছু প্রশ্ন সামনে নিয়ে এসে গভীরভাবে ভাবা যায় তাহ'লে বর্তমান বিশ্ব রাজনীতির অনেক গোপন জিনিস আমাদের সামনে বেরিয়ে আসবে। **প্রথমতঃ** এটা একটি সর্বজন স্বীকৃত বিষয় যে, দুশমন এক হলে বন্ধুত্ব হয়। যেমন আমাদের দেশে এরশাদের বিরোধিতায় জামায়াতে ইসলামী ও আওয়ামী লীগের মত চিরশত্রু একই প্ল্যাটফর্মে

দাঁড়াতে পেরেছিল। কেননা এখানে তাদের উভয়েরই দুশমন এক ছিল। তাই তারা তাকে দমনের জন্য জোটবদ্ধ হয়েছিল। ঠিক বিশ্ব রাজনীতিতে আমরা দেখতে পাই আল-কায়েদা ও তালেবান আমেরিকা ও ইসরায়েলের ঘোর শত্রু। ইরান ও হিযবুল্লাহর বাহ্যিক সম্পর্ক দেখলেও তাই মনে হয় যে, এরাও আমেরিকা ও ইসরায়েলের চরম শত্রু। তাহলে সেই হিসাবে ইরান, হিযবুল্লাহ, আল-কায়েদা ও তালেবানের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বর্তমানে সিরিয়াতে ইরান ও হিযবুল্লাহ আল-কায়েদা ও তালেবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। তাহ'লে কি তাদের শত্রু এক নয়? এদের কোন এক পক্ষ কি আমেরিকা ও ইসরাঈল বিরোধী হওয়ার দাবীতে মিথ্যা?

দ্বিতীয়তঃ দীর্ঘ ইরাক-ইরান যুদ্ধ প্রমাণ করে যে, ইরান ও সিরিয়া ইরাকের শত্রু তথা তৎকালীন শাসক সাদ্দাম হোসেনের ঘোর শত্রু। শুধু শত্রু নয় তারা সুযোগ পেলে সাদ্দামকে ফাঁসিতে ঝুলাতো। অন্যদিকে দীর্ঘ ইরাক-আমেরিকা যুদ্ধ এমনকি আমেরিকা কর্তৃক সাদ্দামের ফাঁসি এটাই প্রমাণ করে যে, আমেরিকাও সাদ্দামের শত্রু। সুতরাং এখানে দুই জনের শত্রুই সাদ্দাম। সেই হিসেবে তাদের মাঝে বন্ধুত্ব না থাকাটা অস্বাভাবিক। যার প্রমাণ বর্তমান নূরী আল-মালিকির

শী'আ তাঁবেদার সরকার নিয়ে উভয় পক্ষই সন্তুষ্ট। শুধু তাই নয় ঈদুল আযহার দিন সাদ্দামের ফাঁসি পুরো মুসলিম বিশ্বকে কাঁদালেও শী'আরা যে খুশি হয়েছিল তা নিশ্চিত।

তৃতীয়তঃ বিদ্রোহীদের বিপক্ষে যুদ্ধরত ইরানে আজ থেকে প্রায় তিন দশক পূর্বে আলী খামেনী তাদের দাবী মতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেন। ঠিক তেমনি বিদ্রোহীদের পক্ষে যুদ্ধরত আল-কায়েদা ও তালেবান আফগানিস্থানে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে। ইরান শুরু থেকে আমেরিকা ও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে উচ্চবাচ্য করলেও তাদের শাসন এখনো টিকে আছে। অন্য দিকে তালেবানরা এ ব্যাপারে কোন হুমকি-ধমকি না দিলেও সাজানো নাটকের মাধ্যমে তাদের পতন ঘটানো হয়। আলী খামেনী বহাল তবিয়তে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন, অন্যদিকে পাকিস্তানের সার্বভৌমত্বকে লঙ্ঘন করে হামলার নাটক সাজিয়ে ওসামা বিন লাদেনকে হত্যা করা হয়। উভয়ে ইসলামপন্থী হওয়ার পরেও ইসলাম বিরোধীদের তাদের সাথে এ বৈরী আচরণের কারণ কি?

চতুর্থতঃ এক সময় ইরাককে ইসরায়েলের জন্য হুমকি মনে করা হত। আর এখন ইরানকে ইসরায়েলের জন্য হুমকি মনে করা হচ্ছে। কিন্তু একদিকে যেমন ইসরায়েলের একসময়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রী লিপি জিভনি মোসাদের গোয়েন্দা থাকা অবস্থায় তার নেতৃত্বে ইরাকের পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা চালিয়ে ধ্বংস করে দেয়। এমনকি মিথ্যা অভিযোগ তুলে ইরাককে তছনছ করে দেয়া হয়। অথচ ইরানের সাথে এই রূপ কিছু করা হয়নি। অন্যদিকে দু'জনই যদি ইসরায়েলের শত্রু হবে তাহ'লে তারা আবার পরস্পর লড়াই কেন করল? এই লড়াইয়ে যদি ইরাক দুর্বল হয়ে থাকে তাহ'লে এই দুর্বলতায় পরবর্তীতে কার ফায়দা হয়েছে?

উপরের আলোচনাকে সামনে রাখলে এ কথা দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যায় যে, আজ ইহুদী, খ্রীস্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু, শী'আ সহ সবাই মূলধারার মুসলমানদের শেষ করার জন্য আদাজল খেয়ে লেগেছে। তাদের এই ইসলামবিদ্বেষী প্রক্রিয়ার একটা অংশ হিসেবে আজ মুসলিম মায়ের আহাজারিতে, মাসুম শিশুর বুকফাঁটা চিৎকারে, লাখো ভাইয়ের পঁচা লাশের গন্ধে সিরিয়ার আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। বাশার আল-

আসাদ বাহিনী ও হিযবুল্লাহর বুলেটের গুলি ও বেয়নটের উন্মত্ত ফলা নিরীহ মুসলমানদের লাশ কুকুর শিয়ালের মত মরু বিয়াবনে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। আজ তারা চারিদিকে অন্ধকার দেখছে। এই অসহায় মযলুম মুসলমানদের সাহায্য করার কি কেউ আছে? উল্লেখ্য যে, এখানে দু'টি প্রশ্ন আসতে পারে-

১. তাহ'লে ইসরায়েলের সাথে ইরানের এই বাহ্যিক দ্বন্দ্বের কারণ কি?

২. আমেরিকা কেন তাহ'লে বাশারের বিরুদ্ধে সিরিয়াতে হামলার কথা বলছে?

প্রথমটির কারণ হচ্ছে, ইরানকে বীর মুজাহিদ বানানোর মাধ্যমে শী'আ মাযহাব প্রচারের সুযোগ করে দেয়া। এইভাবে ইরানের জনসমর্থন বাড়লে সে মুসলিম বিশ্বের আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব হাসিল করে নিতে পারে যা সবসময় মক্কা-মদীনার শাসকদের হাতে থেকেছে। তখন মুসলিম নিধন আরো সহজতর হবে। যদি মুসলমানদের ইরানমুখী বানানো যায় এবং সঊদীসহ অন্য সুন্নী আরবদেশগুলোর লেজুড়বৃত্তিকে পুঁজি করে তাদের প্রতি ঘৃণা তৈরী করা যায়, তাহ'লে ঐ দেশগুলো আক্রমণের সময় বা ইরানকে দিয়ে যেভাবে ইরাককে শেষ করা হয়েছে সেভাবে সঊদীকেও শেষ করার সময় মুসলমানদের এ সেন্টিমেন্টকে কাজে লাগানো যাবে।

আর দ্বিতীয় প্রশ্নের ক্ষেত্রে একটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে, তা হচ্ছে ইসলামবিরোধীদের দুশমন মূলতঃ তাওহীদপন্থী জনতা। যেমন আমাদের সরকার যদি ইসলাম বিরোধী হয় এবং তাওহীদপন্থী জনতার উপর অত্যাচার চালায় তাহ'লে প্রথমতঃ ইসলাম বিরোধী শক্তির আমাদের দেশ আক্রমণের প্রয়োজন হবেনা। তারপরেও যদি হামলা করে তাহ'লে তার লক্ষ্য কখনো আমাদের সরকার হবেনা বরং তাওহীদপন্থী জনতা হবে। ঠিক অনুরূপ আমেরিকা যদি সিরিয়া আক্রমণ করে তাহ'লে তার উদ্দেশ্য বাশার আল-আসাদ ও তার গোত্র হবে এটা একটা হাস্যকর ব্যাপার। কেননা তারা তো মোট জনতার মাত্র ১০%। সুতরাং ৯০% তাওহীদপন্থী জনতাকে শেষ করার জন্য আমেরিকা সিরিয়া আক্রমণ করবেনা এটাই অস্বাভাবিক বরং করাটাই স্বাভাবিক। হ্যাঁ, আমেরিকার কাজ যদি বাশার আল-আসাদ নিজেই সম্পন্ন করে তাহ'লে হয়তোবা প্রয়োজন পড়বেনা। পরিশেষে শী'আদের চক্রান্ত থেকে সাধারণ মুসলিম জনতাকে সতর্ক করা আমাদের প্রত্যেকেরই ঈমানী দায়িত্ব। সাথে সাথে সিরিয়ার মযলুম জনসাধারণ যালিমদের হাত থেকে রক্ষা করাও আমাদের দায়িত্ব। কিছু না পারলে অন্ততপক্ষে হৃদয়ের গহীন থেকে তাদের জন্য দো'আ তো করতে পারি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন এবং পথভ্রষ্ট, যালিমদেরকে সুমতি দিন আমীন!

[লেখক : শেষ বর্ষ, দাওরায়ে হাদীছ বিভাগ, দারুল উলূম দেওবন্দ, সাহারানপুর, উত্তর প্রদেশ, ইণ্ডিয়া]

পিতা-মাতার উদ্দেশ্যে মারয়াম জামীলা-এর খোলা চিঠি

-কে.এম. রেযওয়ানুল ইসলাম

ভূমিকা :

['পরশপাথর' বিভাগে আমরা সচরাচর কোন বিখ্যাত অমুসলিমের ইসলাম গ্রহণের কাহিনী ও কারণ আলোকপাত করে থাকি। এরই ধারাবাহিকতায় ইতিপূর্বে মারয়াম জামীলার জীবনীও প্রকাশিত হয়েছে। তবে আজকের আয়োজন কিছুটা ভিন্ন। এ সংখ্যায় আমরা মারয়াম জামীলার একটি খোলা চিঠি অনুবাদ করলাম যা তিনি তার আমেরিকান বয়োঃবৃদ্ধ পিতা-মাতার উদ্দেশ্যে লিখেছেন। এই চিঠির মাহাত্ম্য হ'ল, এতে তিনি অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্যরূপে আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজে ইসলামের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং অন্য সব ধর্ম ও মতবাদের উপর ইসলামের শাশ্বত বিজয়ের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন তার স্বভাবসুলভ ও ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে। আমাদের আশা এই তত্ত্বীয় পত্র 'তাওহীদের ডাক'-এর পাঠকদের চিন্তার নতুন দুয়ার খুলে দিবে এবং ইসলামের সার্বজনীনতা ও বিশুদ্ধতা সম্পর্কে তাদের আরো সচেতন করে তুলবে। -অনুবাদক]

প্রিয় মা ও বাবা,

আমি পাকিস্তানে বসবাস করছি ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। যখন আপনারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রিয়জনদের নিয়ে গড়া এমন এক পরিবার পেয়েছেন, যা আপনাদের সুখ-শান্তিকে অনেকখানি বৃদ্ধি করেছে। আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে আপনারা আজ পরিণত বয়সে উপনীত হয়েছেন এবং স্বাস্থ্যপ্রদ দীর্ঘ জীবন লাভ করেছেন। যা আমার প্রত্যাশার চেয়েও অনেক বেশি। আপনারা ইতোমধ্যে আমার লেখা সব বই এবং ইসলামী সাহিত্য নিশ্চয়ই পড়েছেন, যেগুলো আমি প্রশস্ত হৃদয়ে ও খোলা মনে আপনাদের নিকট পাঠিয়েছি। সুতরাং এখন যে বিষয়টা নিয়ে আলোকপাত করতে যাচ্ছি তার ভূমিকা দেয়া নিষ্প্রয়োজন বলে মনে করছি এবং আমার কথাগুলো কোনভাবেই আপনাদের কাছে আশ্চর্যজনক বা নতুন বলে মনে হবে না।

যদি অনুধাবন করতে পারতেন যে, আপনারা কতটা সৌভাগ্যবান, তবে নিশ্চিতভাবেই বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়তেন। কত লম্বা সময় ধরে শারীরিকভাবে সুস্থ ও সবল আছেন এবং নিজেরাই নিজেদের যত্ন নিতে পারছেন। কিন্তু কখনো কি দীর্ঘস্থায়ী জটিল রোগ ও বার্ধক্যের অভিশাপে জর্জরিত সেই সব শত শত, হাযার হাযার আমেরিকানদের কথা ভেবে দেখেছেন, যারা উপচে পড়ে হাসপাতাল, ক্লিনিক, (যেগুলো আসলে এক একটি মর্গ) বৃদ্ধাশ্রম এবং মানসিক চিকিৎসাকেন্দ্রের বয়স্ক ওয়ার্ডগুলোতে প্রতিনিয়ত ভিড় করছে? একটি বারও কি সেই সব অসংখ্য বৃদ্ধাদের কথা চিন্তা করেছেন যারা বিধবা, যারা তাদের দুর্বিষহ একাকীত্ব জীবন অতিবাহিত করছেন অন্ধকার কুটিরে আবদ্ধ হয়ে এবং যারা নিত্য আতঙ্কগ্রস্থ থাকেন ছিনতাই, ডাকাতি আর শারীরিক আক্রমণের, যা সাধারণত তরুণ সন্ত্রাসীদের দ্বারা সংঘটিত হয়ে থাকে। যারা এই সকল অসহায়, হীনবল বৃদ্ধাদের শিকার করে বিন্দুমাত্র অনুশোচনা বা শাস্তির ভয় না করেই? পারিবারিক বন্ধন ও যৌথ পরিবার ভেঙ্গে পড়ার প্রত্যক্ষ ফল হ'ল প্রবীণদের প্রতি এরূপ অমানবিক দুর্ব্যবহার। আপনারা অবশ্যই জানেন, যে সমাজে আপনারা বেড়ে উঠেছেন এবং সমস্ত জীবন অতিবাহিত করেছেন তা আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান সভ্যতার পতনের সাথে ১ম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বাবস্থার সুস্পষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে, যে সময় স্বল্প কিছু বুদ্ধিজীবি এবং শিল্পী ছাড়া খুব কম মানুষই কী ঘটতে যাচ্ছে সে ব্যাপারে সচেতন ছিল। কিন্তু ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিশেষ করে বিগত দুই দশকে সভ্যতার এই পতন এতটাই বেড়েছে যে, তখন কারও পক্ষেই তা উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। স্বীকৃত, নির্ধারিত, আদর্শ আচার-ব্যবহারের বিপরীতে চরম নৈতিক অধঃপতন, গণমাধ্যমে প্রচারিত বিকৃত যৌনাচারের প্রতি আসক্ত, প্রবীণদের প্রতি অসদ্ব্যবহার, নতুন প্রজন্মের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিবাহ বিচ্ছেদের হার, বিরল হয়ে পড়া দীর্ঘস্থায়ী সুখী পরিবার, শিশু নির্যাতন, প্রাকৃতিক পরিবেশ ধ্বংস, দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান সম্পদের অপচয়, মানসিক ব্যাধি ও যৌনব্যাধির মহামারী আকার ধারণ, মাদকাসক্ততা, সুরাসক্ততা, আত্মহত্যা, সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য, অনিয়ম ও দুর্নীতি, বর্বরতা, আইন অবমাননা এই সব কিছুর জন্যই একটি অভিন্ন কারণ দায়ী। আর তা হ'ল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও বস্তুবাদের চূড়ান্ত ব্যর্থতা এবং সুনির্ধারিত ও সর্বোৎকৃষ্ট ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের অভাব। কারণ এই মতটি সর্বস্বীকৃত যে, যদি কোন কাজের উদ্দেশ্য বা নিয়ত সঠিক না হয়, তবে তার পরিণামও হয় মন্দ।

নিঃসন্দেহে আপনারা বিরক্ত হচ্ছেন এবং এই চিঠি পড়তে একঘেঁয়েমি লাগছে। তাছাড়া আপনি আপত্তি তুলতে পারেন, যদিও আপনারা কেউই ধর্মতত্ত্ববিদ, দার্শনিক বা সমাজবিজ্ঞানী নন, তবে কেন এমন গুরুগম্ভীর বিষয় আলোচনা করে অহেতুক জ্বালাতন করছি, যখন এগুলোর সাথে আপনাদের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। সর্বোপরি আপনারা যেমনটা চেয়েছেন ঠিক তেমনি সুখী ও পরিতৃপ্ত জীবন-যাপন করছেন এবং বাকি জীবনটুকুও এইভাবে উপভোগ করাই হয়ত আপনাদের একমাত্র কামনা। আমাদের জীবনযাত্রা যদি একটি হয় এমন, তবে এটা কি চরম বোকামি নয় যে, জীবনকে আমরা শুধু আনন্দদায়ক ও আরামদায়ক পথচলা হিসাবে বিবেচনা করব এবং যাত্রার পরিসমাপ্তি নিয়ে একদমই চিন্তা-ভাবনা করব না? কেন আমরা জন্মেছি? জীবনের প্রকৃত অর্থ এবং উদ্দেশ্যই বা কী? কেন আমাদেরকে অবধারিতভাবে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে এবং মৃত্যুর পর আমাদের প্রত্যেকেরই বা কী পরিণতি ঘটবে?

বাবা আপনি আমাকে একাধিকবার বলেছেন, আপনি প্রচলিত কোন ধর্ম গ্রহণ করতে পারেন না। কারণ আপনাকে বোঝানো হয়েছে যে, ধর্ম ও আধুনিক বিজ্ঞান পরস্পর সাংঘর্ষিক। বস্তুত, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আমাদের বস্তুগত বিশ্বের অনেক অজানা তথ্য জানিয়েছে, পর্যাপ্ত আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করেছে এবং অনেক মারাত্মক রোগের প্রতিকার আবিষ্কার করেছে। কিন্তু বিজ্ঞান জীবন ও মৃত্যুর প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা করেনি বা করতে পারেনি। বিজ্ঞান বলে-'কিভাবে ঘটে'। কিন্তু 'কেন ঘটে'-তার উত্তর বিজ্ঞান কখনোই দিতে পারে না। বিজ্ঞান কি নিশ্চিতভাবে জানাতে পারে কোন্‌টি ঠিক এবং কোন্‌টি বেঠিক? কোন্‌টি ভাল এবং কোন্‌টি মন্দ? কোন্‌টি সুন্দর এবং কোন্‌টি কুৎসিত? এবং এমন কেউ কি আছে, যার নিকট আমাদের সমস্ত কৃতকর্মের জবাবদিহি করতে হবে? (মানব হৃদয়ে জন্ম নেয়া) এ সকল চিরন্তন প্রশ্নের সদুত্তর একমাত্র ধর্মই দিতে পারে। চূড়ান্ত ধ্বংস ও পতনের পূর্বে প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের যে করুণ অবস্থা হয়েছিল তার সাথে আজকের আমেরিকার বহু মিল লক্ষণীয়। চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ ইতিমধ্যে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন যে, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ একটি সুশৃঙ্খল সমাজ বিনির্মাণের মজবুত ভিত্তি গঠনে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে তারা উদ্বিগ্নভাবে অন্য কোন পথনির্দেশের সন্ধান পেতে উন্মুখ হয়ে আছেন। কিন্তু কোথায় তা পাওয়া সম্ভব তা তাদের অজানা। ব্যাপারটি শুধুমাত্র কতিপয় সমাজ বিজ্ঞানীদের সাথেই সংশ্লিষ্ট নয়। জাতীয় বিভাজনের এই ব্যাধি আমাকে, আপনাদেরকে এবং আমাদের প্রত্যেককেই আক্রান্ত করছে।

প্রাচীন রোম সাম্রাজ্য তার সংকটপূর্ণ অবস্থা হতে পরিত্রাণ পেতে খ্রিষ্টান ধর্মের আশ্রয় নেয় এবং তার ফলে প্রায় এক সহস্র বছরেরও অধিক কাল ব্যাপী ইউরোপ শাসন করে গির্জা। গির্জার শাসন তৎকালীন রোমের অসংখ্য সামাজিক ও নৈতিক অধঃপতনের অবসান ঘটায় এবং মানুষের নৈতিক ও আত্মিক গুণাবলীর মানদণ্ডকে অনেক উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত করে। দুর্ভাগ্যজনক ভাবে গির্জা তার গৌরবময় ইতিহাস সৃষ্টির সময়েই পৌত্তলিকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সাথে আপোস করে ফেলে। এছাড়া গির্জা বিশাল যাজক সম্প্রদায় এবং এমন এক দুর্বোধ্য ধর্মতত্ত্ব বেছে নেয় যা রেনেসাঁর প্রভাব, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পুনর্জাগরণ এবং ফরাসী বিপ্লবের প্রগতিবাদকে প্রতিরোধ করতে পারেনি। বর্তমানে ইউরোপীয় এবং আমেরিকান খ্রিষ্টানরা যেখানে গণহারে তাদের বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে এবং গির্জা ত্যাগ করছে, তখন মিশনারীরা এশিয়া ও আফ্রিকায় পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ ও শোষণের জয়গান ঘোষণা করছে। খ্রিষ্টানদের পর ইহুদীরা বর্তমানে আমেরিকার ২য় বৃহত্তম ধর্মীয় গোষ্ঠী যারা আমেরিকার রাজনীতি, অর্থনীতি এবং প্রচার মাধ্যমকে ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে। কিন্তু ইহুদিরা এতই সংকীর্ণমনা যে, ধর্মান্তরিত নব্য ইহুদিদের তারা কদাচিৎ স্বাগত জানিয়ে থাকে। এটা বিশ্বজনীন ধর্ম নয় এবং তা হওয়া কখনো সম্ভবও নয়। 'ইহুদীবাদী আন্দোলন' হল ইহুদী জাতীয়তাবাদ এবং তাদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির এক নগ্ন প্রকাশ, যার ফলশ্রুতিতে মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাঈল নামক ভুঁইফোড় রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হয়েছে। ফিলিস্তীনে ইসরাঈলীদের দ্বারা সংঘটিত ভয়াবহ নৃশংসতা, লেবানন ও তার আশেপাশের এলাকায় চালানো অবর্ণনীয় আগ্রাসন, ফিলিস্তীনী আরবদের গণহত্যা এবং তাদের সকল মানবিক ও রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা সংকীর্ণ ইহুদীবাদের দুঃখজনক ফলাফল। এ জন্যই গোঁড়া ইহুদী পুরোহিতগণ কখনোই স্বীকার করে না যে, ইসরাঈল কোন পাপ করতে পারে এবং আশ্চর্যজনকভাবে তারা ইসরাঈলের সমস্ত কাজেই সমর্থন যোগান। এই সুস্পষ্ট নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক ত্রুটিগুলোই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইহুদী ধর্মকে ভবিষ্যতের ধর্ম হিসাবে অযোগ্য করেছে। বর্তমানে মুসলিমরা আমেরিকার তৃতীয় বৃহত্তম এবং সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল জাতি। ইসলাম আজ শুধু এশিয়া ও আফ্রিকার সুদূর অরণ্য ও মরুভূমি অঞ্চলগুলোতে সীমাবদ্ধ নেই। আমেরিকাতেও ইসলাম আজ সুপরিচিত। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে ৩০ লাখেরও বেশি মুসলিম বাস করছেন এবং তাদের সংখ্যা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। মুসলিম রাষ্ট্রগুলো থেকে আসা হাযার হাযার ছাত্র আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে অধ্যয়ন করছে এবং সুশিক্ষিত ও উচ্চ প্রশিক্ষিত মুসলিমরা পেশাতে নিয়োজিত আছে। বিগত দুই দশকে শত শত আমেরিকান বংশোদ্ভূত নওমুসলিম তাদের সামাজিক মর্যাদার যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়েছে। প্রথম দিকে অধিকাংশ নওমুসলিম কৃষ্ণাঙ্গ ছিল, যারা ইসলামের ছায়াতলে খুঁজে পেয়েছিল সম্মান, স্বীকৃতি, আত্মমর্যাদা আর জাতিগত ভ্রাতৃত্ব যেমনটা পেয়েছিলেন ম্যালকম এক্স। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অধিক সংখ্যক ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত শ্বেতাঙ্গরা তাদের দুর্বিষহ জীবনের উত্তপ্ত জ্বালা হতে মুক্তির পথ অনুসন্ধান করতে করতে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিচ্ছে, যদিও এতে তাদের অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার করতে হচ্ছে এবং অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে। তাদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যকই আমার মত সৌভাগ্যবান, যারা আপনাদের মত স্নেহশীল পিতা-মাতা পেয়েছে। ইসলাম গ্রহণের ফলে অধিকাংশ নওমুসলিমদের সাথে তাদের অমুসলিম বাবা-মা এবং আত্মীয়-স্বজনের চরম বিরোধ ও দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। যাই হোক , গির্জা ও সিনাগগ দিন দিন প্রায় সম্পূর্ণরূপে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। কিন্তু নতুন নতুন মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টার আমেরিকার প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ শহরে বন্দরে দ্রুত গড়ে উঠছে। মজার ব্যাপার হল, অধিকাংশ আমেরিকান নওমুসলিমরা বয়সে তরুণ এবং তারা বুদ্ধিমান ও সুশিক্ষিত। কিন্তু কী এই অধিক সংখ্যক আমেরিকানদের ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করছে?

প্রকৃতপক্ষে, তরুণ, বৃদ্ধ সব বয়সের আমেরিকান আজ উন্মত্ত হয়ে মুক্তির উপায় অনুন্ধান করছে। জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে তারা বুঝতে পেরেছে, যে ব্যক্তি-স্বাধীনতা তারা উপভোগ করে তা সম্পূর্ণ অর্থহীন এবং আত্মবিধ্বংসী যাতে না আছে কোন সঠিক দিকনির্দেশনা আর না আছে কোন উপকার। বাস্তবিকই, আমেরিকানদের ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে ধর্ম-নিরপেক্ষতাবাদ ও বস্তুবাদ গঠনমূলক ও যথার্থ মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। আর ইহুদী ও খ্রিষ্টান ধর্মও এক্ষেত্রে সফল হতে পারেনি। তাই দলে দলে মুক্তিকামী মানুষ আজ স্বভাবধর্ম ইসলামে ফিরে আসতে বাধ্য হচ্ছে। ইসলামে এসে তারা পরিপূর্ণ সুস্থ, সুন্দর, সৎ ও স্বচ্ছ জীবনাদর্শের সন্ধান পাচ্ছে। মুসলিমদের কাছে মৃত্যুই সব কিছুর পরিসমাপ্তি নয়। মুসলিমরা অধীর আগ্রহে চেয়ে থাকে এক শাশ্বত-পূর্ণাঙ্গ সুখী ও আনন্দময় জীবনের দিকে (যা আছে পরকালে)। কুরআনে আল্লাহ প্রদত্ত পথনির্দেশ এবং পূতপবিত্র নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) এর অমূল্য বাণী ও কর্ম শুধুমাত্র প্রাচ্যের কিছু মানুষের জন্যই অনুকরণীয় আদর্শ নয়। বরং এই আসমানী পথনির্দেশে আজকের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ, অস্থিতিশীল পশ্চিমা সমাজের সকল অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক সমস্যারও সুন্দর সমাধান রয়েছে। উপরন্তু ইসলাম কোন গতিহীন, শীতল, নিস্পৃহ ও নৈর্ব্যক্তিক জীবনব্যবস্থার নাম নয়। মুসলিমরা এক আল্লাহ্র প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী যিনি শুধু সৃষ্টি করেননি বরং এই মহাবিশ্ব প্রতিপালন ও শাসন করছেন। যিনি আমাদের প্রত্যেককে ভালবাসেন এবং সবকিছুর নিয়তি নির্ধারণ করেন। পবিত্র কুরআন মনে করিয়ে দেয় যে, আল্লাহ আমাদের ঘাড়ের শাহরগ অপেক্ষাও অতি নিকটতর। যেহেতু কুরআন আল্লাহ্র কালাম, তাই তা কখনোই পরিবর্তিত হবে না। এটা এক পূর্ণাঙ্গ বিধান যার সংশোধন, পরিমার্জন বা পরিবর্ধন করা অসম্ভব। আর মুহাম্মাদ (ছাঃ) যেহেতু শেষ নবী, তাই অন্য কোন মতবাদ তাঁর আদর্শের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। কুরআন ও সুন্নাহ পাশ্চাত্য কিংবা প্রাচ্য সকল দেশের সকল বর্ণের বনু আদমের প্রতি প্রেরিত হয়েছে। কাজেই তা সর্বযুগে এবং সর্বাবস্থায় সমভাবে প্রযোজ্য যা কোনমতেই সেকেলে, অবৈজ্ঞানিক বা অনুপযুক্ত বলে পরিগণিত হতে পারে না। আপনারা দুজনেই ইতিমধ্যে বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন এবং আপনাদের হাতে খুব একটা দীর্ঘ সময় হয়ত নেই। তথাপি এখনও সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ হারিয়ে যায়নি। যদি আপনাদের মতামত হ্যাঁ-সূচক হয়, তবে পাকিস্তান প্রবাসী এই তনয়ার সাথে আপনাদের রক্ত সম্পর্কের সাথে সাথে বিশ্বাসের সম্পর্কও যুক্ত হবে। আর তখন আমরা শুধু ইহকালেই নয় বরং পরকালের প্রতি ভালবাসাপূর্ণ চিরস্থায়ী জীবনযাপন করতে পারব। আর যদি আপনাদের সিদ্ধান্ত না-সূচক হয়, তবে আমি অত্যন্ত শঙ্কিত যে, অচিরেই আপনাদের এই সুখী, আনন্দদায়ক ও আরামপ্রদ পার্থিব জীবনের ইতি ঘটবে। আর মরণ নামক সেই অনিবার্য পরিণতি উপস্থিত হলে অনুশোচনা, অনুতাপ, আফসোস কোনই কাজে আসবে না এবং শাস্তি এতই ভয়াবহ হবে যে, তা থেকে বাঁচার কোন উপায় থাকবে না। মেয়ে হিসাবে আমি কামনা করছি যে, শেষ পর্যন্ত আপনারা এই ভয়ানক দুর্ভাগ্যের আক্রমণ হতে নিজেদের রক্ষা করতে সমর্থ হবেন। কিন্তু যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ণ স্বাধীনতা আপনাদের রয়েছে এবং পুরো ব্যাপারটাই আপনাদের অভিরুচির উপর নির্ভর করছে। আজ যে পথ বেছে নেবেন, তার উপর আপনাদের অনাগত ভবিষ্যত নির্ভর করবে। অনেক ভালবাসা ও শুভকামনা রইল।

ইতি,

আপনাদের অনুরক্ত দুহিতা
মারয়াম জামীলা।

[লেখক : ৭ম সেমিস্টার, ইংরেজী বিভাগ, নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি, রাজশাহী ক্যাম্পাস]

ইতিহাস কথা বলে : পর্ব-১

-মেহেদী আরীফ

[ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ ও সত্যধর্মী ইতিহাসের বিস্তারিত আলোচনাই মূলতঃ ঐতিহাসিকদের কাজ। সত্যকে বিকৃত করে এবং বিকৃতকে সত্য বলে উপস্থাপন করা বিশ্বাসঘাতকতার নামান্তর। কিন্তু একশ্রেণীর পাশ্চাত্যের পদলেহী ও ইংরেজদের দালাল সদৃশ ঐতিহাসিকবৃন্দ সত্য ঘঠনাকে অতি কূটচালে বিকৃত করে ইতিহাস বিকৃত করেছেন ও করছেন। উল্লেখ্য যে, ভারতীয় উপমহাদেশ প্রায় সাড়ে সাতশত বছর মুসলমানদের করায়াত্তে ছিল। তাদের রয়েছে ত্যাগ-তিতিক্ষা, সম্মান-মর্যাদা, যশ-খ্যাতি ও উৎসর্গিত প্রাণের অনেক জ্বলন্ত ইতিহাস। অথচ ঐ সমস্ত পাশ্চাত্যপ্রেমী ঐতিহাসিকরা সেই সত্য ও জ্বলন্ত ইতিহাসকে করেছে বিকৃত, নির্লিপ্ত ও অবহেলিত। এর মাধ্যমে তারা মুসলিম জাতির সাথে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ক্ষতিগ্রস্থ করেছে মুসলিম জাতির ঐতিহ্য ও সুমহান আদর্শের বিশ্বময়তাকে। তাই 'ইতিহাস ও ঐতিহ্য' কলামের মাধ্যমে জাতির সম্মুখে সত্য ইতিহাস, গ্রহণযোগ্য তথ্যসূত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করার লক্ষ্যেই আজকের এই 'ইতিহাস কথা বলে' প্রবন্ধটির অবতারণা- সহকারী সম্পাদক।]

ইতিহাস কথা বলে, কথা বলে ঐতিহাসিকের কলম, কখনও শিশুর মত অস্ফুট স্বরে, আবার কখনও সিংহের মত গর্জন করে। রাজা হারিয়ে যায়, রাজত্ব অপরের হস্তগত হয়, রয়ে যায় নানা কাহিনী। কিছু বিষয় ঘটে আবার কিছু রটে, আবার কিছু বিষয় না ঘটেও রটে। এই ঘটে যাওয়া এবং কলম ফসকে রটে যাওয়া ঘটনাগুলো আশ্রয় পায় ইতিহাসে। আজ যেটা ঘটনা, কাল সেটা ইতিহাস। ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করেনা, মিথ্যার কালো বিড়াল ঠিকই বের হয়ে আসে। মানুষের ভিতরের শক্ত ইস্পাতসদৃশ বিশ্বাসকে টলানো সহজ কথা নয়, সেটা বদ্ধমূল হয়ে আছে মনের গহীন অন্দরে। মনের অন্দর থেকে বিশ্বাসের বন্দরে সত্যের তরী ভিড়ানো খুবই কঠিন ব্যাপার। সত্য ইতিহাস জানার পরও বিরোধিতা করার প্রবণতা যেমন ঐতিহাসিকের ভিতরে আছে, তেমনি আছে সাধারণ অবুঝ মানুষের ভিতরে। সত্য ইতিহাস আজ মিথ্যার চাঁদোয়ায় ঢাকা। আজ প্রচলিত মিথ্যা আর কুসংস্কারের কাঁটাতারের বেড়া থেকে বের হওয়া দুরূহ ব্যাপার। ঐতিহাসিকদের সাথে পাল্লা দিয়েছেন কবি, সাহিত্যিক, পুঁথি লেখকরাও। পুঁথিতে হযরত আলী (রাঃ)-কে নারীলোলুপ হিসাবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে *(নাঊযুবিল্লাহ)*। সুতরাং দেখা যায় যে, ঐতিহাসিকদের সাথে সাথে কবি, সাহিত্যিক, পুঁথি লেখকরাও কলঙ্কিত করেছেন ইতিহাসের পাতা। সে আলোচনাতে পরে আসব। ইংরেজ জাতি অসভ্য নিরক্ষর বাঙ্গালী জাতিকে সভ্য করার অভিপ্রায়ে ভারতবর্ষে আগমন করে। হিন্দু-মুসলমান হ'ল ব্রিটিশদের দুই বাহু। নিজ ইচ্ছায় মনোবাসনা চরিতার্থ করার জন্য তারা দুই জাতিকে ইচ্ছামত ব্যবহার করেছে। তাদের প্রশংসার ধরনটায় আলাদা। প্রশংসা শেষে সামান্য গোমূত্র প্রয়োগ করতে তারা এতটুকু দ্বিধাবোধ করেনি। ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা অগ্নিকুণ্ডে হাত দেওয়ার নামান্তর। আর এই অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেওয়ার দুঃসাহস দেখানো বড়ই দুঃসাধ্য। কিন্তু আল্লাহর উপর ভরসা করে আজ শুরু করব মুঘল ইতিহাস দিয়ে, পুরাতন ইতিহাসের ভস্ম নিয়ে গূঢ় রহস্যের সত্য উৎঘাটনে ব্রতী হব ইনশাআল্লাহ।

মুঘল সাম্রাজ্যের সত্য ইতিহাস : আকবারের উদ্ধত আচরণ

ইতিহাসের এক বিশাল জায়গা দখল করে আছে মুঘল সাম্রাজ্য। মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাস লিখতে গিয়ে ঐতিহাসিকের কলম কোথাও বক্রপথে চলেছে, কখনও পথ হারিয়ে ফেলেছে, কখনও আবার মানুষের বিশ্বাস নিয়ে ঐতিহাসিকেরা ইচ্ছামত খেলা করেছে। বোদ্ধা ঐতিহাসিকদের মতে, সবচেয়ে আলোচিত সম্রাট হলেন 'মহামতি আকবর'। তিনি ইতিহাসে 'আকবর দ্যা গ্রেট' নামে পরিচিত।[১৩০] মুঘল সাম্রাজ্যের মহাপ্রতাপশালী শাসক ছিলেন আকবর, যিনি তের বছর বয়সে ক্ষমতায় এসেছিলেন। প্রভাব, প্রতিপত্তি, অর্থ-যশ ও খ্যাতি মানুষকে যে অমানুষে পরিণত করে এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ ইতিহাসের 'আকবর দ্যা গ্রেট'। এই গ্রেটকে নিয়ে আলোচনা করা অতীব যরূরী। একজন মুসলিম হিসেবে আরও যরূরী। তিনি 'কালেমা তাইয়্যেবা'র আদলে নিজেই কালেমা চালু করলেন নিজের আধিপত্য টিকিয়ে রাখার জন্য। ইসলামের কালেমা তাইয়্যেবা হ'ল 'লা ইলাহা ইলাল্লাহু'। আকবর চালু করলেন, 'লা ইলাহা ইলাল্লাহু আকবর খলীফাতুল্লাহ' *(নাঊযুবিল্লাহ)*। অন্য কোন ধর্মের অনুসারীরা এমন আঘাত দেওয়ার সাহস পায়নি, যেমনটি মহামতি আকবর পেয়েছিলেন। কুরআন যেখানে সুদ-ঘুষ হারাম করেছে, সেখানে গ্রেট আকবর তা হালালে পরিণত করেছিলেন। তার শাসনামলে নিষিদ্ধ জুয়া খেলাও প্রসিদ্ধ লাভ করেছিল। আকবর পর্দা প্রথার চরম বিরোধিতা করেছিলেন। মসজিদে আযান দেওয়া এবং ছালাত আদায় করা নিষিদ্ধ করেছিলেন তিনি। সালামের পরিবর্তে তিনি 'আদাব' দেওয়ার প্রথা চালু করেছিলেন।

আকবর ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের এক প্রতিমূর্তি। ধর্মনিরপেক্ষতা আসলে ধর্মহীনতার নামান্তর। ১৫৮২ সালে 'দ্বীন-ই-ইলাহী' গঠিত হয়েছিল বিভিন্ন ধর্মের সার নিয়ে। আকবর নিজেই রাতারাতি ধর্ম প্রবর্তক বনে যান। তার একান্ত অনুগত বীরবল ও অন্য ১৭ জন ছাড়া আর কেউ এই নব্য-সৃষ্ট ধর্মের ছায়াতলে শামিল হয়নি। যারা তাঁর ধর্মের অনুসারী হয়েছিল তারা ছিল চাটুকার, ধান্দাবাজ, লোভী ও দুনিয়াপূজারী স্বার্থবাদী। মহামতি তার সাম্রাজ্য বিস্তার করার জন্য একটি পন্থা বের করেছিলেন, যা বেশ ফলদায়ক হয়েছিল। রাজ্যের নারীরা ছিল তাঁর মনোরঞ্জনের প্রধান নিয়ামক। বিবাহের ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম কোনও ভেদাভেদ ছিলনা। জাতীয় অধ্যাপক ডঃ কবীর চৌধুরী তাঁর 'Dismantling Hindu-Muslim Hostile Images' নামক প্রবন্ধে লেখেন, 'Akbar himself married a Hindu princess who stayed a Hindu and practised her religious rites without any hindrance'. তার লাম্পট্যের পরিচয় দিয়ে ভারতের বিখ্যাত একটি গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'Akbar had over five thousand wives'.[১৩১] এই চরিত্রহীন শাসক ইতিহাসে মহামতি হ'ল আর অন্যরা হ'ল ঐতিহাসিকদের হাতের মোয়া। আকবর সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা মিথ্যার বেসাতি ছড়াতে মোটেও কারচুপি করেননি। আকবর ছিলেন খর্বাকৃতির, কালো বর্ণের, দেখতে মোটেও সুশ্রী ছিলেন না। অথচ ইংরেজ প্রভুর দেওয়া সনদ হচ্ছে, 'He looked every inch a king'. আবার কোন কোন ঐতিহাসিক বলেছেন, 'তার চক্ষুর চাহনি ছিল সূর্যকরোজ্জ্বল সমুদ্রের মত'। তার প্রতি কৃত্রিম আনুগত্য প্রকাশ করে ১৫৭৭ খ্রিষ্টাব্দে এক হিন্দু কবি চণ্ডী মাধবাচারজ রচনা করলেন,

---

১৩০. ইতিহাসে বেশ কয়েকজন গ্রেট আছেন : আকবর দ্যা গ্রেট, পিটার দ্যা গ্রেট, আলফ্রেড দ্যা গ্রেট, আলেকজান্ডার দ্যা গ্রেট ইত্যাদি।

১৩১. Vindication of Aowrangazeb, P. 143।

'হেথা এক দেশ আছে পঞ্চগৌড়।
সেখানে রাজত্ব করেন বাদশাহ আকবর।।
অর্জুনের অবতার তিনি মহামতি
বীরত্বে তুলনাহীন জ্ঞানে বৃহস্পতি।।
ত্রেতা যুগে রাম হেন অতি সযতনে।
এই কলি যুগে ভূপ পালে প্রজাগণে'।।

মহামতি নিজেকে ইমাম মাহদী কিংবা মসীহ রূপে আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি পরাস্ত হলেন, আল্লাহ্‌র সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে হেরে গেলেন। অসংখ্য নারীকে বিধবা করে মহামতি ১৬০৫ খ্রিষ্টাব্দে ৬০ বছর বয়সে দীর্ঘ ৪৭ বছরের রাজত্বের পর পরলোক গমন করেন। আগাছার চাষ করার দরকার হয়না, সার দেওয়ার দরকার হয়না, এমনি এমনি গজিয়ে ওঠে। আকবরের বহু কুকীর্তি মুঘল সাম্রাজ্যের অন্যান্য শাসকদের মাঝে ইচ্ছামত বণ্টন করা হয়েছে। তবে মহামতি একটি ভাল কাজ করতে চেয়েছিলেন তা হ'ল, সতীদাহ প্রথার বিলোপ সাধন। কিন্তু তিনি তা পারেননি। আর এটাই তাকে নিয়ে বলার মত একটা ইতিবাচক কথা।

বাবরের ইতিবাচক দিক ও তাঁর উৎসর্গিত প্রাণের করুণ মৃত্যু :

জহিরউদ্দিন মুহাম্মাদ বাবর ছিলেন মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু চাটুকার ঐতিহাসিকরা শুধু আকবরের সাফাই গেয়েছেন আর অন্যান্য শাসকদেরকে সহজ শিকারে পরিণত করেছেন। অজ্ঞ ঐতিহাসিকরা বিজ্ঞের ছদ্মবেশে চরম মিথ্যাচারের ঝুলি ভারী করেছেন। তাইতো বাবরকে তারা মদ্যপায়ী হিসেবে চিহ্নিত করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হননি। মুঘল সাম্রাজ্যের এই মহান অধিপতি জানতেন যে, মদ্যপান হ'ল ইসলামী শরী'আতে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। হাযার হাযার সৈন্যকে কড়া শাসনের যাঁতাকলে ফেলে শাসন করা সম্ভব নয়। তাইতো তিনি যুদ্ধের প্রারম্ভে এমন এক বুদ্ধি আঁটলেন যা প্রশংসার দাবি রাখে। ১২ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে হাত তুলে ফরিয়াদ করলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি আমায় ক্ষমা কর, আমি প্রতিজ্ঞা করছি আর জীবনে মদ্যপান করব না। পূর্ব অপরাধ ক্ষমা কর এবং এর পরিবর্তে যুদ্ধের ইযযত রক্ষা কর'। বাবর শিশুর মত কাঁদতে লাগলেন। তার কান্না বিশাল সৈন্য বাহিনীকে এমনভাবে আলোড়িত করল যে, অশ্রুসিক্ত সৈন্যরা মদ্যপান থেকে নিজেদেরকে অব্যাহতি দিল। কি অসাধারণ বিজ্ঞ এক শাসক ছিলেন বাবর!

স্বীয় পুত্র হুমায়ূন যখন কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হ'ল, তখন রাজ্যের কোন বিদ্যা, কোন চিকিৎসা তার রোগ সারাতে পারলনা। কোন উপায় কারো জানা ছিল না। মরণব্যাধিতে আক্রান্ত হুমায়ূনের শিয়রে বসে ভারাক্রান্ত মনে পিতার ব্যাকুল হৃদয় দিয়ে বাবর আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ করলেন, 'হে আল্লাহ! নিজের প্রাণের বিনিময়ে আমার পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা দাও'। অসুস্থ হুমায়ূন সুস্থ হয়ে গেলেন, বাবর পুত্রকে সুস্থ রূপে পেলেন কিন্তু নিজে হয়ে পড়লেন অসুস্থ। বাবরের আধ্যাত্মিকতার একনিষ্ঠতার সেদিন জয় হয়েছিল। জয় হয়েছিল এক খাঁটি মুসলিম শাসকের। সন্তানের প্রতি বুকভরা ভালবাসার এক পিতার। ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল তার এই মহান ত্যাগ। নীতিতে অটল, শরী'আতের বিধান মান্য করার ক্ষেত্রে এক ইস্পাত সদৃশ মানুষ, প্রজাবাৎসল বাবর সবকিছু মিলিয়ে তিনি এক দারুণ ব্যক্তিত্ব। কিন্তু তিনি অজ্ঞ নামের বিজ্ঞের ছদ্মবেশে অন্ধ ঐতিহাসিকের কলমের বলি হয়েছেন। ফলশ্রুতিতে তার গুণগুলো সব মাটি চাপা পড়েছে।

বাবর পুত্র হুমায়ূনের পরিচয় ও তার উদারতা :

হুমায়ূন ছিলেন সাধু চরিত্রের এক পরহেযগার মুসলমান। তিনি নাকি আফিমখোর ছিলেন! এমন কথা ছড়াতে ঐতিহাসিকের কলম একটুও নড়েনি। ঐতিহাসিকরা ইতিহাস বিক্রি করেছেন খুব কম দামে, বিকৃত করেছেন অবুঝ পাঠকের সবুজ হৃদয়। উদারতা এবং কৃতজ্ঞতা স্বীকার হুমায়ূনের চরিত্রগত গুণ ছিল। একবার হুমায়ূন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে খরস্রোতা নদীতে ঝাঁপ দেন। সৌভাগ্যক্রমে এক ভিস্তিওয়ালা তার প্রাণ রক্ষা করেন। প্রাণরক্ষার পুরস্কার স্বরূপ ভিস্তিওয়ালাকে তিনি আশ্বাস দেন যে, তিনি দিল্লীর অধিপতি হলে সে যা চাইবে তাই তাকে দিবে। যথারীতি ভিস্তিওয়ালা একদিন বাদশাহর দরবারে এসে হাজির। বাদশাহ চিনতে পেরে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, সে তার থেকে কি দাবি করে। তখন সে বলল, 'আমি চাই তোমাকে সরিয়ে সিংহাসনে বসতে'। সমস্ত সভাসদের মুখে মাছি যাওয়ার উপক্রম হল। কৃতজ্ঞ হুমায়ূন নিজের মাথার পাগড়ি খুলে ভিস্তিওয়ালার মাথায় পরিয়ে দিলেন আর ঘোষণা করলেন, 'আজ হতে ইনিই দিল্লীর বাদশাহ, আমি এঁর একজন নগণ্য খাদেম'। গোটা দিল্লীতে ঘটনাটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। সবাই জানতে চাইলেন যে, কাহিনী আসলে কি! বাদশাহ হুমায়ূন তখন উত্তরে করলেন, 'পবিত্র কুরআনে আছে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা অবৈধ। আমি তো ডুবে মরেই যেতাম, তাঁর উপকারে তিনি যা চাইবেন তাই দেব বলে অঙ্গীকার করেছিলাম'। একদিন এক রাত্রি যাপন করে ভিস্তিওয়ালা হুমায়ূনের মাথায় মুকুট পরিয়ে তাকে সিংহাসনে বসালেন। হুমায়ূনের মানবতা আর চরিত্রের দৃঢ়তা ছিল ভিস্তিওয়ালার কাছে সবচেয়ে বড় পুরস্কার। এই সত্য কাহিনী সত্য রূপে প্রকাশ করতে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গিয়েছেন ঐতিহাসিকরা। তাদের কলম বিকৃতির পথ খুঁজে পেয়েছে, সত্য প্রকাশ করতে গিয়ে থেমে গেছে কিংবা দুমড়ে-মুচড়ে পড়েছে। পরিশেষে মহান বাদশাহ হুমায়ূন সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হন।

ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে জাহাঙ্গীর ও অদৃশ্যে থাকা ইতিহাস :

বাদশাহ জাহাঙ্গীর প্রথম জীবনে ছিলেন চরিত্রে, চেহারায়, পোশাক-পরিচ্ছদে ইসলাম বিরোধী একজন মানুষ। মুজাদ্দিদে আলফেছানী আহমাদ সারহিন্দকে তিনি জেলখানায় বন্দি করেছিলেন। আর মুজাদ্দিদ সাহেব হলেন সেই ব্যক্তি যিনি আকবরের সৃষ্ট নতুন ধর্মের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিলেন। তিনি জাহাঙ্গীরের ভুল শুধরে দিয়েছিলেন। জাহাঙ্গীরের দরবারে প্রবেশ করার সময় কুর্নিশ না করার কারণে জাহাঙ্গীর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে চেয়েছিলেন এর কারণ কি? তখন মুজাদ্দিদ দৃঢ় সাহস সঞ্চার করে নির্ভয়ে বলেছিলেন, 'আমি জাহাঙ্গীরের দরবারের ভৃত্য নই, আমি আল্লাহ্‌র দরবারের ভৃত্য। তাই তাঁর আইনই আমার কাছে আইন, বাকি সবকিছু আমার কাছে বেআইন। আর তোমাকে সালাম দেই নাই এ জন্য যে, তুমি অহংকারী, হয়তো উত্তর দেবে না; তখন তোমার সালাম দেওয়ার অর্থ হবে প্রিয় নবীর একটা সুন্নাতকে পদদলিত করানো'। ফলশ্রুতিতে জাহাঙ্গীর ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁকে জেলে পাঠিয়েছিলেন। এই জাহাঙ্গীর-ই আবার তাঁর সংস্পর্শে এসে এক সোনার মানুষে পরিণত হন। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায়ের পাশাপাশি তিনি নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করতেন। জাহাঙ্গীরের ন্যায়পরায়ণতার কথা আমরা খুব কমসংখ্যক মানুষ-ই জানি। কারণ ঐতিহাসিকদের সম্মোহনী কলমী শক্তি মানুষের মনে বিকৃতির এক মহাঘূর্ণন তৈরি করেছে। যে ঘূর্ণনে হাবুডুবু খাচ্ছে সাধারণ মানুষেরা। ঐতিহাসিকরা দিনকে যেমন রাত করতে পারে, তেমনি রাতকেও দিন করতে পারে। মদ্যপ জাহাঙ্গীরকে সবাই চেনে, কিন্তু ন্যায়পরায়ণ প্রজাবাৎসল জাহাঙ্গীরকে কয়জন জানে?

একদিন বিকৃত মস্তিষ্কের এক হিন্দু প্রজা ভুল করে জাহাঙ্গীর পত্নী নূরজাহানের কক্ষে প্রবেশ করেন। নূরজাহান তাকে গুলি করে হত্যা করেন। নূরজাহানের বিচার হল, রায় হ'ল প্রাণদণ্ডের। নূরজাহানের একসময়ের হাতের পুতুল সেই বাদশা জাহাঙ্গীরের এহেন বিচার নূরজাহানকে বড়ই ব্যথিত করল। নূরজাহান প্রিয় স্বামীর কাছে জানতে

চাইলেন যে, এই শাস্তি থেকে বাঁচার কোন উপায় আছে কিনা, মনের তুলাদণ্ডে এর বিচার সম্ভব কিনা। তখন কাঁদতে কাঁদতে জাহাঙ্গীর বললেন, 'প্রিয়া নূরজাহান, আমি আমার তুলাদণ্ডে তোমার সারা জীবনের সবকিছু এক পাল্লায় চাপিয়েছি, আর অন্য পাল্লায় চাপিয়েছি হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আইনকে; বারেবারেই আমার কাছে ভারী হয়েছে ইসলামের নির্দেশ'। সুতরাং নূরজাহানের প্রাণদণ্ড কার্যকর করা অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়। বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তিটির বিচারের জন্য তার পক্ষ থেকে যারা এসেছিল তারা বাদশার বিচারে মুগ্ধ হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'হে বাদশাহ! আমরা আর প্রাণদণ্ড দেখতে চাই না, নূরজাহানকে আমরা ক্ষমা করলাম। আমরা আজ বুঝলাম ইসলাম সত্যিই শান্তি ও সত্যের নিরপেক্ষ ধর্ম'। এই ইতিহাস প্রচার করবে কে? কে কলম ধরবে? মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য ঢাকা পড়ে গেছে, জাহাঙ্গীরের মদ্যপানের কথা স্থান পেয়েছে ইতিহাসে। কিন্তু সত্য ইতিহাসের ডালি সবই অধরা রয়েই গেছে। অতএব হে বিশ্বের অকুতোভয় মুসলিম নওজোয়ানরা! আঘাত কর মিথ্যার বিরুদ্ধে, ত্রাস সৃষ্টি কর মিথ্যুক ঐতিহাসিকদের অন্দরকেল্লায়, অধ্যয়ন কর, প্রতিবাদ কর। সত্যকে উন্মোচিত করার দায়িত্ব তোমাদেরই। কেননা সত্য আজ মিথ্যার বেসাতিতে নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে। অতএব সাবধান!

আল্লাহভীরু সম্রাট শাহজাহান : লুকানো ইতিহাস

এবার বাদশাহ শাহজাহানের কথায় আসা যাক। চাল-চলনে, পোশাক-পরিচ্ছদে শাহজাহান একজন ধর্মপ্রাণ মুসলিম ছিলেন। তথাপি এখানেও ঐতিহাসিকরা অনুর্বর ইতিহাসের বীজ বপন করতে বিন্দুমাত্র কসুর করেননি। কিছু কিছু অনুর্বর মস্তিষ্কের অসাধু ঐতিহাসিক সবজান্তা সাধুর বেশ ধারণ করে ইতিহাসের রশি টেনেছেন। তাঁরা মনে করেন যে, বাদশাহ শাহজাহান বিলাসিতা আর প্রাচুর্যের মহাসমুদ্রে হাবুডুবু খেয়েছিলেন এবং তাঁর চারিত্রিক স্খলন হয়েছিল। স্মিথ বলেন, 'During the remaining thirty five years of his life he disgraced himself by gross licentiousness'. কিন্তু এই কুৎসিত কদাকার বিকৃত মস্তিষ্কের ঐতিহাসিকরা জানতেন না যে, শাহজাহান তাঁর স্ত্রীকে হারিয়ে শোকে বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি শারীরিক ও মানসিকভাবে বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। তাইতো তিনি তাঁর রত্নের মত পুত্র আওরঙ্গজেবকে চিনতে না পেরে অযোগ্য পুত্র দারাশেকোহকে বেশি অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন।

বাদশাহ শাহজাহান একবার এক স্বপ্নে একটি মসজিদ দর্শন করলেন। তিনি তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী মসজিদটির ছবি এঁকে আনার কথা বললেন। কিন্তু কারো ছবিই তাঁর মনের মত না হওয়াতে তিনি এক দরবেশের শরণাপন্ন হলেন। দরবেশ তাকে জানালেন, 'আমা অপেক্ষা ঐ বড় দরবেশ যিনি আপনার রান্না করেন'। বাদশাহ যখন রাঁধুনির কাছে গেলেন তখন তিনি বললেন, 'আমার চেয়ে বড় বুযুর্গ যিনি আপনার পায়খানা পরিষ্কার করে'। এ কথা শুনে বাদশাহর চোখ তো চড়কগাছ। বাদশাহ তাদের কাছে ক্ষমা চাইলেন তাদেরকে চিনতে না পারার জন্য। অবশেষে মেথর সব কথা শোনার পর বললেন, রাজা যে মসজিদের স্বপ্ন দেখেছেন তা আসলে জান্নাতের এক মসজিদ। মেথর ফকির এক শিল্পীকে ডেকে এনে মসজিদটির ছবি এঁকে বাদশাহকে দেখালেন। বাদশাহ এই ছবি দেখে বেশ অবাক হলেন এবং জানালেন যে, এটা তাঁর স্বপ্নের মসজিদের সাথে মিলে যায়। এই মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর যিনি প্রথমে স্থাপন করবেন তিনি অবশ্যই এমন ব্যক্তি হবেন যার কখনও তাহাজ্জুদের ছালাত কাযা হয়নি। পরে সেই মেথর ফকিরকে আর লোকালয়ে দেখা যায়নি। বাদশাহ তখন ঘোষণা দিলেন যে, এমন ব্যক্তি এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন যার বার বছর তাহাজ্জুদের ছালাত কাযা হয়নি। কোন আলেম আসার সাহস পাননি। অবশেষে বাদশাহ নিজেই প্রথম ইট হাতে নিলেন আর কেঁদে বললেন, 'হে আল্লাহ! আমি জানতাম না যে তুমি আমাকে এমনিভাবে প্রকাশ করে লজ্জিত করবে। হে আল্লাহ! তোমার শোকর (কৃতজ্ঞতা) যে আমার বার বছর তাহাজ্জুদ বাদ যায়নি'। কোথায় সেইসব অর্বাচিন ও কথিত সাহসী ঐতিহাসিক, যারা এরকম মুত্তাক্বী বাদশার সত্য ইতিহাস বিকৃত করে প্রচার করে? নির্লজ্জ ও বেহায়ার মত সত্য ইতিহাসকে এভাবে জীবন্ত কবর দেয়? শাহজাহানের বিশ্ব সুন্দরী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও সবকিছু উপেক্ষা করে তিনি বারটি বছর তাহাজ্জুদের ছালাত কাযা করেন নি। এটা দিয়ে প্রমাণিত হয় তিনি উচ্ছৃঙ্খল নাকি সুশৃঙ্খল ছিলেন। কিন্তু বুঝেও না বোঝার ভান করে থাকেন ঐসব অর্বাচিন ঐতিহাসিকরা। যদিও সত্যপন্থী কিছু ঐতিহাসিক সত্য প্রকাশ করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। যেমন- B. P. Saksena বলেন, 'In Shahjahan's reign the Mughal Empire attained to the zenith of prosperity and affluence'. ডঃ ভি. স্মিথও বলেছেন, 'Shahjahan's reign marks the climax of the Mughal dynasty and Empire'.

আওরঙ্গজেব ও তার শাসননীতি : ধর্ম বিদ্বেষের কালোমেঘ

বাদশাহ আওরঙ্গজেব আলমগীর নামে সমধিক পরিচিত। অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী এই মহাপুরুষকে ঐতিহাসিকরা সবচেয়ে বেশি দোষারোপ করেছেন, কালিমালেপন করেছেন তার চরিত্রে, ইচ্ছামত তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করেছেন। অথচ তাঁরা লম্পট আকবরকে সবচেয়ে উত্তম শাসক রূপে অভিহিত করেছেন। এমনকি মনগড়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে তাকে ন্যায়পরায়ণ ও যোগ্য শাসক বলে বিশ্বের সামনে পরিচয় করেছেন। কিন্তু উন্নত চরিত্রের অধিকারী আওরঙ্গজেবকে অনেক ঐতিহাসিক 'ঔরঙ্গজীব' নামে আখ্যা দিয়েছেন। এটা কটাক্ষ ছাড়া আর কিছুই নয়। অথচ তিনি ছিলেন মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ বাদশাহ। অধিকাংশ ঐতিহাসিক মনে করেন যে, তিনি ছিলেন প্রবল হিন্দু বিদ্বেষী। কিন্তু তাঁর সেনাপতি হিসেবে তিনি জয়সিংহ এবং যশোবন্ত সিংহকে নিয়োগ করেছিলেন। এটা কি হিন্দু-বিদ্বেষী কোন শাসকের কাজ হতে পারে? আবার ইতিহাস ঘাটতে থাকলে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর সময়ে হিন্দু-মুসলিম খুব-ই সুখে-শান্তিতে জীবন-যাপন করত। অন্যান্য ধর্মের লোকজনও তাঁর সময়ে খুব সুখে-শান্তিতে বসবাস করত। মারাঠা নেতা শিবাজীকে কাছে পেয়েও তিনি তাঁর গর্দান না নিয়ে তাকে বন্দি করে রাখেন। এই ভীরু, কাপুরুষ, কুটিল, পাপাচার, রাষ্ট্রদ্রোহী শিবাজীকে ঐতিহাসিকরা মহান শিবাজী রূপে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর নামে ১৯০৫ সাল থেকে শিবাজী উৎসব শুরু হয়েছে। ব্যাপার হল, যে বর্গীদের অত্যাচারের কথা শুনে আজো মানুষ ভয়ে থাকে সেই বর্গীদের নেতা ছিল শিবাজী। মূলতঃ শিবাজী ছিলেন এক ভণ্ড নেতা। বাদশাহ আওরঙ্গজেবের কাছে তিনি যখন পরাজয় বরণ করেন তখন আওরঙ্গজেব তার সৈন্যবাহিনীকে বন্দী শিবাজীর প্রতি সবরকম সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিলেন। ঘঠনাক্রমে শিবাজীকে শিষ্টাচার শেখানোর নির্দেশ দিলেন বাদশাহ। এক মারাঠী আত্মীয়ের উপর শিবাজীর দেখাশোনার ভার অর্পিত হয়। দুষ্ট গোয়ালের চেয়ে শূন্য গোয়াল আচ্ছা। চোর ধর্মের কাহিনী শোনে না। শিবাজীর ক্ষেত্রেও তাই ঘটল। শিবাজী ধর্মপালনের জন্য আবেদন করলেন। তাঁর আবেদন মঞ্জুর হ'ল। তিনি ব্রাহ্মণের কাছে পূজার অর্ঘ্য স্বরূপ বজরা ভর্তি মিষ্টি পাঠানোর বিষয়টি বাদশাহকে অবগত করেন। বাদশাহ ভাবলেন যে, অন্যের ধর্মে হস্তক্ষেপ করা ধর্ম বিরোধী কাজ। মহান শাসক আওরঙ্গজেব শিবাজীকে সুযোগ দিয়েছিলেন। আর ধূর্ত শিবাজী সেই সুযোগ নিয়ে নিজেই আমের ঝুড়িতে বসে পালিয়ে যান। কিন্তু একশ্রেণির অসাধু ঐতিহাসিকরা আওরঙ্গজেবের উপর ধর্ম বিদ্বেষের কালিমা লেপন করেছেন। অথচ সস্তা চরিত্রের শিবাজী ঐতিহাসিকের কলমের খোঁচায় দামী মানুষে পরিণত হলেন। বহু মন্দির প্রতিষ্ঠা

করেছিলেন আওরঙ্গজেব। কই, এই কথা তো গোমড়ামুখো কথিত বোদ্ধা ঐতিহাসিকরা বর্ণনা করেনা! তাঁরা শুধু বলেন থাকেন যে, আওরঙ্গজেব হিন্দু-বিদ্বেষী ছিলেন। বাংলাদেশের প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী হায়দার আকবর খান রনো ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখের 'বাংলাদেশ প্রতিদিন' পত্রিকায় 'মৌলবাদের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ' নামক কলামে লিখেছেন, 'সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া (যেমন আওরঙ্গজেব) মুসলিম শাসনকালে ধর্মীয় নিপীড়নের কথা জানা যায় না'। এখানে দেখা যায় যে, আওরঙ্গজেবকে নিয়ে রনো সাহেবও মিথ্যাচার করেছেন। সত্য ইতিহাস থেকে বুদ্ধিজীবীরা যেখানে অনেক পিছিয়ে সেখানে স্বল্প জ্ঞানের লোকেদের অবস্থা বড়ই করুণ। আওরঙ্গজেবের শাসননীতি, অর্থনীতি, সাম্যবাদ এতটাই প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, তা পরবর্তীতে সাম্যবাদী নীতির প্রবক্তা কার্ল মার্কসকেও খুব বেশী আন্দোলিত করেছিল।

নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা প্রসঙ্গ ও পলাশী যুদ্ধের রক্তস্নাত ইতিহাস :

পলাশীর যুদ্ধের প্রসঙ্গ আসলেই আমরা মীরজাফরের কথা বলি। কিন্তু নাম জানা-অজানা আরও কত যে মীরজাফর আছে তা একটু গবেষণার বিষয়, একটু সুস্থ মস্তিষ্কে ভাবার বিষয়। বিহারের গভর্ণর যয়নুদ্দীনের পুত্র ছিলেন সিরাজ। নবাব আলীবর্দী খাঁর সুযোগ্য দৌহিত্র দেশপ্রেমিক সিরাজ যখন সিংহাসনে বসলেন তখন থেকেই তাকে উৎখাত করার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন ইংরেজের পা চাঁটা গোলাম বাংলার নবাবেরা। হিন্দু রাজারা ইংরেজদেরকে বিভিন্নভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, যেকোনভাবেই হোক নবাবকে সরিয়ে দিতে হবে। পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া বাঁধানোর জন্য ইংরেজরা কলকাতার ঘাঁটি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্মাণ করতে আরম্ভ করে। নবাবের কথা ইংরেজ বাবুরা তোয়াক্কা না করাতে নবাব বিদেশী ইংরেজকে আক্রমণ করেন এবং ভীষণভাবে পরাজিত করেন। এ যুদ্ধের সাথে জড়িত 'Black Hole' বা অন্ধকূপের কাহিনী। সে কথায় পরে আসছি।

ইংরেজ বাহিনী কোণঠাসা হয়ে যাওয়ার পর বাংলার স্বার্থান্বেষী বড় বড় ব্যবসায়ীরা (জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, রাজবল্লভ) সিরাজের বিরুদ্ধে যোগ দেন। একেই বলে ঘরের শত্রু বিভীষণ। কুলাঙ্গার জগৎশেঠের বাড়িতে গোপন সভা করা হয়। সেই সভায় স্ত্রী লোকের ছদ্মবেশে ইংরেজ দূত মি. ওয়াটসকে পাল্কিতে করে আনা হয়। সিরাজকে পরাজয়ের জন্য যত টাকা লাগবে তা দেওয়ার আশ্বাস দেন মি. ওয়াট্স। রাজা রাজবল্লভ সিরাজের খালা ঘসেটি বেগমকে প্ররোচিত করেন ইংরেজকে সমর্থন করার জন্য। তাকে হাত করা গেলেও মীরজাফরকে হাত করা কষ্টকর হয়। তিনি প্রথমে বলেন, 'আমি নবাব আলীবর্দীর শ্যালক, অতএব সিরাজ-উদ-দৌলা আমার আত্মীয়, কি করে তা সম্ভব?' তখন উমিচাঁদ তাঁকে বোঝালেন, 'আমরাতো আর সিরাজকে মেরে ফেলছি না অথবা আমরা নিজেরাও নবাব হচ্ছি না, শুধু নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করে আপনাকে বসাতে চাইছি। কারণ আপনাকে শুধুমাত্র আমি নই; বরং ইংরেজরা এবং মুসলমানদের অনেকেই আর অমুসলমানদের প্রায় প্রত্যেকেই গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখে'। উমিচাঁদের উস্কানি যথেষ্ট কাজ দিল। মীর জাফর ইংরেজদের সাথে হাত মেলালেন। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন ক্লাইভ মাত্র তিন হাজার দুই শত সেন্য নিয়ে যুদ্ধে নামেন। সেখানে সিরাজের সৈন্য পঞ্চাশ হাযার। যুদ্ধে সিরাজের জয় নিশ্চিত। কিন্তু মীর জাফর, রায় দুর্লভদের মত সেনাপতিরা যুদ্ধ না করে দাঁড়িয়ে রইলেন। মীর মদন সিংহের মত যুদ্ধ করে নিহত হন। সিরাজ দিশেহারা হয়ে পড়লেন। মীর মদনের বীরত্বে মোহনলাল ও সিনফ্রে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ মীরজাফর যুদ্ধ বন্ধ করার নির্দেশ দিলে যুদ্ধ অন্যদিকে মোড় নিল। এ সময় ক্লাইভ বাহিনী পাল্টা আক্রমণ করে বসল। নবাব বাহিনীর উপর বর্ষার মত গুলিবর্ষণ করতে লাগল। নবাব রাজমহলের দিকে যাওয়ার পথে ধরা পড়লেন। তাঁকে বন্দী করে নির্মমভাবে হত্যা করা হ'ল। বাংলার বিশ্বাসঘাতক সন্তানেরা বোঝেনি যে, এ পরাজয় শুধু বাংলার নয়, বরং সমগ্র ভারতের। আর ঐ জয় ইংরেজ ও ইংল্যাণ্ডের। 'পলাশীর যুদ্ধ একটা যুদ্ধ নয়, যেন যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা' এমনটিই মন্তব্য করেছেন শ্রী ঘোষ তাঁর ইতিহাস গ্রন্থের ৫১৬ পৃষ্ঠায়।

এবার মিথ্যুক ইংরেজ অনুচর 'অন্ধকূপ হত্যা'র কাহিনীর মূল নায়ক হলওয়েলের কথায় আসি, যিনি সিরাজের বিরুদ্ধে মিথ্যার বেসাতি ছড়িয়েছিলেন। অনেক কাহিনী যে শুধু গাজাখুরে কাহিনী, তাঁর বাস্তব প্রমাণ হ'ল হলওয়েলের সৃষ্ট 'অন্ধকূপ হত্যা'র কাহিনী। সিরাজবিদ্বেষী ইংরেজদের কল্পিত অন্ধকূপে প্রায় দুইশত জন লোকের বন্দীর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ভাবার বিষয় হ'ল সেই ঘরটির আয়তন ছিল মাত্র 18×14। এখানে জায়গা কম হওয়ার কারণে ১৪৬ জনের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ধুরন্ধর প্রকৃতির ঐতিহাসিকরা পরে দেখলেন না যে, এত লোকের কথা বললে কেউ বিশ্বাস করবেনা। তাই পরে ৬০ জনের কথা বলা হ'ল। এটাই হ'ল ইতিহাস। যেদিকে স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে সেদিকে ভেসে যাচ্ছে ঐতিহাসিকের মূল্যবোধ। সব কিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে, বোধকরি, নষ্টদের হাতে গেছে অনেক আগ থেকেই, যার নমুনা আমরা ঐতিহাসিকদের থেকে পায়।

ঐতিহাসিকের বিষোদগার থেকে মুক্তি পাননি সিরাজ। শ্রী সুধীর কুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, 'সিরাজ অতিরিক্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি প্রায় নদীতে বন্যার সময় নৌকা হতে আরোহী উল্টিয়ে দিয়ে বা ডুবিয়ে দিয়ে এক সঙ্গে এক দুই শত যুবক, যুবতী, স্ত্রী, বৃদ্ধ, শিশু, সাঁতার না জেনে জলে নিমজ্জিত হওয়ার নিষ্ঠুর দৃশ্যটি উপভোগ করে আনন্দ লাভ করতেন'। আর কত ছেলেভুলানো, মায়ে খেদানো ইতিহাস আমরা পড়ব! ইতিহাস বিকৃতির পথে আমরাই হতে পারি এক একজন আলোকবর্তিকা ও দিশারী। তাহ'লে অন্তত উদভ্রান্ত জাতি সত্য ইতিহাস খুঁজে পেতে পারবে। আল্লাহ আমাদের সেই অসাধ্য সাধনের তৌফিক দিন।

গ্রন্থপঞ্জি :

১। চেপে রাখা ইতিহাস, গোলাম আহমদ মোর্তজা

২। ইতিহাসের ইতিহাস, ঐ।

৩। বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়, সুফিয়া আহমেদ।

৪। ওয়াহাবী আন্দোলন, আব্দুল মওদুদ।

৫। বাঙালি মুসলমানের মন, আহমদ ছফা।

৬। মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, মওলানা আকরম খাঁ।

৭। The Indian Musalmans, W.W. Hunter.

৮। উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা, ওয়াকিল আহমদ।

৯। নিবন্ধমালা, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, (পঞ্চদশ খণ্ড), ২০০৯।

১০। মৌলবাদের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, হায়দার আকবর খান রনো, বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৩।

১১। রাজনীতিকোষ, হারুনুর রশীদ।

১২। বাংলাপিডিয়া।

[লেখক : এম.এ, ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়]

ধর্মহীন শিক্ষার কুফল : পরিত্রাণের উপায়

-আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রাযযাক

ভূমিকা :

মানব আকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেই একজন মানুষ যেমন পুরোপুরি মানুষ হতে পারে না, তেমনিভাবে উচ্চশিক্ষা অর্জন করলেই একজন মানুষ সুশিক্ষিত আদর্শবান মানুষ হতে পারেনা। এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল, কিসের দ্বারা একজন মানুষ প্রকৃত মানুষে পরিণত হতে পারে? সেটা কি ধর্ম নয়? যা তার মন-মগজে সৃষ্টি করে এমন কিছু, তার কর্মের মধ্য দিয়ে যার বহিঃপ্রকশ ঘটে। সেই অন্তর্নিহিত শক্তির, সেই প্রতিভার, সেই আবেগ, অনুভূতি, আনন্দ-বেদনা, কৌতূহলের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটে বিভিন্ন মাধ্যমকে অবলম্বন করে, ভাষা, সাহিত্য, কাব্য, সঙ্গীত, স্থাপত্য, আচার-আচরণ ইত্যাদির আধারে। তার দ্বারা অন্তরে যে বোধ-বিশ্বাস সৃষ্টি হয় তাতে অংকিত হয় তার সৃষ্টি ছাপ। জীবনাচারের প্রতিটি ক্ষেত্রে তা প্রতিফলিত এবং প্রতিবিম্বিত হয়। আর এভাবেই একজন মানুষ তার সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিচিতি লাভ করে একজন আদর্শবান মানুষ রূপে এবং এভাবেই একটা জাতির নিজ পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। গড়ে উঠে নিজ বৈশিষ্ট্য। অর্ধশতাধিক বছর পূর্বে আমরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছি। তখন শিক্ষা-দীক্ষায় আমরা অনেক অনুন্নত ছিলাম। আমাদের এত দালান-কোঠা, রাস্তাঘাট, স্কুল, কলেজ, ভার্সিটি, রেডিও, টিভি, কম্পিউটার, ইন্টারনেট ছিলনা; অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির সাজ-সরঞ্জামও ছিলনা। সেই গোলামীর যুগের তুলনায় আমরা এখন অনেক উন্নত হয়েছি। কিন্তু সেই সাথে কি আমাদের চরিত্রের উন্নতি হয়েছে? আমরা কি নিষ্ঠুরতা, নির্মমতা, স্বার্থবাদিতা, শঠতা, লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ,পরশ্রীকাতরতা, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা ইত্যাদি মন্দ কাজ সমূহ পরিহার করে স্নেহমমতা, উদারতা, মহানুভবতা, আমানতদারিতা ইত্যাদি উত্তম বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হতে পেরেছি। আমাদের মধ্যে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা বাড়ছে কিন্তু আদর্শবান, নৈতিক গুণাবলীতে বলীয়ান মানুষ হ্রাস পেয়েছে। অত্র নিবন্ধে আমরা এর কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

শিক্ষা ক্ষেত্রে :

আমাদের দেশের অনেকেই শিক্ষা থেকে ধর্মকে অত্যন্ত সুকৌশলে বিতাড়িত করতে চান। কিন্তু এ বিষয়ে অন্যান্য মনীষীগণ কি বলছেন, ধর্মভিত্তিক শিক্ষার ব্যাপারে তাদের মতামত কি? সেটা ভেবে দেখা দরকার। এক্ষেত্রে জিবি গানউ ব্রেজেনস্কির বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, 'মানুষের মধ্যে তার অতিপ্রিয় কোন কিছুর সংস্পর্শে আসার আকাংখা রয়েছে। যা হচ্ছে ঈশ্বর। কমিউনিজম এই আকাংখাকে দমন ও পরিত্যাগ করতে চেয়েছিল। ফলে মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক শুন্যতার সৃষ্টি হয় এবং এটাই কনিউনিজমের পতনকে ত্বরান্বিত করে'। রুশ প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলিৎসন আমেরিকা যাওয়ার প্রাক্কালে প্রাচীন নগরী মারগেইভপোমাদ-এর ট্রিনটি ক্যাথেড্রালে বলেন, 'আমি এখানে এসেছি আত্মশুদ্ধির জন্য। ঈশ্বরের আশীর্বাদ পেলে আমার ঐ সফর সফল হবে'। তিনি আরও বলেন, 'একমাত্র ঈশ্বরই আমাকে পদত্যাগ করাতে পারেন'। তিনি রুশ টেলিভিশন এবং ইজভেস্তিয়া পত্রিকার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'আমি মাসে অন্তত একবার চার্চে হাজিরা দিব। চার্চে এলে আমি নিজেকে পবিত্র বোধ করি। চার্চের এই অনুভূতি প্রকাশ সম্ভব নয়'। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন, 'ব্যক্তিগত ও আধ্যাত্মিক কারণে তো বটেই রাজনৈতিক কারণেও চার্চের প্রয়োজন রয়েছে' *(নির্বাচিত কলাম, রূহুল আমীন, বিষয় : ধর্মহীনতার জ্বালা পৃঃ ২০০)*। এই হচ্ছে সেই রাশিয়ান প্রেসিডেন্টের বক্তব্য, ধর্মকে আফিমের নেশা বলে যে রাশিয়ার উপর চরম আঘাত হানা হয়েছিল, গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল হাযার হাযার মসজিদ ও গীর্জা। কুরআন বাইবেল ও অসংখ্য ধর্মীয় গ্রন্থকে নিয়ে করা হয়েছিল বহ্নি উৎসব; উন্নতি অগ্রগতির পথে অন্তরায় বলে ঘোষণা করা হয়েছিল, এই সমস্ত পদ্ধতির মাধ্যমে ধর্ম চর্চার পথে প্রবল অন্তরায় সৃষ্টি করা হয়েছিল। আর এখাবে পূর্ণ দাপটে পনে একশ বছর শাসন করার পর তার মধ্যকার সব অসারতা নগ্নভাবে প্রকাশ পেতে শুরু করে।

ধর্মভিত্তিক শিক্ষার ব্যাপারে যারা ইতিবাচক মন্তব্য করেছেন, যারা ধর্ম ভিত্তিক শিক্ষার পক্ষাবলম্বন করেছেন তাদের মধ্যে প্রথমে যার নাম উল্লেখ করা যরূরী তিনি হলেন স্টানলি হল (Stanly Hall)। শিশুদের শিক্ষাদানের বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি বলেন : If you teach them there the R's Reading, writing and arithmetic and don't teach the frouth R Religin they are sure to become fifth R Rascal. ড. কাজী দ্বীন মুহাম্মাদ তাঁর 'জীবন সৌন্দর্য' নামক প্রবন্ধে বলেন, 'ছাত্র-ছাত্রীদের শুধু পড়তে, লিখতে এবং অংক কষতে শিখালেই চরিত্রবান হয় না বরং তাদেরকে ধর্ম না শিখালে তারা নিশ্চিত দুষ্ট হয়ে পড়বেই'। তার এ কথাটা যে কতটা বাস্তবসম্মত তা আমরা বর্তমান সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে তাকালে সহজেই বুঝতে পারব। শিক্ষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে কবি মিলটন বলছেন, Education is the development of body, mind and soul. অর্থাৎ 'শিক্ষা হ'ল শরীর, মন ও আত্মার সুষম বিকাশের নাম'। Liberal Education-এর প্রবক্তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ Albert Schezer তাঁর প্রখ্যাত The teaching of Revernce for life গ্রন্থে বলেন, There kinds of progress are signficant progress in knowleage and technology. proress in socialization of man and progress in sprituality. the last one is most important. অর্থাৎ 'তিন প্রকার জিনিসের অগ্রগতি খুবই যরূরী (১) জ্ঞান এবং প্রযুক্তির উন্নতি (২) মানুষের সামাজিকীকরণের উন্নতি (৩) ধর্মের ক্ষেত্রে অগ্রসরতা। আর শেষেরটাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ'। তিনি আরো বলেছেন, Our age must achieve spritual renwal, A new renaissance must come the renaissance in which man kind discoved that ethical ection is supreme truth and the supreme vtilitriansm by which mankind will be liberated Albert schezer the teaching of Revernce for life. পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদ prof দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠ উচ্চারণ করেন, Education is the etemal proeess and mentaly developed free and concious human being to god as intellectual emotional and volition enviroment of man. 'শিক্ষা হচ্ছে শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে বিকশিত ও মুক্ত মানব সত্তাকে স্রষ্টার সাথে উন্নত ও ঐচ্ছিকভাবে সমন্বিত করার একটি চিরন্তন প্রক্রিয়া। যেমনি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত রয়েছে মানুষের বুদ্ধির আবেগগত ও ইচ্ছাশক্তি সম্পর্কীয় পরিবেশ'। 'জাতীয় শিক্ষা সেমিনার সংকলন ১৯৯৭' জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান বলেছেন, 'ধর্মের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। আর তা হচ্ছে মানুষকে পরিপূর্ণ করা, মানুষকে তার জীবন সম্পর্কে সচেতন করা। ধর্ম সংস্কার নিয়ে নয় বরং ধর্ম হচ্ছে বিশেষ বিশ্বাস ও আদর্শকে নিয়ে'। তিনি আরো বলেন, 'শিক্ষার একটি আদর্শগত ভিত্তি আছে। সেই আদর্শগত ভিত্তিই হল ধর্মের ভিত্তি'। উপরোক্ত মনীষীদের কথার আলোকে নিশ্চিত করে বলা যায় যে, ধর্মভিত্তিক শিক্ষাই শিক্ষার একমাত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপ। ধর্ম ছাড়া শিক্ষার কথা ভাবাই যায়না। আর এ কারণে মুসলিম শাসন আমলে ভারতীয় উপমহাদেশে শিক্ষার হাতে খড়িই ছিল মক্তবে।

ফলশ্রুতিতে দেখা যায় স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের জন্য একটি শিক্ষা নীতি প্রণয়ন করা হয়েছিল। যা বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছিল। সে কমিশনের জরীপ রিপোর্টে ২৮৬৯ জন মতামত দানকারীর মধ্যে ২২৮৫ জন মতামত দেন ধর্মভিত্তিক শিক্ষার পক্ষে, যার শতকরা হার দাঁড়ায় ৭৯.৬৪% *(কুদরত-ই-খোদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ১৯৭৪)*। তাইতো বিশ্ব নন্দিত কবি আল্লামা ইকবাল বলেন,

জ্ঞান যদি নিয়োজিত হয় তোমার দেহের সমৃদ্ধির জন্য
তবে এ জ্ঞান হবে বিষধর স্বর্প
জ্ঞান যদি হয় তোমার আত্মার মুক্তির জন্য বিবেদিত
তবে এ জ্ঞান হবে তোমার পরম বন্ধু তোমার গর্ব।

ধর্মহীন শিক্ষার পরিণতি :

আমরা ইতিপূর্বে শিক্ষা ক্ষেত্রে ধর্মের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু ধর্মহীন শিক্ষার পরিণতি কি? যারা ধর্মহীন শিক্ষার ব্যাপারে বুলি আওড়িয়ে চলেছেন এবং যারা এর মদদদাতা, যারা এর বাহক সেই পাশ্চাত্য দেশগুলির পরিণতি কি? ধর্মহীন শিক্ষা এবং সংস্কৃতির ফলে সেখানকার অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তা প্রকাশ করতে কিছু পরিসংখ্যানই যথেষ্ট। সেখানকার মানুষদের অপরাধ প্রবণতার ব্যাপারে FBI-এর রিপোর্ট হ'ল, Official figeres completed by the federal bureauof investigation indicate that the crime rate is higher in the united states if than more other countries and that the continuing to rise *(Abnormal and psychology and modern life, page no-396)*। ১৯৭৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১০ মিলিয়নের বেশী অপরাধ সংঘঠিত হয়। ১৯৯২ সালে ১৮ বছরের ব্যবধানে যার সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪ বিলিয়নে' *(সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৭ মার্চ ১৯৯৫)*। আমরিকাতে প্রতি বার সেকেণ্ডে কোন না কোন অপরাধ সংঘটিত হয়। সেখানে প্রতি ঘণ্টায় ১ জন খুন, প্রতি ২৫ মিনিটে একটি নারী ধর্ষণ, ৫ মিনিটে একটি ডাকাতি, প্রতি মিনিটে ১ টি চুরির ঘটনা ঘটে' *(তারেক মাহমুদ, সুন্নাতে রাসূল ও আধুনিক বিজ্ঞান, 'নারী ও ইসলাম' অনুবাদ : আব্দুলল্লাহ, পৃঃ-২২৭)*। ১৯৯১ সালে সেখানে বার লাখ অবৈধ সন্তান জন্মগ্রহণ করে। ১৯৯০ সালে নিউজ উইকের এক জরিপে দেখা যায়, সেখানে প্রতি ১৮ সেকেণ্ডে ১ জন ধর্ষিত হয়। প্রতিবছর ১৫-১৭ বছর বয়সী অবিবাহিতা ৫০ হাযার গর্ভধারণ করে' *(দৈনিক ইনকিলাব, ৫ এপ্রিল ২০০৮, পৃঃ-১৪)*। FBI-এর রিপোর্ট অনুসারে ১৯৯০ সালে ১০ হাযার ২৫৫ জন নারীর সঙ্গে ব্যভিচার করা হয়েছে। এ রির্পোট অনুসারে সেখানে দৈনিক ১৭৫৬ টি ব্যভিচারের ঘটনা ঘটেছে *(জাকির নায়েক, ইসলামের উপর ৪০টি অভিযোগ ও তার দলীল ভিত্তিক জওয়াব, পিস পাবলিকেশন্স, পৃঃ ৩২)*। অন্যদিকে বৃটেনে ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত নারী পুরুষের অবৈধ মেলামেশার কারণে ৪ লাখ জারজ সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তাহলে ২০ বছর পর আজকে প্রায় এক কোটি জারজ সন্তান বাস করছে ইংল্যান্ডে *(নূরুল ইসলাম, পরিবার ও পারিবারিক জীবন, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, পৃঃ ৭৪)*। রাশিয়ায় বার্ষিক দশ লাখ লোক আত্মহত্যার চেষ্টা করে এবং ৬০ হাজার কৃতকার্য হয়। অথচ রাশিয়ার উত্তর ককেশিয়া এলাকায় আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেনা বললেই চলে। কেননা সেখানে ৯০% মানুষ মুসলিম ও ধর্মভীরু *(দাওয়াতে দিল্লী, ১০ নভেম্বর ১৯৯২)*। জাপানে ১৯৮৩ সালে ২৫২০৭ জন আত্মহত্যা করে *(দৈনিক জং, পাকিস্তান, ২০ আগষ্ট ১৯৯৪)*। এছাড়াও আমেরিকায় সরকারী হিসাব মতে ২২% ছাত্রের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র আছে *(New later, vol-17, Augest ১৯৯৫)*। মার্কিন নিউইয়র্ক নগরীতে প্রতিদিন শত শত ইভটিজিংয়ের ঘটনা ঘটছে। এক হিসাব মতে, আমেরিকায় অপরাধ দমনে ১৯৯২ সালে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৪২৫ মিলিয়ন ডলার। যা ঐ সময়ের ডলারের মূল্যমান অনুযায়ী ১৭ লক্ষ কোটি টাকার সমান। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা বলে ধর্মকে বিকিয়ে দেওয়ার ফলে উদারপন্থী ও ধর্ম বিবর্জিত শিক্ষা ব্যবস্থার বদৌলতে পশ্চিমা ঐ সকল উন্নত দেশে আজ নৈতিকতার লেশ মাত্র নেই। তাসলিমা নাসরিনের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে অবাধ যৌনাচারের বিষাক্ত ছোবলে অনৈসলামী বিশ্ব জর্জরিত। পারিবারিক শৃংখল তাদের ভেংগে খান খান হয়ে গেছে। সন্তানের দায়দায়িত্ব নেওয়ার মানসিকতা বিদায় নিয়েছে। গণোবিয়া, সিফিলিসের মত ভয়ঙ্কর রোগের আতংকে দিশেহারা হয়ে মুক্তির দিগন্ত খুঁজে হয়রানি হচ্ছে। কিন্তু ওরা সাবধান হচ্ছে না। বরং এর পরিবর্তে প্রদর্শন করছে ঔদ্ধত্য। যে ব্যাধিতে ওরা আক্রান্ত। যে অশান্তিতে ওরা আকন্ঠ নিমজ্জিত। তাই আজ ওরা অবাধ যৌনাচার ছড়িয়ে দিতে চায় সর্বত্র, সারা দুনিয়ায়। শুধু ব্যক্তি উদ্যোগে নয়, জাতীয় উদ্যোগে নয়, আন্তর্জাতিক উদ্যোগে খোদ জাতিসংঘের সহায়তায়। জাতিসংঘের মাধ্যমে প্রস্তাব পাশ করিয়ে আন্তর্জাতিক আইন বানিয়ে ওদের সেই নষ্টামী, বিকৃত যৌন চর্চা ছড়িয়ে দিতে চায় বিশ্বময়। জাতিসংঘের কাঁধে সওয়ার হয়ে ওরা ইতিপূর্বে অনেক মুসলিম দেশে বুলেট বোমার আগ্রাসী হামলায় ধ্বংস করে দিয়েছে। বিরান করে দিয়েছে অনেক মুসলিম জনপদ। এবার ওরা ঐ সংস্থার ঘাড়ে চড়ে ধ্বংস করে দিতে চায় আমাদের চারিত্রিক সূচী-শুভ্রতা ও পবিত্রতা। ধর্মহীনতার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নোংরা অপসংস্কৃতির মহাসয়লাবে মোদের বিশ্ব নন্দিত। মানবতার মুক্তির মহানায়কের পক্ষ হতে প্রাপ্ত শান্তিপূর্ণ সাফল্যের একমাত্র মাধ্যম। মহা আদর্শ কে মোদের হতে ছিনিয়ে নিতে চায়। আর তাদের এই কুটিল চক্রান্ত, মুসলিম আদর্শ বিধ্বংসী ধর্মহীন শিক্ষা বাস্তবায়ন করতে চায় আমাদের দেশেরই তথাকথিত বাম বুদ্ধিজীবিরা। কলমের কোদাল হাতে এক শ্রেণীর পত্রিকার উপর ভর করে ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে তারা। পাশ্চাত্য হতে আমদানিকৃত বস্তাপঁচা সংস্কৃতির শুরুতেই আমাদের সমাজে মহাপ্রলয়ের যে অশনি সংকেত দেখা দিয়েছে তা কত ভয়ানক রূপ ধারণ করতে পারে! বাংলাদেশের ভাগ্যাকাশে ধর্মহীন শিক্ষার উদয় লগ্নেই আমাদের যে দশা তা ভবিষ্যতে কত মহামারী আকার ধারণ করতে পারে তা ভাবতেই গা শিউরে উঠে! নিম্নে বর্তমানে ধর্মহীন শিক্ষার ধ্বংসাত্মক তাণ্ডবের যে বাতাস লেগেছে তার সামান্য ফলাফল তুলে ধরা হ'ল। জুলাই ২০০০ সাল থেকে মার্চ মাসের ১ তারিখ পর্যন্ত ধর্ষণ ৫৭০ টি, ধর্ষণের চেষ্টা ১৫ টি *(নারী ও রাজনীতি, ঢাকা অবসর প্রকাশনী, এপ্রিল ২০০৬, পৃঃ ১০৩)*। ১৯৯৮ সালে যৌতুক ১৪৯ টি, ১৯৯৯ সালে ১৫২ টি, ২০০০ সালে ১৪৮ টি, ২০০১ সালে ১০৯ টি ও ২০০২ সালে ১৫৪ টি *(নারী ও রাজনীতি পৃঃ ১২৩)*। ২০০৯ সালে ১ম ৬ মাসে ধর্ষণ ২৩৫ টি, যৌতুক ৯৬ টি। ২০১০ সালে ১ম ৬ মাসে ধর্ষণ ৭৯৫ টি, যৌতুক ১১৫ টি *(আমার দেশ, ৩০ নভেম্বর, ২০১০ পৃঃ ৩; নয়া দিগন্ত ২৮ ডিসেম্বর পৃঃ ৯)*। ধর্ষণ ৪৫ টি, গণধর্ষণ ৮২ টি, ধর্ষণের পর হত্যা ৫২ টি, শ্লীলতাহানী ১১৩ টি, যৌতুকের কারণে ১১৩ টি আত্মহত্যা, ৩৫৭ টি হত্যা ৮৮০ *(আমার দেশ, ৩০ নভেম্বর ২০১০, পৃঃ ৩; নয়া দিগন্ত, ২৮ ডিসেম্বর ২০১০, পৃঃ ৯)*। চাইল্ড পার্লামেন্ট পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে, ৬২ ভাগ স্কুলের ছাত্রী ইভটিজিংয়ের শিকার *(আমার দেশ, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১০, পৃঃ ৩)*। মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর থেকে প্রকাশিত হওয়া এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, মাদকের যে মহাসয়লাব দেখা দিয়েছে তা আমাদের হৃদয় প্রকম্পিত করে তুলেছে। ২০১১ সালে মোট রোগী ২৫৮ জন, ২০১২ সালে ১২৩০৪ জন, ২০১২ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ৩১৭৮ জনসহ আরো অনেকে *(নয়া দিগন্ত, ২৭ আগষ্ট ২০১৩)*।

ধর্মহীন শিক্ষার বাস্তবায়ন কাদের পরিকল্পনার প্রতিফলন :

শক্তির জোরে, ক্ষমতার জোরে দাপটের পাশবিক উন্মাদনায় যে সীমালংঘন করে তখন তার বিদায় ঘন্টা বেজে উঠে। সীমালংঘনকারী কাউকেই আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখেনি। কালের গর্ভে তারা বিলীন হয়ে গেছে। আজ তারা ক্ষমতার দাপটে মদমত্ত হয়ে দাম্ভিকতার মাতাল অশ্বে আরোহণ করে নিজেদের নীতি নৈতিকতা বির্সজন ও বুদ্ধি বিবেক জলাঞ্জলি দিয়েছে। ধর্মহীন শিক্ষা বাস্তবায়ন করার দ্বারা বিভিন্ন সাবজেক্ট বৃদ্ধি করে অপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন পরীক্ষার হঠাৎ আগমন ঘটিয়েছে। ইসলামী শিক্ষার একমাত্র ধারক ও বাহক মাদরাসা শিক্ষা

ব্যবস্থা তথা ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার হীন অপচেষ্টা করা হচ্ছে। ফলে এর দ্বারা আমরা যে স্বেচ্ছাচারিতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছি তা ইহুদী ও খৃষ্টানদের তৈরীকৃত পরিকল্পনারই বাস্তব ফল মাত্র। এটি বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা দেওয়ার আড়ালে ইসলাম ধ্বংসের এক মহা পরিকল্পনা নয় কি? ১৮৩৬ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়া বৃটেনের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। সে সময় ভারতবর্ষের দাখিলকৃত শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট প্রসঙ্গে কমন সভায় ব্যাপক আলোচনা হয়। তৎকালীন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী গ্লাডস্টোন একটি পবিত্র কুরআন শরীফ হাতে নিয়ে উঁচু করে ধরে কমন্স সভায় বলেছিলেন, 'এটা মুসলমানদের ধর্মীয় গ্রন্থ আল-কুরআন। বৃটিশরা বর্তমানে অনেকগুলো মুসলিম দেশ দখল করে নিয়েছে। যদি এই দেশগুলোর উপর বিনা বাধায় বৃটিশদের আধিপত্য বজায় রাখতে হয় তাহলে এই কুরআন শিক্ষা থেকে তাদেরকে দূরে রাখতে হবে' *(সরকার শিহাবুদ্দিন আহমাদ, বিভ্রান্তির বেড়াজালে মুসলমান, পৃঃ-৫)*। ইংরেজদের শাসনামলে কুরআন ও হাদীছ চর্চা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। যুগে যুগে মুসলমানদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গা জাতিতে পরিণত করে রাখার জন্য এটি ছিল ইংরেজদের সুদূরপ্রসারী কৌশলগত চক্রান্ত। আজও আমরা এই জাল হতে মুক্ত হতে পারিনি বরং তা আরও ভয়াল আকৃতিতে ঘরের শত্রুরাই অক্টোপাসের আকৃতি নিয়ে ঘিরে ধরেছে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলিত ধারা দু'টি। যথা : একটি আধুনিক শিক্ষা, অপরটি ধর্মীয় শিক্ষা। এ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তক ছিলেন ইংরেজ শিক্ষাবিদ লর্ড মেকলে ১৮৩৯ সালে তিনি বলেছিলেন, We must at present do our best to form a class, who may be interpriters between us and millions. Whom we govern a class of persons. Indian in blood and colour, but English in taste, in openion, in moral and in intellect. 'বর্তমানে আমাদের সর্বাধিক প্রচেষ্টা হবে, এমন একটি গোষ্ঠী সৃষ্টি করা, যারা আমাদের ও আমাদের লক্ষ লক্ষ প্রজার মধ্যে দূত হিসাবে কাজ করতে পারে। এরা রক্তে ও বর্ণে হবে ভারতীয়। কিন্তু মেযাজে, মতামতে, নৈতিকতা ও বুদ্ধিবৃত্তিতে হবে ইংরেজ' *(বিভ্রান্তির বেড়াজালে মুসলমান, পৃঃ ১৩)*। উপরোল্লেখিত দু'টি প্রস্তাবনার দিকে তাকিয়ে বর্তমানে আমাদের সমাজে যারা ধর্মকে সভ্যতার পথের কাঁটা হিসেবে মনে করে এবং শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে ধর্মকে বাদ দিতে চান তাদের এই স্বপ্নের আড়ালে তারা কি চান তা আমাদের নিকট এখন পুরোপুরি স্পষ্ট।

ইসলামে নৈতিক শিক্ষা :

উপরের আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, ধর্ম ছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থা বৈঠাবিহীন নৌকার মত। এক্ষণে এখন দেখা যেতে পারে কুরআন-সুন্নাহ নৈতিক শিক্ষার ব্যাপারে কিরূপ সমৃদ্ধশালী। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا- وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا- فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا- قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا- وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا- كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا 'শপথ পৃথিবীর, যিনি তা বিস্তৃত করেছেন'। 'শপথ প্রাণের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন, অতঃপর তাকে সৎকর্ম এবং অসৎ কর্মের জ্ঞান দান করেছেন'। যে নিজেকে শুদ্ধ করে সে সফলকাম হয় আর যে নিজেকে কুলষিত করে সে ব্যর্থ মনোরথ হয়' *(শামস ৯১/৬-১১)*। এখানে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে বিবেকবান করে সৃষ্টি করেছেন এ কথা উল্লেখ করার পাশাপাশি ভাল ও মন্দ উভয় প্রকারের পরিণাম উল্লেখ করেছেন এবং নৈতিকতা সম্পন্ন হওয়ার প্রতি আহ্বান করেছেন। তিনি অন্যত্রে বলেন, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ 'রামাযান মাস হ'ল সেই মাস যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্যপথের যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ আর ন্যায়-অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী' *(বাকারাহ ২/১৮৫)*। অর্থাৎ মহান আল্লাহ আল-কুরআনের মধ্যে ন্যায়-অন্যায়, আলো-অন্ধকারকে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেছেন এবং তাকে পার্থক্যকারী মানদণ্ডও দান করেছেন। সুতরাং ইসলামের আলোকে নৈতিক দর্শন বলতে যা বোঝায় তা হ'ল আল-কুরআন এবং ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক নৈতিকতা। পবিত্র কুরআন যে নৈতিকতার বিবরণ দিয়েছে তা এত ক্ষুদ্র পরিসরে বুঝানো সম্ভব নয়। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কিছু আলোচনা করা হ'ল।

(১) আল্লাহ্র ইবাদত করতে হবে। যেমন আল্লাহ্র বাণী, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ 'তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করনা' *(বনী ইসরাইল ১৭/২৩)*।

(২) পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ বার্ধক্যে উপনীত হলে তোমরা তাদেরকে 'উহ' শব্দটিও বলনা এবং তাদের ধমক দিওনা বরং শিষ্টাচারপূর্ণ কথা বলা' *(বনী ইসরাঈল ১৭/২৩)*।

(৩) আত্মীয়-স্বজন, অভাবগ্রস্থ ও মুসাফিরদের তাদের প্রাপ্য দিয়ে দিবে।

(৪) কিছুতে অপব্যয় করা যাবে না।

(৫) কৃপণ হয়োনা এবং সম্পূর্ণ প্রসারিতও করনা। তাহলে তুমি নিন্দিত এবং নিঃস্ব হয়ে পড়বে।

(৬) তোমরা সন্তানদেরকে দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা করনা। আমি তাদের এবং তোমাদের রিযিক প্রদান করে থাকি।

(৭) আল্লাহ যাকে হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করনা।

(৮) ইয়াতীম বয়োঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সৎ উপায় ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো না।

(৯) প্রতিশ্রুতি পালন কর, প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।

(১০) মেপে দিবার সময় পূর্ণমাত্রায় দাও এবং ওযন কর সঠিক দাড়ি পাল্লায়।

(১১) যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার অনুসরণ করনা।

(১২) যমীনে অহংকার করে চলনা *(বনী ইসরাঈল ১৭/২৪-২৮)*।

এছাড়াও অসংখ্য আয়াতে মহান আল্লাহ নৈতিকতার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশদান করেছেন। যেমন মায়েদার ৯০ নং আয়াতে মদ, জুয়া সুরাপান; আন'আমের ১৫১, আ'রাফের ৩৩ নং আয়াতে অশ্লীলতা, ইউনুস ১৩ নং আয়াতে যুলুম, মায়িদার ৩৩ এবং ৩৮ নং আয়াতে অশান্তি সৃষ্টি, চুরি নিষিদ্ধ করণ, বাকারাহ ১৮৮ নং আয়াতে সম্পদ আত্মসাতের ব্যাপারে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে, নিসা ৩৬ নং আয়াতে মাতা-পিতা, প্রতিবেশী মুরুব্বীদের সাথে সদাচরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং পাশাপাশি তার অমান্যকারীর জন্য ভয়াবহ শাস্তির বিধান জারি করতঃ তা পূর্ণকারীর জন্য জান্নাতের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। যা একজন মানুষকে নীতি সম্পন্ন আদর্শবান হয়ে চলতে উদ্বুদ্ধ করে। এছাড়াও আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দিয়েছেন। সুতরাং এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ইসলামই একমাত্র শান্তিপূর্ণ সমাজের বার্তাবাহক।

উপসংহার :

পাশ্চাত্য হতে আমদানিকৃত বস্তাপঁচা সংস্কৃতির ভয়াবহতার দিকে তাকিয়ে এবং তাদের সমাজের ধর্মহীন শিক্ষার ফলে অশান্তির যে ঝড় উঠেছে তা দেখে আমাদের দেশেও ১০ নম্বর সর্তকতা সংকেত জারি করা যরূরী। ঐশির দ্বারা শুরু হওয়া ধর্মহীন শিক্ষার প্রলয়ংকরী ঝড় থামানোর প্রক্রিয়া শুরু করা সরকার সহ আমাদের প্রত্যেকের একান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য। নইলে সবেমাত্র শুরু হওয়া অনৈতিকতার এই ভয়াবহ দাবানল কোথায় গিয়ে শেষ হবে তা বলা বড় দায়। আল্লাহ আমাদের ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার তাওফীক দান করুন। আমীন!

[লেখক : আলিম প্রথম বর্ষ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।]

হাজরে আসওয়াদে প্রশান্তির চুমু

জীবনের বাঁকে বাঁকে চলার পথে নানা ঘটনা ও পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। যার কিছু সুখকর কিছু হয়তো বিব্রতকর। কিছু ঘটনা কালের পরিক্রমায় স্মৃতিতে অম্লান হয়ে থাকে। এ রকম একটি স্মৃতির অবতারণা করার জন্য কলম ধরা।

২০০৩ সালের ৯ সেপ্টেম্বর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী থেকে মারকাযের দ্বিতীয় ছাত্র হিসাবে উচ্চশিক্ষার্থে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করি। বরাবরই আমি ক্লাসে প্রথম ছিলাম। তাই মারকাযের শিক্ষকমণ্ডলীসহ সবার আশা ছিল মারকায থেকে প্রথমবার একজন ছাত্র নিলেও আমিই হব সেইজন। কিন্তু দেখা গেল, প্রথমবার সেখানে পড়ার সুযোগ পেল সহপাঠী হাফেয আব্দুল মতীন। একেই বলে ভাগ্য। যাহোক, বর্তমান মুসলিম বিশ্বে ইসলামী জ্ঞান ও সঠিক আক্বীদা চর্চার আলোকস্তম্ভ মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ভর্তি হলাম আল-হাদীছ বিভাগে। অন্ততঃ এক বছরের জন্য আরবী ভাষা শিক্ষা ইনস্টিটিউটে ভর্তি হতে চেয়েছিলাম আরবী ভাষায় দক্ষ হওয়ার জন্য। কিন্তু ভাইভার সময় পরীক্ষকগণ সম্মত হননি। তাই হাদীছ বিভাগে ভর্তি হয়ে শুরু হল জীবনের এক নব অধ্যায়ের। ইতিমধ্যে হজ্জের সময় সমাগত হল। হজ্জ করার এক দুর্নিবার আগ্রহ মনের মধ্যে আকুলি-বিকুলি করতে লাগল। মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রদেরকে হজ্জ করার জন্য প্রশাসনের অনুমতি নিতে হয়। অনুমতি নিয়ে ১৪২৪ হিজরীতে হজ্জ সম্পাদনের জন্য পবিত্র মক্কায় গেলাম। কা'বাঘর তাওয়াফ করার সময় হাজরে আসওয়াদকে চুমু খেতে হয়। তারুণ্যদীপ্ত বয়স হওয়ার কারণে আমার মনের মধ্যে প্রবল আকাঙ্খা ছিল, যেকোন মূল্যে হাজরে আসওয়াদকে চুমু খাব। হাজরে আসওয়াদ থেকে প্রায় এক হাত দূরত্বে অবস্থান করছিলাম। এইতো আর একটু পরেই তাতে চুমু খেতে পারব ভেবে মনটা আধ্যাত্মিকতার আভায় আলোকিত হয়ে উঠছিল। কিন্তু হঠাৎ ভীড়ের চাপে এক নিমিষেই সরে গেলাম হাজরে আসওয়াদ থেকে অনেক দূরে। মনটা বিষাদের কালো মেঘে ভরে গেল। এতো কাছাকাছি এসেও হাজরে আসওয়াদে চুমু খাওয়ার স্বপ্নটা অধরাই রয়ে গেল। বুকের ভিতরটা কষ্টে দুমড়ে-মুচড়ে গেল। কি আর করা। ঐ যাত্রায় দূর থেকে ইশারা করে তাওয়াফ শেষ করলাম। হজ্জের কিছুদিন পর হাদীছ বিভাগ থেকে ওমরা ট্যুরের আয়োজন করা হল। বাসে চেপে রওয়ানা দিলাম মক্কাভিমুখে। পৌঁছলাম ঠিক দুপুর বেলা। প্রচণ্ড রোদ ও গরম। মরু আবহাওয়ার উষ্ণতার তীব্রতায় গায়ের চামড়া জ্বলে যাওয়ার দশা। দুপুর দু'টা আড়াইটা হবে। কা'বাঘর তাওয়াফ শুরু করলাম। তাওয়াফকারীর সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। এসে গেল হাজরে আসওয়াদকে চুমু দেওয়ার সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। কোন ভীড় নেই। চাপাচাপি নেই। নেই সুঠামদেহী কৃষ্ণাঙ্গদের ঠেলাঠেলি। একেবারে নির্বিঘ্নে হাজরে আসওয়াদকে চুমু খেলাম। ফালিল্লাহ-হিল হামদ। হাজরে আসওয়াদকে প্রত্যক্ষ করলাম খুব কাছ থেকে নিবিড়ভাবে। এ আমার পরম সৌভাগ্য। কি কালো কুচকুচে পাথর! মনে পড়ে গেল রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ-'হাজরে আসওয়াদ প্রথমে দুধ বা বরফের চেয়েও সাদা ও মসৃণ অবস্থায় জান্নাত থেকে অবতীর্ণ হয়। অতঃপর আদম সন্তানের পাপ সমূহ তাকে কালো করে দেয়' (*তিরমিযী, মিশকাত হা/২৫৭৭; ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/২৭৩৩*)। এভাবে হাজরে আসওয়াদকে চুমু খাওয়ার যে সুবর্ণ সুযোগ হজ্জের সময় অল্পের জন্য হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল তা ওমরা করার সময় পূর্ণ হল। আজও সেই ঘটনা মনে পড়লে অন্তরে এক অজানা প্রশান্তি অনুভূত হয়। হৃদয়ে জাগে শিহরণ। আল্লাহ্‌র জন্যই কোটি কোটি শুকরিয়া, যিনি এই সুযোগ করে দিয়েছিলেন।

তোমাদের ধর্ম মিথ্যা!

আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য (*যারিয়াত ৫৬*)। তিনি তাদেরকে ফিতরাতী ধর্ম ইসলামের উপর সৃষ্টি করেছেন। এই ফিতরাতের কোন পরিবর্তন-পরিবর্ধন নেই। মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই এই ফিতরাতকে লালন করে। কিন্তু পারিপার্শ্বিক নানা কারণ স্বভাবধর্ম গ্রহণে মানুষের জন্য প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এজন্যইতো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রত্যেক সন্তান ফিতরাতের (ইসলাম) উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তাঁর পিতা-মাতা তাকে ইহুদী-খৃষ্টান বা অগ্নিপূজক পরিণত করে' (*বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৯০*)। এ সম্পর্কে একটি ঘটনার অবতারণা করা হল-

ঝিনাইদহ যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আসাদুল্লাহ মিলনের বিয়েতে যুবসংঘের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসাবে আমি ও যুবসংঘের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ও মাসিক **'আত-তাহরীক'**-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম গত ১১ অক্টোবর শুক্রবার অংশগ্রহণ করি। নাছোড়বান্দার মতো চেপে ধরাতেই ঈদের পূর্ব মুহূর্তে নানা ঝক্কি-ঝামেলাকে পিছনে ফেলে আমাদেরকে তার বিয়েতে যেতে হয়েছে। বিয়ে খেয়ে ট্রেনে ফেরার পালা। ঐদিন সন্ধ্যা ৬.২৫ মিনিটের ট্রেনে চুয়াডাঙ্গা থেকে আমাদের রাজশাহী যাত্রা শুরু হল। আমাদের পাশেই বসা ছিল চুয়াডাঙ্গার ছোট্টমণি চপলাচপল বাকপটু বর্ষা। বয়স ৬/৭ হবে। কিন্তু বুদ্ধিতে ইঁচড়ে পাকা। সে তার দাদীর সাথে রাজশাহীতে এক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে আসছে। আমাদের সাথে তাদের পরিচয় হল। ওর দাদী প্রাইমারির শিক্ষিকা, যিনি অবসর পূর্বকালীন ছুটি ভোগ করছেন। এরপর শুরু হল বর্ষার কথার বান। সে বানকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কারো নেই। আমরা তার সাথে মেতে উঠলাম খুনসুটিতে। সে প্রচণ্ড চঞ্চল। এই বয়সে সবাই তো একটু চঞ্চল হয়েই থাকে। কিন্তু সে ছিল মাত্রাতিরিক্ত চঞ্চল ও বাচাল। সারা পথ সে একটুও ক্লান্ত হয়নি। দাদী তাকে থামাবার চেষ্টা করলে উল্টো সে দাদীকে শাসিয়েছে। অতি আদরের নাতনীকে বেচারা দাদী আর কিইবা বলতে পারেন! আমাদের সাথে গল্পের ফাঁকে ফাঁকে সে সুন্দর বাংলা ও ইংরেজী কবিতা শুনিয়েছে। আরবী পড়তে পারে সে। সূরাও শুনিয়েছে। এভাবে পুরো পথটাই আমরা বেশ মজা করে কাটিয়েছি। সবচেয়ে মজার যে বিষয়টি ঘটেছিল, সেটি ছিল এক হিন্দু দম্পতিকে নিয়ে। আর সেই উপলক্ষেই এ লেখার অবতারণা। আমাদের পাশে বসা ছিলেন বাগমারার হিন্দু দম্পতি। তারা দুর্গোৎসব উপলক্ষে রাজশাহীতে আসছিলেন। বিভিন্ন সময় তারাও আমাদের খুনসুটি পর্বে অংশ নেয়ার চেষ্টা করছিলেন। ছোট্ট বর্ষা হিন্দু ভদ্র মহিলার মাথায় সিঁদুর ও হাতে শাঁখা দেখে বুঝতে পেরেছে যে, ওরা হিন্দু। সে তাদের সাথে খুব একটা আন্তরিকভাবে মিশছে না। যতটা মিশছে আমাদের সাথে। এক পর্যায়ে সে বলেই ফেলল, তোমাদের সাথে কথা বলব না। তোমরা হিন্দু। এ কথায় হিন্দু দম্পতি ভীষণ লজ্জা পেলেন। তাদের চেহারা লাল হয়ে গেল। আমরা ও তার দাদী বর্ষাকে বকুনি দিয়ে বললাম, এভাবে বলতে হয় না। যাহোক, বিদায়ের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে দাদী আমাদের সাথে হিন্দু দম্পতিকেও বিদায় জানানো ও তাদের বাড়িতে বেড়াতে আসার কথা বলতে বললেন। কিন্তু সে তাদেরকে যা বলল তা শুনে আমরা রীতিমত হতবাক হয়ে গেলাম। সে বলল, 'তোমাদের ধর্ম মিথ্যা। তোমরা নিজ হাতে মূর্তি বানিয়ে আবার ওকে লাথি মেরে নদীতে ফেলে দিয়ে আস। এটি ভণ্ডামী ছাড়া কিছুই নয়'। সে আরও বলল, 'আমাদের আল্লাহ তোমাদের ভগবানের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। তিনি এ পৃথিবীর সবাইকে সৃষ্টি করেছেন'। কথাগুলো যেন হিন্দু দম্পতির অন্তরে শেল বিদ্ধ করল। কিন্তু ছোট্ট বাচ্চা হওয়ার কারণে তারা তাকে কিছু বলতেও পারল না। ঈষৎ হাসি দিয়ে পরিবেশকে হালকা করার জন্য মহিলার স্বামী বলেই ফেলল, তোমাদের আল্লাহ সত্যিই শক্তিশালী। স্বামীর চেয়ে হিন্দু মহিলা এ কথা শুনে বেশি অগ্নিশর্মা হয়ে উঠেছিল। কিন্তু অসুস্থ থাকার কারণে

তেমন কিছু না বলে তিনি শুধু বললেন, আমি সুস্থ থাকলে তোমার সাথে ঝগড়া করতাম। ট্রেন ইতিমধ্যেই রাজশাহী রেলস্টেশনে এসে পৌঁছল। আমরা ট্রেন থেকে নেমে তাদেরকে বিদায় জানালাম। কিন্তু বর্ষার কথা আজো ভুলতে পারছি না। ছোট্ট একটি বাচ্চার মুখ দিয়ে যে কথাগুলো সেদিন বেরিয়েছিল তা ছিল সত্যিই তার ফিতরাতের বহিঃপ্রকাশ।

নূরুল ইসলাম
ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ।

ড. ফযলে ইলাহী যহীর সকাশে

৩০ সেপ্টেম্বর'১৩ রাত ৯-টায় ইসলামাবাদ এসে পৌঁছেছি। ইতিমধ্যে চোখের পলকে এক মাস পার হয়ে গেল। আসার আগে বেশ কিছু প্লান করে রেখেছিলাম। যার মধ্যে অন্যতম ছিল পাকিস্তানের আহলেহাদীছ জামা'আতের মুকুট, আপোষহীন অনলবর্ষী বাগ্মী আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীরের ছোট ভাই এবং রিয়াযের মুহাম্মাদ বিন সঊদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের হাদীছ বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও বিশিষ্ট সালাফী বিদ্বান আল্লামা ড. ফযলে এলাহী যহীরের সাথে সাক্ষাৎ করা। জানতাম তিনি ইসলামাবাদেই থাকেন। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সংক্রান্ত কাজের লম্বা ফিরিস্তি কোনভাবেই ফুরসৎ দিচ্ছিল না যে কোন এক ফাঁকে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে আসব। মাঝখানে বালুচিস্তনের রাজধানী কোয়েটাতে ১০দিনের লম্বা সফরটাও বেশ সময় সংকটে ফেলে দিয়েছে। যাইহোক ইসলামাবাদে পৌঁছার ঠিক এক মাস পর গত ১ নভেম্বর অনেকটা অপরিকল্পিতভাবেই সাক্ষাৎ হয়ে গেল শায়খের সাথে। আগের দিনই ভাবছিলাম গত তিনটি জুম'আ ফয়সাল মসজিদে পড়লাম কাল কোন আহলেহাদীছ মসজিদে যেতে হবে। ভাবাভাবি শেষ না হতেই আব্দুল বাছীর ভাইয়ের ফোন। ইসলামাবাদে স্বল্প সময়ে খুব কাছের বন্ধুতে পরিণত হওয়া ৩০/৩২ বছর বয়সী এই ভাই বললেন, 'কাল জি-১১/৩-এ মিনারুল হুদা মসজিদে ছালাত আদায় করবেন? ড. ফযলে এলাহী যহীর আজ খুৎবা দিবেন। যদি যান তাহলে আমিও যাব, যাওয়ার সময় আমার গাড়িতে আপনাকে তুলে নেব হোস্টেল থেকে'। আমি সাথে সাথেই রাজি হয়ে গেলাম। এই আব্দুল বাছীর ভাই একজন পশতুন বালুচ এবং কনভার্টেড আহলেহাদীছ। কোয়েটার মরুময় পিশিন ভ্যালিতে তাঁর পৈত্রিক নিবাস। ইসলামাবাদ শহরে তারা সপরিবারে বসবাস করছেন গত ১৫ বছর ধরে। ৮ ভাইবোনের বিরাট ফ্যামিলিসহ বাবা-মায়ের সাথে থাকেন আমার ইউনিভার্সিটির নিকটবর্তী আই-১০ এলাকায়। দেশে থাকতেই লণ্ডনের নাজমুল ভাইয়ের মাধ্যমে তার সাথে আমার পরিচয়। যাইহোক জুম'আর আগে কোন কাজে আটকে গিয়ে দেরী হওয়ায় উনি আমার হোস্টেলে আর আসতে পারলেন না। তাই ঠিকানা দিয়ে দিলেন মিনারুল হুদা মসজিদের। কিন্তু হাতে পর্যাপ্ত সময় না থাকায় শেষ পর্যন্ত তাহের ভাইয়ের সাথে ফয়ছাল মসজিদে রওনা দিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়িতে। এই তাহের ভাই বর্তমানে আমাদের ইউনিভার্সিটির উছূলুদ্দীন ফ্যাকাল্টির ভিজিটিং লেকচারার এবং একই সাথে হাদীছ বিভাগে পিএইচ.ডি গবেষণারত। ফয়সালাবাদের এই আহলেহাদীছ ভাইটি দারুণ মেধাবী ও রসিক মানুষ। একটু পাগলাটে স্বভাবেরও বটে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি মাত্র ৫টি সাব্জেক্টে মাস্টার্স করে ফেলেছেন। মাস্টার্সের নেশা টুটে যাওয়ার পর এখন পিএইচডি শুরু করছেন। তবে এখনও সময় সুযোগ বুঝে বিভিন্ন সার্টিফিকেট কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। এর সংখ্যাটাও আপাতত দাঁড়িয়েছে ডজনখানেকেরও বেশী। ফলে তাঁর লম্বা সিভির পৃষ্ঠা সংখ্যা ইতিমধ্যে পঞ্চম পেজে গিয়ে ঠেকেছে। এতকিছু অর্জনের পরও তার একটু আক্ষেপ এই কারণে যে, অনেকেই তাঁকে 'ডিগ্রি বাবা' বলে ডাকে। এই লকবটা আদতে প্রশংসাসূচক হলেও কোন দুর্বোধ্য কারণে তাঁর কাছে দারুণ অপছন্দের। তবে মুখ ফুটে বলতে পারেন না। জেনারেল মিডিয়ামের ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও ইংরেজীর সাথে আরবী ভাষাতেও মানুষটার দক্ষতা রীতিমত চোখ উল্টে দেয়ার মত।

যাইহোক ফয়সাল মসজিদে সেদিন খুৎবা দিচ্ছিলেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. আহমাদ বিন ইউসুফ আদ-দারাভীশ। সঊদী আরবের ইমাম মুহাম্মাদ বিন সঊদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ডেপুটি রেক্টর হিসাবে দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় গত বছরের শেষের দিকে তিনি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁকে তাঁর চেহারা এবং নামের কারণে প্রথমে পাকিস্তানীই মনে করেছিলাম। তবে এক সেমিনারে তাঁকে চমৎকার উচ্চারণে আরবীতে বক্তব্য রাখতে দেখে সন্দেহ হলে একজনকে জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলাম তিনি আরব। আজও এখানে আরবীতেই খুৎবা দিলেন। কিন্তু খুৎবা সম্পূর্ণ লিখিত হওয়ায় অনেকটা আকর্ষণহীন ছিল। ছালাত আদায়ের পর তাহের ভাইয়ের সাথে মসজিদ ক্যান্টিনে লাঞ্চ করে বিদায় নিলাম। পাশেই বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ওল্ড হোস্টেল' নামে পরিচিত কুয়েত হোস্টেল। সেখানে গেলাম হাবীব ভাইয়ের রুমে আমার রেখে আসা কিছু বই নেয়ার জন্য। এ সময় আব্দুল বাছীর ভাই ফোন দিলেন। কুয়েত হোস্টেলে আছি শুনে বললেন সেখানেই অপেক্ষা করতে। ১০ মিনিটের মধ্যে উনি উনার ছাইরঙা চকচকে টয়োটা কারটি নিয়ে হাজির। বললেন আজ আপনাকে আহলেহাদীছ মসজিদগুলো সব দেখাব।

মিনারুল হুদা মসজিদ

ইসলামাবাদ শহরে প্রায় ১৫টি আহলেহাদীছ মসজিদ আছে। কেবল জি এরিয়াতেই আছে ৫টি বড় মসজিদ (উল্লেখ্য, জি এরিয়া ইসলামাবাদের অন্যতম অভিজাত এলাকা)। প্রথমেই মিনারুল হুদা মসজিদ নিয়ে গেলেন। সেখানে আছর পড়ে অন্যান্য মসজিদগুলো দেখার জন্য বের হলাম। জি-১১ মারকায মোড় অতিক্রমের সময় একেবারে ফ্রন্টেই দেখলাম ড. ফযলে এলাহীর দোতলা বাড়ীটি। সেখান থেকে বেশ কিছুটা দূরে 'মারকাযুদ দাওয়াহ' পরিচালিত নির্মীয়মাণ বিশাল দোতলা মসজিদ এবং ড. ফযলে এলাহী যহীর পরিচালিত আরেকটি বৃহদাকার দোতলা মসজিদ দেখলাম। জি-১০/৪-এ এসে আরো একটি দোতলা আহলেহাদীছ মসজিদের দেখা পেলাম। মুছল্লীরা তখন আছর পড়ে বের হচ্ছে। এটি তুলনামূলক পুরোনো। এরপর আমরা জি এরিয়া থেকে বের হয়ে রওনা হলাম ব্লু এরিয়া তথা পার্লামেন্ট রোডের দিকে। এই রোডেই অবস্থিত ইসলামাবাদের প্রসিদ্ধ হোটেল 'সেভার ফুডস'। আগেও একবার এসেছিলাম। এখানে এসে আবার লাঞ্চ করতে হল বাছীর ভাইয়ের জোরাজুরিতে বাধ্য হয়ে। লাঞ্চের পর অনেকটা পথ ঘুরে এফ-৮ আসলাম সুপ্রসিদ্ধ দারুস সালাম লাইব্রেরীতে বই কেনার জন্য। অল্প সময়ে আমার প্রয়োজনীয় কয়েকটি বই পেয়ে খুব ভাল লাগল। তারপর তাড়াহুড়া করে রওনা দিলাম ড. ফজলে এলাহীর দারস ধরার জন্য। মিনারুল হুদা মসজিদে পৌঁছে দেখি শায়খ ততক্ষণে দারস শুরু করে দিয়েছেন। আমরা দু'জন মসজিদের বারান্দায় মাগরিব ছালাতের পর দারসে বসলাম। হালকা-পাতলা গড়নের মানুষ। অনেকটা লম্বা। বাকচারিতায় রাশভারিত্বের সাথে প্রগাঢ় আন্তরিকতার মিশেল। দেখে অনেকটা প্রবীণ বাঙালীদের মতই লাগে। বয়স ৬৫/৬৬-এর বেশী হওয়ার কথা নয়। তবে শরীর ও চেহারায় বয়সের ছাপ সুস্পষ্ট। বুলুগুল মারামের দারস দিচ্ছিলেন। উর্দূ ভাষা ততটা রপ্ত করতে না পারলেও সারাংশটি বুঝতে পারলাম। দারসের পর উনার সাথে সেই কাংক্ষিত সাক্ষাতপর্বটি হল। পরিচয়

ড. ফযলে ইলাহীর বাসভবন

পেয়ে জড়িয়ে ধরলেন। বেশ কিছুক্ষণ কথা হল। আব্বার কথা জানতে চাইলেন। উনার রিয়াদের বাসায় আব্বার যাওয়ার কথা স্মরণ করলেন। তারপর আমার ইউনিভার্সিটির খোঁজ-খবর নিলেন এবং কিছু

ড. ফযলে ইলাহী যহীর পরিচালিত একটি মসজিদ

উপদেশ দিলেন। আর দারসে আসতে বললেন মাঝে মাঝে। তারপর তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে আসলাম।

আসার সময় গল্পের ফাঁকে যে বাছীর ভাই গাড়ি ভুলক্রমে আমার পুরনো হোস্টেল 'কুয়েত হল'-এ নিয়ে হাজির হয়েছেন তা খেয়াল করিনি। ভাগ্যক্রমে সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়িটা পেয়ে গেলাম। তাই বাছীর ভাইকে আর কষ্ট না দিয়ে ওটাতেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসলাম।

পরবর্তী শুক্রবার তথা ৮ নভেম্বর জুম'আ পড়ার জন্য গেলাম 'মিনারুল হুদা' মসজিদে। সঙ্গী ছিলেন তাহের ভাই ও তাঁর একজন কনভার্ট আহলেহাদীছ বন্ধু। আব্দুল বাছীর ভাইও আসলেন আমরা পৌঁছানোর কিছুক্ষণ পর। যথারীতি শায়খ খুৎবা দিতে উঠলেন ঠিক ১টার সময়। দেড়টা পর্যন্ত আধাঘণ্টা খুৎবা হল। বিষয়বস্তু 'অপচয়কারীর শাস্তি'। বক্তব্যের ধারা শান্ত ও ধীরগতিসম্পন্ন হলেও খুব তাক্বওয়াপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী ছিল। প্রতিটি কথাতেই যেন তিনি আবেগভরা কণ্ঠে শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাইছিলেন। তবে হতাশ হলাম মুছল্লীদের সংখ্যা দেখে। হয়ত শহরাঞ্চলে আহলেহাদীছ জনবসতির অপ্রতুলতার কারণেই। অবশ্য ইসলামাবাদ খুব পরিকল্পিত শহর বলে এখানে সাধারণত সরকারী-বেসরকারী চাকুরিজীবীরাই বসবাস করে। ফলে জনবসতির হার এমনিতেই অনেক কম। অন্যদিকে শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটির দিন নয় এখানে। ফলে সবার পক্ষে হয়ত কাংখিত মসজিদে উপস্থিত হওয়া সম্ভবও হয় না। ছালাতের পর প্রথমে ছোট ছোট শিশুরা শায়খের পাশে ভিড় করে সালাম করা শুরু করল। তাদের সাথে শায়খের হাসিখুশি অন্তরঙ্গ মোলাকাতের দৃশ্যটা খুব ভাল লাগল। অনেক পিতাই এসেছেন সন্তানদের নিয়ে শায়খের কাছ থেকে দো'আ নেয়ার জন্য। পাকিস্তানীদের মোলাকাতপর্বটা হয় খুব আন্তরিকতাপূর্ণ। সাক্ষাৎ হলেই বিশেষ স্টাইলে কোলাকুলি করে 'কিয়া হাল', 'সাব ঠকঠাক হ্যায়', 'খায়রিয়াত হ্যায়', 'তবীয়ত ঠিক হ্যায়' করতে করতে এদের বেশ খানিকটা সময় চলে যায়। একটু সময়সাপেক্ষ ব্যাপার হলেও আমার কাছে এই দৃশ্যটা খুব চমৎকার লাগে। শায়খ উঠে দাঁড়িয়ে মুরুব্বী, নওজোয়ানদের সাথে এভাবেই মোলাকাত করছিলেন। আমি সামনে যেতেই 'কাইফাল হাল বেটা' বলে আলিঙ্গন করে উর্দূ ছেড়ে আরবীতে কথা বলা শুরু করলেন, আব্বার কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। আমি অবাকই হলাম। গত সপ্তাহে অল্পক্ষণই কথাবার্তা হয়েছিল। তাতেও তিনি ভীড়ের মধ্যে চিনতে ভুল করেননি। বুঝতে পারলাম বার্ধক্যের কাছে শারীরিকভাবে অবনত হয়ে পড়লেও স্মৃতিশক্তি তাঁর পূর্ণ সচল। চোখের দিকে তাঁকালেই দৃষ্টির সেই তীক্ষ্ণতা আর মেধার স্ফূরণ টের পাওয়া যায়। প্রথম দেখায় বেশ রাগী ও রাশভারী মানুষ মনে হলেও ভুলটা ভেঙ্গে যায় যখন দেখলাম সাধারণ এক ব্যক্তির টাখনুর নিচে নেমে যাওয়া পায়জামা নিজ হাতে যত্নের সাথে তুলে দিচ্ছেন আর হাসিমুখে তার ভুলটা ধরিয়ে দিচ্ছেন। শরী'আতগর্হিত কোন কাজ দেখলে কোনরূপ দেরী না করে তার প্রতিকারে নেমে পড়াই যে তার চরিত্র, তা বুঝতে বাকি রইল না। এই তাক্বওয়া-পরহেযগারিতার কারণেই বুঝি তিনি সবার কাছে এত শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছেন এবং সর্বশ্রেণীর একান্ত অভিভাবকে পরিণত হয়েছেন। আগন্তুক সেই ব্যক্তিটির চেহারা বলে দিচ্ছিল সবার সামনে এমন কাজে বিব্রত হওয়ার পরিবর্তে সে নিজেকে পরম সৌভাগ্যবানই মনে করছে।

ভীড় কমে এলে আমি উনার কাছে গিয়ে আমাদের পত্রিকার কথা বললাম এবং পত্রিকার জন্য তাঁর একটি সাক্ষাৎকার নিতে চাইলাম। তিনি একটু ভাবছিলেন। তখন তাহের ভাই পার্শ্ব থেকে হঠাৎ বলে ফেললেন, কেবল 'ইন্টারভিউ', অন্য কিছু নয়। তিনি সাথে সাথে গররাজি হয়ে পড়লেন। বললেন, 'দেখ 'ইন্টারভিউ' দেয়ার লোক অনেকেই আছে। আমার কাছ থেকে এসব নিও না। আত্মপ্রচার আমার পছন্দ নয়'। 'ইন্টারভিউ' শব্দটাতেই উনি একটু ভুল বুঝলেন। তাহের ভাইয়ের প্রতি বিরক্ত হলাম। ভাবছিলাম আরেকটু চাপ দিয়ে আবার বলি। কিন্তু তাঁর অনড় অবস্থান দেখে মনে হল, থাক পরে আরেকদিন চেষ্টা করা যাবে। অন্য প্রসঙ্গে যেয়ে তাঁর বই-পত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম এবং জানালাম আমাদের বাসায় ওনার কয়েকটি বই আছে। উনি বললেন, 'শুনেছি আমার কিছু বই নাকি বাংলায় প্রকাশ পেয়েছে?' বললাম 'হ্যা, সম্ভবত রাবওয়া ইসলামী সেন্টার, রিয়াদ থেকে প্রকাশিত হয়েছে'। বললেন, 'রাবওয়া সেন্টার তো মাশহুর, কিন্তু অন্য কোন প্রকাশনী বের করেছে কি না?' বললাম, 'ঠিক জানি না। তবে খোঁজ নিয়ে দেখব'। তিনি বললেন, 'যে প্রকাশনীই বের করুক না কেন, আমার অনুমতি নিতে হবে। এর জন্য রয়েলটি দিতে হবে তা নয়, কিন্তু কমপক্ষে অনুমতি তো নিতে হবে!' তারপর বললেন, 'সবার আগে পড়াশোনা, তারপর অন্যকিছু। পড়াশোনা আগে মনোযোগ দিয়ে শেষ করে নাও, তারপর যা করার করবে'। অনেক দো'আ করলেন। শেষে আব্বাকে সালাম দেয়ার জন্য বিশেষভাবে আবার বললেন। আগের দিন বার বার বলছিলেন, 'হুয়া আলেমুন মুহতারামুন ওয়া মুকাররামুন ইনদানা'। বিদায়ের সময় ঘটল এক মজার কাণ্ড। এক ব্যক্তি এসে উনাকে সালাম করতেই তিনি হাসতে হাসতে আমাকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'হুয়া মিন তাখাছ্ছুছিকা'। আমি তো অবাক। লোকটি এসে পরিচয় দিয়ে বললেন, 'আমি সঊদী নাগরিক। তবে গত ৩ বছর থেকে আমি ও আমার স্ত্রী পাকিস্তানে থাকছি। উদ্দেশ্য বাংলা শেখা। আমি সঊদী হজ্জ মন্ত্রণালয়ে চাকুরী করি। বাঙালী হাজীদের জন্য আমাকে বাংলা শিখতে পাঠানো হয়েছে। আমি এখানে 'ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ মডার্ন ল্যাংগুয়েজে' বাংলা বিভাগে অনার্স করছি। আর আমার স্ত্রী ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটিতে ইংলিশে পড়ছে'। সব শুনে আমার তো হতবিহ্বল অবস্থা। আবার জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি বাংলা শিখছেন? উনি আমার জিজ্ঞাসার ধরন দেখে হাসতে হাসতে বললেন, কেন বিশ্বাস হয় না? এবার অদ্ভুত উচ্চারণে শুরু করলেন, 'আমাল নোম মহসিন', আ-মি বানলা ছিখছি'। আমি তো তখন হাসব না কাঁদব এমন অবস্থায়। শায়খ তখনও মসজিদে ছিলেন। আমার অবস্থা দেখে তিনিও হাসতে লাগলেন। বললেন, 'সমস্যা নেই তুমি বাংলায় কথা বল, উনি উত্তর দেবেন'। তারপর বাংলায় দু'চারটা প্রশ্ন করে ঠিক ঠিক উত্তর পেলাম। কিন্তু তাঁর উচ্চারণ ভঙ্গী এতই হাস্যকর যে আমার হাসতে হাসতে পেট ফেটে যাওয়ার দশা। আমার আহলেহাদীছ পরিচয় পেয়ে তো আরো খুশী। উনি বলতে লাগলেন, আপনি বাংলাদেশের মানুষ, আরবী জানেন এবং সালাফীও। অতএব আপনার কাছেই আমি বাংলা শিখব। কোথায় থাকেন আপনি, আপনার মোবাইল নাম্বার দেন...ইত্যাদি। তারপর আমাদের আপত্তি সত্ত্বেও উনার নিজের গাড়িতে আমাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় পৌঁছে দিলেন। ২০ মিনিটের এটুকু পথ আসতেই এত গল্পের ডালি খুলে দিলেন যেন তিনি আমাদের কতদিনের বন্ধু। পরিশেষে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রুমে ফিরে আসলাম। শুয়ে শুয়ে পেপারটা দেখতে দেখতে ভাবছিলাম, নানান দেশের নানান কিসিমের কত মানুষই না দেখছি! আচার-সংস্কৃতি, চেহারা-ছুরতে পরস্পরের মধ্যে কত ভিন্নতা! অথচ আমাদের প্রত্যেকের ভিতরের মানুষটা যেন সেই একটাই। দিন শেষে প্রত্যেকের মাঝেই তাই বার বার খুঁজে পাই সেই সহজ-সরল প্রাকৃতিক মানুষটাকেই, এক নসলে জন্ম নেয়া সেই আদম সন্তানটাকেই।

-আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি
ইসলামাবাদ, পাকিস্তান।

কবিতা

যুবসংঘ

এস এম হাফীযুর রহমান
মঠবাড়ী, পাটকেলঘাটা, সাতক্ষীরা।

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ
কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র নীতি করে না ভঙ্গ
দূর করতে শিরক-বিদ'আতের গন্ধ
দলীলবিহীন ব্যক্তি পূজা অন্ধ
সে যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।
যুবসংঘ সেতো যুবসমাজের দুর্বার শক্তি
মানে না তারা কুরআন ও হাদীছবিহীন যুক্তি
অহি-র পথেই হবে মুক্তি।
যুবসংঘ সেতো চরিত্র গঠনের কারিগর
বাতিলকে রুখতে রয়েল বেঙ্গল টাইগার
হক্বের পথে আলী হায়দার।
সে যে যুবসমাজের চলার পথে বাড়াই গতি
অন্ধকার অমানিশাতেও এক মহাজ্যোতি
বাঁধা আসেও যদি শত কোটি।
দুর্ভাগ্য ঐ যুবকদের তরে
আসেনি যারা যুবসংঘের পতাকাতলে
বোঝেনি তারা অজ্ঞতার ছলে।
পরিশেষে আহ্বান জানাই যুবসমাজকে
কালক্ষেপণ না কর একতাবদ্ধ হও যুবসংঘের পতাকাতলে।

আজব নীতি

মুহাম্মাদ আলী হুসাইন
মঠবাড়ী, পাটকেলঘাটা, সাতক্ষীরা।

আজব দেশের আজব নিয়ম চলবে কত আর?
অপকর্মের সেঞ্চুরীতে পায় যে পুরস্কার।
পুরুষ জাতি বিকল যখন নারী হয় দেশ নেত্রী
নারী হ'ল ড্রাইভার আর পুরুষ তার যাত্রী।
উকিল ম্যাজিস্ট্রেট, বিচারপতি ঘুষের টাকায় পেট ভর্তি
নির্দোষদের আটকে রাখে এটাই তাদের নীতি।
চোর ডাকাত আর সন্ত্রাসীরা পেয়ে যায় মুক্তি
জ্ঞানী-গুণী মাযলূমেরা আদালতে বন্দী।
যুবক ছেলেরা ছাত্র আর নারীরা হয় টিচার
শিক্ষক-শিক্ষিকা এক অফিসে এটাই তাদের আচার।
সূদ, ঘুষ আর মদ, জুয়া এদের আইনে হালাল
এদের চোখে পড়েনা কভু আল্লাহ তা'আলার কালাম।
নারী জাতি যায় মার্কেটে পুরুষ যায় তার পিছে
এদের কাছে ইসলামটা একেবারেই মিছে।
শহরের ঐ ক্লাবগুলোতে রাত কাটায় কপোত-কপতি মিলে
ফুলের মত যুবকেরা টিভি ভিসিডির হলে।
সব জিনিসের দাম বাড়ছে নারীর বেলায় কম
ডিমান্ড ছাড়া হয়না বিয়ে যৌতুক তার নাম।
স্কুল, কলেজ, রাস্তা ঘাটে গড়ে তুলেছে মূর্তি
শিক্ষিত নামের মূর্খরা সব এগুলো নিয়ে করে ফূর্তি।

চমৎকার মিল

আব্দুল্লাহ মাসঊদ
মঠবাড়ী, পাটকেলঘাটা, সাতক্ষীরা।

এদেশের যারা পৌত্তলিক হিন্দু নামেই জানি
তাক্বলীদপন্থী বিদ'আতীরা ওদের কাছাকাছি
ওদের যেমন দেব দেবতা আছে শত কোটি
এদের তেমন পীর ফকিরের বড়ই ছড়াছড়ি।
ওরা যখন দেব মূর্তির মা বলে ডাকে
এরা লুটায় মায়ের পায়ে উন্নত ঐ শীর
এরা তখন মস্তক নোয়াই তরে মানিক পীর,
লক্ষীর কাছে ওরা যেমন ধন সম্পদ চায়
সম্পদের মোহে তখন এরা বাবার কাছে যায়
ওরা যখন জ্ঞান সাধনায় স্বরতীকে ডাকে
এরা তখন তপস্বী হয়ে বাবার দরবারে থাকে।
বিপদ-আপদে ওরা যখন দেবতাকে করে স্মরণ
জপে এরা বাবার নাম যদিও হয় মরণ।
ওরা যখন দেবতার কাছে দেখে সন্তানের স্বপন
এরা তখন বাবার আস্তানায় রাত্রি করে যাপন।
বছর অন্তর ওরা যেমন মহা ধুমধামে করে দূর্গাপূজা
মহা পবিত্র ওরস নামের লুটপাটে মত্ত বাবা খাজা।
ওরা যখন পালন করে মহা-উৎসব জন্মাষ্টমী
এরা তেমন বরণ করে ঈদে মিলাদুন্নবী।
ওদের কেহ মারা গেলে দোষ মাপে ঠাকুর
এদের কেউ মারা গেলে কাফ্ফারা পায় হুজুর
ওরা যেমন মৃত ভোজের করে আয়োজন
এদের তেমন মিলাদ ক্বিয়ামের হয় যে প্রয়োজন।

Identity Of Islam

Hafez Saiful Islam
Class Ten, Nawdapara Madrasha

Islam is our greatest religion
Kalema, Salat, Zakat, Seeyam and Hajj are our backbone.
Allah is our Creator
We obey Him is our Owner.
Rasul (sm) is our holy prophet
We are the Rasul's real friends.
The holy Quran and the Hadeeth are our scriptures
We should direct our lives according to Rasul's Ideals.
Allah and His Rasul do not love any crime
In order to commit crime one should spend no time.
There are a lot of crimes in our society
To remove those crimes we need to have Islamic capacity.
At least if we grasp the Islamic theme
Our dignity will be prospering.

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি!!

সংগঠন সংবাদ

যেলা সংবাদ

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলার 'যেলা কার্যালয়' উদ্বোধন

বাঁকাল ইসলামিক সেন্টার, বাঁকাল, সাতক্ষীরা ১৯ অক্টোবর শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাতক্ষীরা যেলা অফিস উদ্বোধন উপলক্ষ্যে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগরে প্রফেসর **ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক ও 'দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ কমপ্লেক্স'-এর প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা আব্দুল্লাহ আল-মামূন, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা লুৎফর রহমান প্রমুখ।

চাঁদপুর, কুমারখালী, কুষ্টিয়া ১ নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ৮টা থেকে আছর পর্যন্ত চাঁদপুর মধ্যপাড়া সালাফিয়া জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' পাবনা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক **'কর্মী প্রশিক্ষণ ও তাবলীগী সমাবেশ'** অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি এস. এম তারিক হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধন অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন পাবনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীন, সঊদী আরব শাখার প্রচার সম্পাদক সোহরাব হুসাইন, পাবনা যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক আব্দুল কুদ্দূস, দফতর সম্পাদক আফতাবুদ্দীন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক গুলজার হাসান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তৌহিদ হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক ইউনুস আলী, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক আনিসুর রহমান মা'রূফ প্রমুখ। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক হামিদুর রহমান।

নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী ১ নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ৮.৩০ মিনিট থেকে জুম'আ পর্যন্ত আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া মাদরাসায় 'যুবসংঘ' রাজশাহী মহানগরী কর্তৃক **'গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ও প্রশিক্ষণ শিবির-২০১৩'**-এর আয়োজন করা হয়। মহানগর 'যুবসংঘ'-এর সাধারাণ সম্পাদক ইবাদুল্লাহ বিন আব্বাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগরে প্রফেসর **ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুর রশীদ আখতার, মহানগর 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মামূনুর রশীদ, প্রচার সম্পাদক সাখাওয়াত হোসাইন, মারকায এলাকা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাফেয আসিফ রেযাসহ প্রমুখ। উক্ত অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করে ভূগরইল শাখা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক হাফেয আকমাল হোসাইন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মারকাযের ছাত্র ছোট্ট সোনামণি আশফাকুল ইসলাম। পরিশেষে উক্ত প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণদের মাঝে প্রধান অতিথি পুরস্কার তুলে দেন। উল্লেখ্য যে, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর 'গঠনতন্ত্র' ও 'কর্মপদ্ধতি' বই দু'টির উপর উক্ত গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

উপযেলা সংবাদ

ধুনট, বগুড়া ২৭ অক্টোবর, রবিবার : অদ্য বাদ যোহর ধুনট কান্তনগর হাফিযিয়া মাদরাসায় 'যুবসংঘ'-এর ধুনট উপযেলা কমিটি গঠন উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা আব্বাস আলী সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি হাফেয মুখলেছুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক হাফেয নজিবুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুর রাযযাক, অত্র ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব শাহজাহান আলী প্রমুখ। পরিশেষে নয়ন হোসেনকে সভাপতি এবং মাহমূদুল হাসানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট ধুনট উপযেলা কমিটি গঠন করা হয়।

এলাকা সংবাদ

চড়পাড়া, সোনাতলা, বগুড়া ৮ সেপ্টেম্বর রবিবার : অদ্য বাদ যোহর চড়পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ'-এর চড়পাড়া এলাকা কমিটি পুনর্গঠন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা ছহীমুদ্দীন গামার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুর রাযযাক। উক্ত অনুষ্ঠানের শেষে ডাঃ নযরুল ইসলাম বিন আব্দুল মুত্তালিবকে সভাপতি এবং আব্দুল মতীন বিন আব্দুছ ছামাদকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট চড়পাড়া এলাকা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

হাট দামনাশ, বাগমারা, রাজশাহী ২৭ সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ হাট দামনাশ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ'-এর হাট দামনাশ এলাকার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর রাজশাহী (উত্তর) সাংগঠনিক যেলার সহ-সভাপতি ও বাগমরা উপযেলার সভাপতি ডাঃ মুহাম্মাদ মুহসিন প্রমুখ।

হোয়াকোয়া, সোনাতলা, বগুড়া ২ অক্টোবর, বুধবার : অদ্য বাদ আছর হোয়াকোয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ'-এর হোয়াকোয়া এলাকা কমিটি পুনর্গঠন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুর রাযযক-এর সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গাইবান্ধা (পশ্চিম) সাংগনিক যেলার সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চড়পাড়া এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ নযরুল ইসলাম। পরিশেষে ওমর ফারুককে সভাপতি এবং হাফেয ফরীদুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সসদ্য বিশিষ্ট হোয়াকোয়া এলাকা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

সোনাবাড়িয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা ৯ অক্টোবর বুধবার : অদ্য বাদ আছর সোনাবাড়িয়া বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সোনাবাড়িয়া এলাকা কমিটি পুনর্গঠন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয। এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি

মাওলনা আব্দুল জাব্বারের সভাপতিত্বে উনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মাষ্টার মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান প্রমুখ। পরিশেষে মুহাম্মাদ লিয়াকত হোসেনকে সভাপতি এবং হাফেয আব্দুর রহীমকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট সোনাবাড়িয়া এলাকা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

কাকডাঙ্গা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা ১০ অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর বালিয়াডাঙ্গা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কাকাডাঙ্গা এলাকা কমিটি পুনর্গঠন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয। এলাকা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক শাহীদুযযামান ফারুক, কলারোয়া উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা রবীউল হক্ব, যেলা 'যুবসংঘ'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা আসাদুল্লাহ বিন মুসলিম, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মাওলান মুজাহিদুর রহমান প্রমুখ। পরিশেষে মাষ্টার মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমানকে সভাপতি এবং মাওলানা আবুল কালামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট কাকডাঙ্গা এলাকা পুনর্গঠন করা হয়।

বাংড়া, শেরপুর, বগুড়া ২৫ অক্টোবর, শুক্রবার : অত্র বাদ জুম'আ বাংড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ'-এর বাংড়া এলাকা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অত্র মসজিদের ইমাম মাওলানা রফীকুল ইসলামের সভপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুর রাযযাক। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক হাবীবুর রহমান। পরিশেষে মামুনুর রশীদকে সভাপতি এবং ডাঃ মুস্তাফীযুর রহমান সবুজকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট বাংড়া এলাকা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

ইসলামী সম্মেলন ২০১৩

বাগডোব, মহাদেবপুর, নওগাঁ ১ ও ২ নভেম্বর শুক্র ও শনিবার : গত ২ নভেম্বর মহাদেবপুর থানাধীন বাগডোব উচ্চবিদ্যালয় মাঠে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বাগডোব এলাকার উদ্যোগে দু'দিন ব্যাপী এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রথম দিন প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার এবং দ্বিতীয় দিন প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ শরীফুল ইসলাম, আলহেরা শিল্পীগোষ্ঠীর প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইন ও মান্দা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আফযাল হুসাইন প্রমুখ।

শাখা সংবাদ

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৮ সেপ্টেম্বর বুধবার : অদ্য বাদ আছর দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মারকায এলাকা কর্তৃক **'গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা-২০১৩'**-এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। মারকায এলাকার সভাপতি মুহাম্মাদ আসিফ রেযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস, দফতর সম্পাদক আব্দুল বারী প্রমুখ। মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রণীত 'তিনটি মতবাদ' ও 'যুবসংঘ'-এর 'গঠনতন্ত্র' বই দু'টির উপর অনুষ্ঠিত হওয়া উক্ত প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণদের মাঝে প্রধান অতিথি পুরস্কার তুলে দেন। পুরস্কারপ্রাপ্তরা হ'ল : ১ম : আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ (৯ম শ্রেণী), ২য় : তৌফিক হাসান (আলিম ১ম বর্ষ) ও ৩য় : আব্দুল হামীদ (আলিম ১ম বর্ষ)। এছাড়া আরো ৮ জনকে পুরস্কৃত করা হয় এবং অংশগ্রহণকারী সকলকে সান্ত্বনা পুরস্কার প্রদান করা হয়।

বহরামপুর, রাজশাহী ২৭ সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ বহরামপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখার 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আল-আমীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী মহানগর 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আশিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মহানগরীর সাধারণ সম্পাদক ইবাদুল্লাহ বিন আব্বাস।

হাট মাধবনগর, বাগমারা, রাজশাহী ১৮ অক্টোবর, শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব হাট মাধবনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশে আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর শাখা কর্মপরিষদ গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় আহলেহাদীছ ব্যক্তিত্ব জনাব আব্দুল করীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর রাজশাহী (উত্তর) সাংগঠনিক যেলার সহ-সভাপতি ও বাগমারা উপযেলার সভাপতি ডাঃ মুহাম্মাদ মুহসিন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন হাটগাঙ্গোপাড়া ডিগ্রী কলেজের ডিগ্রী ১ম বর্ষের ছাত্র আবদুল জলীল। অনুষ্ঠান শেষে আবু বকরকে সভাপতি ও আব্দুল জলীলকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট শাখা কর্ম পরিষদ গঠন করা হয়।

সারন্দী, বাগমারা, রাজশাহী ২০ অক্টোবর রবিবার : অদ্য বাদ মাগরিব সারন্দী নিশুপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশে আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সারন্দী নিশুপাড়া শাখার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আবু সাঈদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর রাজশাহী (উত্তর) সাংগঠনিক যেলার সহ-সভাপতি ও বাগমারা উপযেলার সভাপতি ডাঃ মুহাম্মাদ মুহসিন।

হরিষার ডাইং, রাজশাহী ৩০ অক্টোবর বুধবার : অদ্য বাদ আছর হরিষার ডাইং আহলেহাদীছ জামে মসজিদে উক্ত শাখার মাসিক মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাহতাবুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী মহানগর 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক ইবাদুল্লাহ বিন আব্বাস।

হজ্জ করতে এসে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন দুই মুসলিম বোন

(১) ফাতিমা আল মাহি নামে সুদানের এক বৃদ্ধা মহিলা এবার হজ্জ করতে এসে মসজিদে নববীতে তার হারানো দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছেন। ৬০ বছর বয়সী এই বৃদ্ধা মহিলা জানান, তিনি ৮ বছর পূর্বে তার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন এবং সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যান। এরপর তিনি বার বার অপারেশন করেও দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাননি। তিনি এ বছর হজ্জ করতে এসে মসজিদে নববীতে বসে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ার জন্য দো'আ করছিলেন। হঠাৎ তিনি বুঝতে পারেন যে, তার চোখের কালো পর্দা সরে যাচ্ছে। অতঃপর তিনি আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে চিৎকার করে ওঠেন। তিনি বলেন, আমি চিকিৎসকদের উপর আশা ছেড়ে দিয়ে শুধু আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করতাম এবং সেই দো'আ অবশেষে মসজিদে নববীতে এসে কবুল হয়েছে।

(২) চোখের আলো নিভে গিয়েছিল তার দেড় বছর আগে। আল্লাহ্‌র নিকটে প্রতিদিন তিনি আকুতি জানাতেন যে, আল্লাহ যেন তার চোখের হারানো জ্যোতি ফিরিয়ে দেন। এ অবস্থায় এবার তিনি হজ্জ পালন করতে আসেন। আরাফার ময়দানে অবস্থানকালে ঘটে যায় মা'বুদের অসীম কুদরতের বহিঃপ্রকাশ। দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান তিনি। প্রাণভরে দেখেছেন আল্লাহ্‌র ঘর কাবা শরীফ, মদীনায় প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পবিত্র রওযা মুবারক সহ ইসলামের অন্যান্য পবিত্র স্থান। এ ঘটনা তিউনিসিয়ার ৭০ বছর বয়স্কা মহিলা হাজী নাফীসা আল-কুরমাজির। দুই ছেলে ও তিন মেয়ের মা নাফীসা অন্ধ অবস্থায় এবার হজ্জ করতে আসেন। দেড় বছর আগে তার এক কঠিন স্ট্রোকে চোখের দৃষ্টি লোপ পায়। চিকিৎসকরা জানান যে, স্ট্রোক হওয়ায় এবং বয়সের কারণে তিনি আর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন না। তবে নাফীসা বলেন, আল্লাহ্‌র উপর থেকে আমি বিশ্বাস হারাইনি। আমি সব সময় তাঁর কাছে প্রার্থনা করতাম তিনি যেন আমার চোখের আলো ফিরিয়ে দেন।

হাজী কুরমাজি বলেন, এর মধ্যেই আমি হজ্জ পালনের সিদ্ধান্ত নেই। অতঃপর আরাফার ময়দানে এসে আমি দো'আর পরিমাণ আরো বাড়িয়ে দিই। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, আল্লাহ আমাকে নিরাশ করবেন না। দো'আ পাঠ করতে করতে হঠাৎ আমি চোখে দেখতে শুরু করি। বুঝতে পারি, মহান করুণাময় প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা ফিরিয়ে দিয়েছেন আমার দৃষ্টিশক্তি। আনন্দে কাঁদতে থাকি আমি। অন্য হজ্জ পালনকারীরা আমার কাছ থেকে ঘটনা শোনার পর আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে আল্লাহু আকবার তাকবীর দিতে থাকেন। তিনি বলেন, তিউনিসিয়া থেকে হজ্জে আসার সময় আমার স্বপ্ন ছিল পবিত্র স্থানগুলোসহ মক্কা-মদীনা শরীফ দেখার। মহান আল্লাহ্‌র জন্য হাযারো শুকরিয়া যে, আমার সে স্বপ্ন পূর্ণ হয়েছে। কারো সাহায্য ছাড়াই আমি এখন যে কোনো জায়গায় যেতে পারি। আরাফার ময়দানে লক্ষ লক্ষ হাজীর সমাবেশ দেখে হাজী কুরমাজি আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়েন। এত মানুষের সমাগম দীর্ঘ জীবনে কখনো দেখেননি তিনি। তিনি বলেন, বিশ্বের সর্বাপেক্ষা পবিত্র স্থান স্বচক্ষে দেখার জন্যই আল্লাহ পাক আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন।

[আল্লাহ তা'আলা অসীম দয়ালু ও করুণাময় কৃপানিধান। তিনি সকল শক্তির আধার। তিনি তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দার আবেদন পূর্ণ করে থাকেন। তাঁর নিকটে একনিষ্ঠ মনে ও বিনীতচিত্তে কোন কিছুর প্রার্থনা করলে তিনি তা কবুল করেন। তাই তাঁর অসীম কুদরতের লীলাখেলা বিশ্বের সম্মুখে তিনি বিভিন্ন সময়ে দেখিয়ে থাকেন। এ রকমই ঘটনা ঘটেছে এবার হজ্জ করতে এসে দুই মুসলিমের। যারা তাদের অন্ধত্ব ও দুঃখ-যাতনার জীবন পার করে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছেন আল্লাহ্‌র একান্ত অনুগ্রহে। ফালিল্লা-হিল হামদ। -সহকারী সম্পাদক]

সঊদী আরবের জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যপদ প্রত্যাখ্যান

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে প্রথমবারের মতো ঠাঁই পাওয়া সঊদী আরব সেদিনেই তার সদস্যপদ প্রত্যাখ্যান করেছে। বৈশ্বিক দ্বন্দ্ব নিরসনে পরিষদটির 'দ্বৈত নীতি'র জন্য দোষারোপ করে সদস্যপদ প্রত্যাখ্যান করেছে দেশটি। সঊদী আরবের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, কাজের পদ্ধতি ও দ্বৈত নীতির কারণে বিশ্ব শান্তি রক্ষায় নিরাপত্তা পরিষদ তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হচ্ছে। পরিষদটির সংস্কার না হওয়া এবং দায়িত্ব পালনের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা পর্যন্ত সদস্যপদ প্রত্যাখ্যান না করে সঊদী আরবের বিকল্প নেই। যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক সিরিয়ায় সামরিক হামলা না হওয়ায় গত মাসে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনেও ব্যাপক ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে সঊদী আরব।

বেইজিং-এর তিয়ানানমেন স্কোয়ার বিধ্বস্ত : মুসলমানদের উপর নিপীড়ন

গত ২৮ অক্টোবর চীনের রাজধানী বেইজিং-এর তিয়ানানমেন স্কোয়ার এলাকায় উছমান হাসান নামের এক ব্যক্তির এস ইউ ভি (SUV) গাড়ি মাও জে দং নামক বিশাল ছবির সামনে বিস্ফারিত হয়। ফলশ্রুতিতে সেখানে আগুন ধরে যায়। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। উক্ত ঘটনায় উছমান হাসান, তার মা, স্ত্রী ও ২ জন পর্যটকসহ মোট ৫ জন নিহত হয় এবং ৪০ জন আহত হয়। বেইজিং এ ঘটনাকে চীনে এটিই প্রথম বড় ধরনের সন্ত্রাসী হামলা বলে আখ্যায়িত করেছে। চীনের একজন উর্ধ্বতন নিরাপত্তা কর্মকর্তা বলেন যে, এ সন্ত্রাসী হামলার পিছনে 'ইস্ট তুর্কিস্তান ইসলামিক মুভমেন্ট (ইটিআইএম)' নামের একটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের হাত রয়েছে। অন্যদিকে চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহিলা মুখপাত্র হুয়া চিনইয়িং গত শুক্রবার বলেন, 'এ সংগঠনটি চীনের নিরাপত্তার জন্য আশু ও বাস্তব হুমকি'। তাছাড়া চীনের রাষ্ট্র পরিচালিত সংবাদ মাধ্যম বলেছে, তিয়ানানমেন স্কোয়ারের ঘটনার দায়ভার উইঘুরদেরই বহন করতে হবে। গ্লোবাল টাইমস বলেছে, এ ঘটনায় তারাই জড়িত। ফলে দেশের অন্যান্য স্থানে অবস্থানকারী উইঘুর মুসলমানরাও ক্ষতিগ্রস্ত ও নির্যাতিত হবে।

অনদিকে চীনের সংখ্যালঘু উইঘুর মুসলিম সম্প্রদায়ের সদস্যরা ও প্রবাসী উইঘুর সংগঠনগুলো তিয়ানানমেন স্কোয়ারের ঘটনাকে 'সন্ত্রাসী হামলা' বলে কর্তৃপক্ষের ভাষ্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে। আর এটাকে তারা নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারের পাশাপাশি মুসলমানদের উপর দমন-নিপীড়ন চালানোর অজুহাত হিসাবে আখ্যায়িত করেছে। বিদেশ ভিত্তিক 'উইঘুর ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস' (ডব্লিউইউসি)-এর যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক মুখপাত্র আলিম সেইতফ বলেন, গাড়ির লোকেরা ঘটনাচক্রে উইঘুর হওয়ায় এটাকে সন্ত্রাসী ঘটনার রূপ দেওয়া হয়েছে। আর এ ব্যাপারে চীন সরকারের ভাষ্য অসঙ্গতিপূর্ণ ও একপেশে। এটা একেবারেই অবিশ্বাস্য ও জঘন্য মিথ্যাচার। তিনি বলেন, একজন সন্ত্রাসী তার মা ও স্ত্রীকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে সন্ত্রাস করতে যাবে একথা অবিশ্বাস্য। তাদের দাবির বিরোধিতা করে তিনি বলেন, গাড়ি আগুনে পুড়ে গেলেও ধর্মীয় বই-পুস্তক রক্ষা পেল কিভাবে? চীনের জাতীয় পতাকাও পুড়ল না কেন?। তিনি আরো বলেন, চীনা কর্তৃপক্ষ এ রকম নানাভাবে উইঘুর মুসলমানদের সন্ত্রাসী বানিয়ে তাদের উপর বিভিন্ন সময়ে নিপীড়ন ও নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, চীনের পশ্চিমাঞ্চলীয় সম্পদ সমৃদ্ধ জিনজিয়াং প্রদেশে উইঘুর মুসলমানের বাস। সমগ্র চীনে মুসলমানদের সংখ্যা ২ কোটিরও বেশী হবে। এর মধ্যে জিনজিয়াং প্রদেশে উইঘুর মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় ১ কোটি। অথচ এখানে মাঝে মাঝে চীনা জাতি কর্তৃক মুসলমানরা দমন-নিপীড়নের শিকার হন। এর শান্তিপূর্ণ নিরসন হওয়া আশু যরূরী।

সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)

(মসজিদুল হারাম : পর্ব-২)

১. হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কার নির্দেশে কা'বাঘর পুনঃনির্মাণ করেন?
উত্তর : উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালেক বিন মারওয়ান-এর নির্দেশে।
২. হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কোন ভিত্তির উপর কা'বাঘর পুনঃনির্মাণ করেন?
উত্তর : কুরাইশী ভিত্তির উপর।
৩. উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালেক বিন মারওয়ান কুরাইশী ভিত্তির উপর কা'বাঘর পুনঃনির্মাণ করে অনুতপ্ত হন কেন?
উত্তর : আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছটি অবগত হওয়ার কারণে।
৪. আব্দুল মালেক বিন মারওয়ান ইবরাহীমী ভিত্তির উপর পুনরায় ফিরিয়ে আনার জন্য কার নিকটে মতামত জানতে জান?
উত্তর : হযরত ইমাম মালেক (রহঃ)-এর নিকটে।
৫. বারবার কা'বাঘর হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কে ইমাম মালেক (রহঃ) কী মন্তব্য করেছিলেন?
উত্তর : শাসকদের মর্জিমাফিক কা'বার এই পরিবর্তন-পরিবর্ধন অব্যহত থাকলে মানুষের অন্তরে কা'বার মর্যাদা হ্রাস পাবে। সুতরাং পরবর্তীতে কা'বাঘর আর সম্প্রসারিত হয়নি।
৬. বর্তমানে ইবরাহীমী ভিত্তি কোন অবস্থায় আছে?
উত্তর : মৌলিক অংশটুকু একটি ছোট প্রাচীর দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে।
৭. ইবরাহীমী ভিত্তির ঘিরে রাখা মূল অংশটুকু কী নামে পরিচিত?
উত্তর : হাতীম নামে।
৮. কা'বার সর্বশেষ ও বর্তমান ভিত্তি কে এবং কবে স্থাপন করেন?
উত্তর : তুর্কী সুলতান মুরাদ (৪র্থ); ১০৪০ হিজরী মোতাবেক ১৬৩০ খৃঃ।
৯. সুলতান মুরাদ কী কারণে পুনরায় নির্মাণ করেন?
উত্তর : এক ভয়ঙ্কর বন্যায় কা'বাঘর প্রায় বিধ্বস্ত হওয়ার কারণে।
১০. কত বছর পর সঊদী সরকার কা'বাঘর পুনঃনির্মাণ করেন?
উত্তর : ৩৭৫ বছর পর।
১১. সঊদী সরকার কা'বাঘর পুনঃনির্মাণ করেন কেন?
উত্তর : (দীর্ঘদিন সংস্কার কাজ না হওয়ায়) ইমারতের অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল ও নাজুক হওয়ার কারণে।
১২. সঊদী সরকারে কোন বাদশাহ্‌র নির্দেশে ও কত সালে কা'বাঘর পুনঃনির্মাণ করা হয়?
উত্তর : খাদেমুল হারামাইন শরীফাইন বাদশাহ ফাহদ-এর নির্দেশে; ১৯৯৬ সালে।
১৩. কা'বাঘরের ১৯৯৬ সালে সংস্কারকর্মের তত্ত্বাবধায়ক কারা ছিল?
উত্তর : বিন লাদেন গ্রুপ।
১৪. ১৯৯৬ সালের সংস্কারকর্মটি কতদিন ধরে সম্পন্ন হয়?
উত্তর : ছয় মাস ধরে।
১৫. সারা বিশ্বের সর্বপ্রথম উপাসনালয় কোনটি?
উত্তর : কা'বা শরীফ
১৬. কুরাইশদের নির্মিত কা'বা গৃহের ইবরাহীমী ভিত্তির কী কী পরিবর্তন হয়েছিল?
উত্তর : (ক) কা'বা গৃহের একটি অংশ 'হাতীম' কা'বা গৃহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে (খ) ইবরাহীমী ভিত্তির দু'টি দরজা ভেঙ্গে একটি দরজা স্থাপন করা হয়েছিল (গ) সমতল ভূমি থেকে অনেক উঁচুতে গৃহ নির্মাণ করা হয়েছিল।
১৭. পৃথিবীর সর্বপ্রথম মসজিদ কোনটি?
উত্তর : মসজিদুল হারাম।
১৮. পৃথিবীর দ্বিতীয় মসজিদ কোনটি?
উত্তর : মসজিদে বায়তুল মুক্বাদ্দাস
১৯. মসজিদুল হারাম ও মসজিদে বায়তুল মুকাদ্দাসের নির্মাণের মধ্যে ব্যবধান কত বছর?
উত্তর : চল্লিশ বছর।
২০. 'কা'বা' শব্দের শাব্দিক অর্থ কী?
উত্তর : চারকোনা।
২১. 'কা'বা' নামকরণের কারণ কী?
উত্তর : চতুষ্কোণ বিশিষ্ট হওয়ায়।
২২. পবিত্র কুরআনে কোন সূরায় কতবার 'কা'বা' সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে?
উত্তর : সূরা মায়েদায়; দু'বার।
২৩. পবিত্র কুরআনে 'কা'বা'-কে কতবার উল্লেখ করা হয়েছে?
উত্তর : কমপক্ষে ৪ (চার) বার।
২৪. পবিত্র কুরআনে বর্ণিত 'কা'বা শরীফ'-এর অন্যান্য নামগুলো কী?
উত্তর : বায়ত, বায়তুল আতীক, মাসজিদুল হারাম ও বায়তুল মুহাররম।
২৫. বর্গাকারে এই গৃহের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ কত ফুট?
উত্তর : দৈর্ঘ্য ৪২.২ ফুট (১২.৮৬ মিটার) ও প্রস্থ ৩৬.২ ফুট (১১.০৩ মিটার)।
২৬. 'কা'বা শরীফ'-এর উচ্চতা কত ফুট?
উত্তর : ৪৩ ফুট (১৩.১ মিটার)।
২৭. ভূমি থেকে গৃহটি কীসের উপর দাঁড়িয়ে আছে?
উত্তর : পুরু মার্বেল পাথরের বেজমেন্টের উপর।
২৮. বেজমেন্টের মার্বেল পাথর কত ইঞ্চি পুরু?
উত্তর : ১৪ ইঞ্চি।
২৯. কা'বা গৃহের দেয়াল কী দ্বারা নির্মিত?
উত্তর : গ্রানাইট পাথর দ্বারা।
৩০. গ্রানাইট পাথরগুলো কোত্থেকে সংগৃহীত?
উত্তর : মক্কার বিভিন্ন পাহাড় থেকে।
৩১. কা'বা গৃহের মাঝখানে কয়টি খুঁটি রয়েছে?
উত্তর : তিনটি।
৩২. খুঁটি তিনটি কিসের তৈরী?
উত্তর : উন্নতমানের মার্বেল দ্বারা।
৩৩. কা'বা গৃহের অভ্যান্তরের খুঁটি তিনটি কী দ্বারা মোড়ানো?
উত্তর : নকশী কাঠ দ্বারা।
৩৪. কা'বা গৃহের মেঝে কোন ধরণের পাথর দিয়ে কারুকার্য করা আছে?
উত্তর : শ্বেত পাথর দিয়ে।
৩৫. কা'বা গৃহের দেয়ালে কোন ধরণের পাথর দিয়ে কারুকার্য করা আছে?
উত্তর : মর্মর পাথর দিয়ে।
৩৬. কা'বা গৃহের উর্ধ্বাংশ ও ছাদ জুড়ে কীসের পর্দা ঝুলানো?
উত্তর : সবুজ রেশমী পর্দা।
৩৭. উক্ত পর্দায় কিসের কারুকার্য করা আছে?
উত্তর : রূপার তৈরী পবিত্র কুরআনের আয়াত।
৩৮. কা'বা ঘরের কারুকার্য কেমন?
উত্তর : কা'বা ঘরের ছাদের উপর কাঁচ দিয়ে ছোট একটি ছিদ্র রয়েছে, যা দিয়ে ভিতরে স্বাভাবিক আলো আসে। এছাড়া এ্যালুমিনিয়ামের তৈরী একটি সিড়ি রয়েছে, যার মাধ্যমে এই ছিদ্র দিয়ে ছাদে উঠতে হয়।
৩৯. কা'বার পূর্বকোণকে কী বলা হয়?
উত্তর : রুকনে শারক্বী বা রুকনে আসওয়াদ।
৪০. রুকনে শারক্বী বা আসওয়াদ কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : কা'বার দরজার ঠিক ডান পার্শ্বে এবং যমযম কূপের প্রায় মুখোমুখি অবস্থানে।

সাধারণ জ্ঞান (বাংলাদেশ বিষয়াবলী)

১. প্রশ্ন 'হাওর এক্সপ্রেস' কী?
উত্তর : ঢাকা-মোহনগঞ্জ রুটে চালুকৃত বাংলাদেশ রেলওয়ের নতুন আন্তঃনগর ট্রেন।
২. প্রশ্ন : কুড়িল ফ্লাইওভারের দৈর্ঘ্য কত?
উত্তর : ৩.১ কি.মি (প্রস্থ ৬.৭-৯.২ মিটার)।
৩. প্রশ্ন : 'অধিকার' কী ধরনের সংগঠন?
উত্তর : মানবাধিকার বিষয়ক।
৪. প্রশ্ন : বাংলাদেশ কতটি নদীর উপর ফেরী সার্ভিস চালু রয়েছে?
উত্তর : ৫১টি (পন্টুন রয়েছে ১৬৩টিতে, যার মধ্যে চালু ১৩১টি)।
৫. প্রশ্ন : সরকারী খাতে দেশের বৃহত্তম বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের নাম কী?
উত্তর : হরিপুর কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট।
৬. প্রশ্ন : বাংলাদেশ থেকে মৎস্য আমদানিতে শীর্ষে রয়েছে কোন্ দেশ?
উত্তর : যুক্তরাজ্য।
৭. প্রশ্ন : বর্তমান দেশে সরকারী পদের সংখ্যা কত?
উত্তর : ১৪,০৫,৫২৪ (সূত্র : জাতীয় সংসদে জনপ্রশাসন মন্ত্রী)।
৮. প্রশ্ন : বাংলাদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম উচ্চতর ব্যবসায় প্রশাসন ডিগ্রী 'ডক্টর অব বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন' (DBA) চালু হয়?
উত্তর : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।
৯. প্রশ্ন : ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৩-এর কোন থানার উদ্বোধন করা হয়?
উত্তর : কাজীরহাট (মেহেন্দীগঞ্জ, বরিশাল)।
১০. প্রশ্ন : 'পাংথুমাই জলপ্রপাত' কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : আহারকান্দি, ২ নং পশ্চিম জাফলং ইউনিয়ন, গোয়াইনঘাট (সিলেট)।
১১. প্রশ্ন : আণবিক শক্তি তথ্য কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : বঙ্গবন্ধু নভোথিয়েটার, বিজয় সরণি (ঢাকা)।
১২. প্রশ্ন : ২৯ আগষ্ট ২০১৩ দেশের নৌবাহিনীর কোন যুদ্ধ জাহাজের কমিশনিং করা হয়?
উত্তর : বিএনএস সুরমা।
১৩. প্রশ্ন : ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে দেশের মাথাপিছু আয় কত?
উত্তর : ১০৪৪ মার্কিন ডলার।
১৪. প্রশ্ন : ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৩-এ কোথায় টেলিমেডিসিন সেন্টার চালু হয়?
উত্তর : যশোর।
১৫. প্রশ্ন : পাটের ক্রোমোজোমের সংখ্যা কতটি?
উত্তর : ১৪টি।
১৬. প্রশ্ন : তোষা গোল্ডেন বা সোনালি আঁশ জাতের পাটের বৈজ্ঞানিক নাম কী?
উত্তর : করকোরাস ওলিটোরিয়াস (Corchorus oitorious) ।
১৭. প্রশ্ন : দেশী বা সাদা জাতের পাটের বৈজ্ঞানিক নাম কী?
উত্তর : করকোরাস ক্যাপসোলারিস (Corchorus capsularis)।
১৮. প্রশ্ন : বাংলাদেশের তথা বিশ্বের প্রথম জিংকসমৃদ্ধ ধানের জাত কোনটি?
উত্তর : ব্রি ৬২।
১৯. প্রশ্ন : পদ্মা সেতুর প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য কাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে?
উত্তর : বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে।
২০. প্রশ্ন : বাংলাদেশের প্রথম ওয়াই সেতু কোথায় অবস্থিত হচ্ছে?
উত্তর : ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর উপযেলার তিতাস নদীর ত্রিমোহনায়।
২১. প্রশ্ন : 'পায়রা' কী?
উত্তর : দক্ষিণ একীয়ার সর্ববৃহৎ সমুদ্রবন্দর (পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপযেলার রামনাবাদ চ্যানেলে)।
২২. সন্ত্রাস ও জঙ্গি তৎপরতা দমনে চালু হওয়া পুলিশের নতুন ইউনিটের নাম কী?
উত্তর : পুলিশ ব্যুরো অব কাউন্টার টেরোরিজম (পিবিসিটি)।
২৩. মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বের মধ্যে কততম?
উত্তর : পঞ্চম তম।

সাধারণ জ্ঞান (আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী)

১. প্রশ্ন : 'স্কাইপ' (Skype) কী?
উত্তর : বিনামূল্যে ভিডিও কল, ভয়েস কল এবং এসএমএস পাঠানোর সুবিধাযুক্ত ইন্টারনেটভিত্তিক যোগাযোগ প্রযুক্তি।
২. প্রশ্ন : 'স্কাইপ' (Skype)-এর প্রতিষ্ঠাতা কে কে?
উত্তর : ডেনমার্কের ধমিজা, জানুজ ফ্রিজ এবং সুইডেনের নিকোলাস জেনস্ট্রম।
৩. প্রশ্ন : 'স্কাইপ' (Skype) কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ২০০৩ সালের ৩০ আগষ্ট।
৪. প্রশ্ন : ওয়াই-ফাই (Wi-Fi) কী?
উত্তর : একটি সীমিত এলাকায় ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক জোন তৈরী করে ওয়াই-ফাই রাউটারের মাধ্যমে নির্দিষ্টসংখ্যক গ্রাহককে নেট সুবিধা প্রদান করার একটি আধুনিক ব্যবস্থাই হচ্ছে ওয়াই-ফাই।
৫. প্রশ্ন : ওয়াইম্যাক্স (WiMAX) কী?
উত্তর : কম খরচে ইন্টারনেটভিত্তিক সহজলভ্য করার লক্ষ্যে সৃষ্ট বিশ্বের উচ্চগতির বিশেষ ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক হচ্ছে ওয়াইম্যাক্স।
৬. প্রশ্ন : 3G (থ্রি জি) কী?
উত্তর : তারবিহীন মোবাইল নেটওয়ার্কের থার্ড জেনারেশনের প্রযুক্তি সেবা।
৭. প্রশ্ন : 'রোজিগাত' ও 'মালিয়া' কোন দেশের আদিবাসী গোষ্ঠী?
উত্তর : সুদান।
৮. প্রশ্ন : মূলধনের ভিত্তিতে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ব্যাংক কোন্টি?
উত্তর : ওয়েলস ফার্গো (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)।
৯. প্রশ্ন : নির্মিতব্য বিশ্বের সর্বোচ্চ ভবনের নাম কী?
উত্তর : স্কাই সিটি (চাংসা, চীন; ৮৩৮ মিটার উঁচু)।
১০. প্রশ্ন : বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু বিমানবন্দর নির্মিত হচ্ছে কোথায়?
উত্তর : তিব্বতের সিচুয়াং প্রদেশে (উচ্চতা : ৪৪১১ মিটার; নাম দেওচেং ইয়াংডং)।
১১. প্রশ্ন : এটিএম (ATM) বা মোবাইল ফোনের সিমকার্ডকে কী বলা হয়?
উত্তর : স্মার্ট কার্ড।
১২. প্রশ্ন : মহিষের মাংস রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ কোন্টি?
উত্তর : ভারত।
১৩. প্রশ্ন : 'ইউরোপ-১' (Europe-1) কী?
উত্তর : ফ্রান্সভিত্তিক রেডিও স্টেশন।
১৪. প্রশ্ন : 'পিস আর্ক' কী?
উত্তর : চীনা নৌবাহিনীর ভাসমান হাসপাতাল।
১৫. প্রশ্ন : 'এরিয়া-৫১' কী?
উত্তর : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোপন গোয়েন্দা বিমান ঘাঁটি (নেভাডা, যুক্তরাষ্ট্র)।
১৬. প্রশ্ন : বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ চিকিৎসকের নাম কী??
উত্তর : ইকবাল মুহাম্মাদ আসাদ (ফিলিস্তিন)।
১৭. প্রশ্ন : ভিকোনতাকতে (VK) কী?
উত্তর : রাশিয়ার সামাজিক যোগাযোগ সাইট।
১৮. প্রশ্ন : 'আন-নাহদা স্কয়ার' ও 'রাব্বা আল-আদাবিয়া স্কয়ার' কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : মিসরে।
১৯. প্রশ্ন : ভারতের কোন্ রাজ্য ভেঙ্গে ২৯তম রাজ্য তেলেঙ্গানা সৃষ্টি করা হয়?
উত্তর : অন্ধ্র প্রদেশ।
২০. প্রশ্ন : বর্তমানে ইন্টারনেট ব্যবহারে বিশ্বের শীর্ষ দেশ কোন্টি?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্র; দ্বিতীয়-চীন ও তৃতীয়- ভারত।
২১. সিমিয়ান ফোমি (SM) কী?
উত্তর : একধরনের ভাইরাস।
২২. ইরানের সপ্তম ও বর্তমান প্রেসিডেন্টের নাম কি?
উত্তর : হাসান রুহানী।
২৩. 'কাঁদুনে গ্যাস' (Tear Gas) কী?
উত্তর : এক ধরনের রাসায়নিক অস্ত্র।

আইকিউ

[কুইজ-১; বর্ণের খেলা-২; শব্দজট-৩ ও সংখ্যা প্রতিযোগ-৪-এর সঠিক উত্তর লিখে নাম-ঠিকানাসহ ৩১ নভেম্বরের মধ্যে পাঠিয়ে দিন। সর্বোচ্চ উত্তরদাতাদের তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে। বিভাগীয় সম্পাদক]

কুইজ ১/৩ :

১. বায়তুল্লাহ শরীফের আশেপাশে কতটি মূর্তি ছিল?
ক. ৪৬০টি খ. ৩৬০টি গ. ৫৬০টি ঘ. ২৬০টি।

২. কিয়ামতের দিন কয়টি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আদম সন্তানকে এককদম নড়তে দেওয়া হবে না?
ক. ৪টি খ. ৬টি গ. ৫টি ঘ. ৮টি।

৩. কয়টি নে'মতের ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ ধোঁকায় নিমজ্জিত?
ক. ২টি খ. ১টি গ. ৫টি ঘ. ৩টি।

৪. কাজী নজরুল ইসলাম তার 'যৌবনের গান' প্রবন্ধটি কত সালে প্রকাশ হয়েছিলেন?
ক. ১৯৩৩ সালে খ. ১৯২৩ সালে গ. ১৯৩৪ সালে ঘ. ১৯৩২ সালে।

৫. নিয়ত মুখে উচ্চারণ করাকে 'উত্তম' বলে আখ্যায়িত করেছেন কে?
ক. হানাফী ফক্বীহ সারাখসী খ. আবু ইউসুফ গ. ইবনু আবেদীন ঘ. ইমাম মুহাম্মাদ।

৬. 'জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ'টি কবে আন্তর্জাতিক আইনের একটি অংশে পরিণত হয়?
ক. ১৯৯০ সালের ২ সেপ্টেম্বর খ. ১৯৯০ সালের ২ অক্টোবর গ. ১৯৯০ সালের ২ আগষ্ট ঘ. ১৯৯০ সালের ২ নভেম্বর।

৭. উত্তম পোশাকের গুণাবলী কয়টি?
ক. ১০টি খ. ৮টি গ. ৯টি ঘ. ৫টি।

৮. অবক্ষয় যুগে আহলেহাদীছ আন্দোলনের কয়টি প্রধান কেন্দ্র ছিল?
ক. ৬টি খ. ৭টি গ. ৫টি ঘ. ৮টি।

৯. ইতিহাসে মোট কয়টি গ্রেটের কথা উল্লেখ করা হয়?
ক. ৪টি খ. ৫টি গ. ৬টি ঘ. ৭টি।

১০. আকবর কত সালে 'দ্বীন-ই-ইলাহী' গঠন করেন?
ক. ১৫৮৩ সালে খ. ১৬৮৩ সালে গ. ১৫৮২ সালে ঘ. ১৬৮২ সালে।

গত সংখ্যার কুইজের উত্তর : (১) তাকুলীদ (২) ৮০১ হিঃ; ১৩৪৩ হিঃ (৩) আব্দুল আলী লাক্ষ্মৌবী (৪) ৮ জুন (৫) ইসলামী তরীকার মাধ্যমে (৬) দুই ভাগে (৭) ১৮৪৬ সালে; জ্যাকব হালেক (৮) মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক; ১৯২৪ (৯) নবম শতাব্দীতে (১০) সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে।

গত সংখ্যায় বিজয়ীদের নাম : ১. মেহেদী হাসান (নওদপাড়া, রাজশাহী) ২. জাহীদুল ইসলাম (মুচড়া, সাতক্ষীরা) ৩. শরীফুল ইসলাম (ভাটপাড়া, সাতক্ষীরা)।

বর্ণের খেলা ২/৩ :

নির্দেশনা :

বৃত্তের প্রতিটি অংশে একটি করে অর্থবোধক শব্দ দেয়া আছে। তবে মনে রাখতে হবে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই একটি কিংবা দুটি অক্ষর খুঁজে পাবেন না। এ বর্ণগুলো বের করে পুনর্বিন্যাস করলে একটি মাসিক পত্রিকার নাম পাবেন।

১...........................
২...........................
৩...........................
৪...........................
অদৃশ্যে লুকিয়ে থাকা নাম...............................

গত সংখ্যার বর্ণের খেলার উত্তর : (১) আকবার (২) খয়রুল (৩) তাওহীদ (৪) রহমান; **অদৃশ্যে লুকিয়ে থাকা নাম : আখতার।**

গত সংখ্যার বিজয়ীদের নাম : ১. জাহিদুল ইসলাম (মুচড়া, সাতক্ষীরা) ২. মেহেদী হাসান (নওদাপাড়া, রাজশাহী) ৩. শরীফুল ইসলাম (ভাটপাড়া, সাতক্ষীরা)।

শব্দজট ৩/৩ :

এবারের শব্দজটটি তৈরী করেছেন মুহাম্মাদ মেহেদী হাসান, দাখিল পরীক্ষার্থী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়, রাজশাহী।]

১		২	■	৩	৪
	■	৫		■	
■	৬	■	■	৭	
৮		■	■		■
	■	৯	১০	■	১১
১২		■	১৩		

পাশাপাশি : ১. বিশ্বাস ৩. পিতামহ ৫. সাহসী ৭. সুন্দর, সভ্য ৮. একটি বেগুনী রংয়ের ফল ৯. প্রভু ১২. পানি ১৩. সমাধি।

উপর-নীচ : ১. খুশি, উৎসব ২. পয়গম্বর ৪. অভাব, দীনতা ৬. মূল্য ৭. অনুগত, সেবক ৮. বৃহৎ জলযান ১০. মাছ শিকারে পটু এক জাতীয় পাখি ১১. বিবাহের পাত্র।

গত সংখ্যার শব্দজটের উত্তর : পাশাপাশি : ১. ওমর ৩. দালান ৫. জর্ডান ৬. চক ৭. নব ৯. মালঞ্চ ১০. হনন ১১. লরি ১৩. ক্ষমা ১৪. নবান্ন ১৫. আশা। **উপর-নীচ :** ১. ওছমান ২. রজব ৩. দান ৪. নরক ৬. চঞ্চল ৮. বহমান ৯. মান ১২. রিকশা।

সংখ্যা প্রতিযোগ ৪/৩:

নির্দেশনা :

খোপের নিচে দেওয়া চারটি সংখ্যা প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম খোপে বসবে। এবার দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ খোপে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ চিহ্নগুলো এমনভাবে বসান, যাতে উত্তরটি অবশ্যই সমান চিহ্নের ডান পাশে দেওয়া সংখ্যাটির সমান হয়। চারটি সংখ্যা একবারই ব্যবহার করতে পারবেন। তবে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ চিহ্নগুলোর মধ্যে কোনটি একাধিকবারও ব্যবহার করা যেতে পারে।

গত সংখ্যার সংখ্যা প্রতিযোগের উত্তর :

৫−৪+৯÷৩=৪; ৮÷৪+৩÷৩=৬; ২×৬−৮÷২=৮।

*[**উত্তর পাঠানোর ঠিকানা** : বিভাগীয় সম্পাদক, আই কিউ, তাওহীদের ডাক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৩৮-০২৮৬৯২]*